শ্রীকৃষ্ণ



[যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ ও শ্রীমদ্ভাগবত গীতা]

প্রণেতা

গৌরচন্দ্র সাহা, সাহিত্যবিশারদ

সম্পাদনা

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়



বুলবুল প্রকাশন

১৮/এল, ট্যামার লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৯

SHREEKRISHNA

by

Gourchandra Saha

প্রথম প্রকাশ :
July 1958

প্রচ্ছদ : দেবিকা মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : বুলবুল সাহা □ বুলবুল প্রকাশন ● ১৮/এল, ট্যামার লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : অশোককুমার আদক □ ত্রিনয়নী প্রিন্টার্স ● ৬১এ, ডব্লু. সি.
ব্যানার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

অর্ঘ্য

কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী পরমারাধ্যা পিতামহী স্বর্গীয়া কুবজাসুন্দরী এবং সত্যের পূজারী পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র সাহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ গ্রন্থখানি নিবেদন করলাম।

স্নেহধন্য
গৌর

সূচি

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ

ভীম এবং অর্জুনকে নিয়ে কৃষ্ণের রথ ইন্দ্রপ্রস্থের সীমান্তে এসে উপস্থিত হওয়ার আনন্দবার্তা যুধিষ্ঠিরের কাছে পোঁছতে মোটেই বিলম্ব হল না। নকুল, সহদেব এবং অন্যান্য প্রধানদের সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে দ্রুত অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে তাঁদের সাক্ষাৎ হতেই বাসুদেব, ভীম ও অর্জুন রথ থেকে অবতরণ করলেন। ভীম ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করল। নকুল ও সহদেব প্রণাম করল তাদের দুই অগ্রজকে এবং বাসুদেবকে। বাসুদেব প্রণাম করলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন কৃষ্ণকে। অতঃপর রথ পরিত্যক্ত হল। কৃষ্ণকে বেষ্টন করে পঞ্চপাণ্ডবসহ এক বিশাল শোভাযাত্রা পদব্রজে অগ্রসর হল ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে। প্রাসাদদ্বারে মাঙ্গলিক উপাচার নিয়ে অপেক্ষা করছিল দ্রৌপদী। কৃষ্ণ ও তার দুই স্বামীকে সে বরণ করল। কুশলাদি বিনিময়ের পর কৃষ্ণকে নিয়ে সকলে প্রবেশ করলেন বিশ্রামাগারে।

আহার এবং বিশ্রামের শেষে যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন জরাসন্ধ-নিধন বৃত্তান্ত। তখন অর্জুন তাদের শত্রুরূপে পশ্চাৎ দিক দিয়ে গিরিব্রজে প্রবেশ, জরাসন্ধের সঙ্গে তাদের কথাবার্তার পূর্ণ বিবরণ এবং চোদ্দদিন ব্যাপী মল্লযুদ্ধে ভীম কর্তৃক জরাসন্ধের মৃত্যুর বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। বর্ণনা করল ছিয়াশিজন রাজার মুক্তি এবং জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবের অভিষেক। যুধিষ্ঠির জানলেন, মগধাধিপতি সহদেব এখন যুধিষ্ঠিরের শরণাগত। অশুভ জরাসন্ধ-জোট নিশ্চিহ্নপ্রায়। ভারতভূমির রাজনৈতিক পটবিন্যাস এখন এক নতুন শক্তিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

কৃষ্ণকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বিনীত স্বরে যুধিষ্ঠির

প্রশ্ন করলেন, হে কেশব! এবার কি আমি রাজসূয় যজ্ঞের যোগ্যতা অর্জন করেছি?

কৃষ্ণ হাস্যবিগলিত স্বরে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে ধর্মরাজ! ভারতভূমিতে এই মুহূর্তে আপনিই একমাত্র রাজা যিনি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করতে পারেন। জরাসন্ধের মৃত্যু নিষ্কণ্টক করেছে আপনার রাজসূয় যজ্ঞের পথ। যাদব ভিন্ন অন্য কোনও শক্তিই আপনার বিরোধিতায় সক্ষম নয়। যাদবেরা তো আপনার মিত্রকুল। আপনি সম্রাট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে তারা আনন্দিতই হবে। জরাসন্ধের হাত থেকে আপনি ধর্মকে রক্ষা করেছেন— ধর্মই এখন আপনাকে রক্ষা করবে। সুতরাং আর কিসের দুশ্চিন্তা? আপনার চার ভ্রাতা মহাবীর এবং সমরকুশল। তাঁদের নেতৃত্বে চারজনকে আপনি চারদিকে প্রেরণ করুন। তাঁরা দিগ্বিজয় করে বিভিন্ন রাজার আনুগত্য এবং রাজসূয় যজ্ঞের জন্যে ধন সংগ্রহ করে আনুক। করজাত অর্থ থেকে নির্বাহ হোক রাজসূয় যজ্ঞের ব্যয়ভার।

আপ্লুত যুধিষ্ঠির বললেন, হে কেশব! তুমিই পাণ্ডব—তুমিই পাণ্ডবশক্তি। তোমার উপদেশ আমাদের কাছে আদেশস্বরূপ।

বিনয়ী কৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ! এত প্রশংসার যোগ্য আমি নই। আপনাদের উত্থানের পশ্চাতে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ কাজ করে চলেছে। আমি কামনা করি, সারা ভারতভূমি ব্যাপী গঠিত হোক এক ধর্মরাজ্য—এবং তা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরেরই নেতৃত্বে।

স্মিত হাস্য করে যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ! এই বিনয় একমাত্র তোমাকেই শোভা দান করে। কারণ, তুমি সব সময়ে হীন স্বার্থের ঊর্ধ্বে।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট লগ্নে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ করলেন পুরোহিত ধৌম্য। তাঁকে সাহায্য করল দ্রৌপদী এবং অন্যান্য পাণ্ডব-স্ত্রীগণ। তারা বরণ করল চার মহারথীকে। যাত্রালগ্নের

মুহূর্ত সমাগত হল।

কৃষ্ণ বললেন, হে ধর্মরাজ! আপনার শঙ্খ অনন্তবিজয়ের ধ্বনিতে সূচিত হোক পাণ্ডববাহিনীর যাত্রারম্ভ। চতুরঙ্গীবাহিনী যাত্রা করুক চার দিশায়।

কৃতজ্ঞ যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার পাঞ্চজন্যের উপস্থিতিতে আমার অনন্তবিজয়ের কী প্রয়োজন?

বাধা দিলেন কৃষ্ণ। তা হয় না, মহারাজ। এ আপনার বাহিনী। আপনিই এর নিয়ন্ত্রক। আপনার আদেশই এখানে শোভনীয়।

মৃদু হেসে যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি পরম নীতিজ্ঞ, বাসুদেব! তোমার ইচ্ছাই পালিত হোক।

যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়ের প্রত্যুত্তরে এক এক করে ধ্বনিত হল ভীমের—শঙ্খ পৌণ্ড্র, অর্জুনের—দেবদত্ত, নকুলের—সুঘোষ এবং সহদেবের—মণিপুষ্পক। নগরতোরণ লক্ষ্য করে ধূলিমেঘের সৃষ্টি করে ছুটে গেল দুর্মদ পাণ্ডববাহিনী। সেই বাহিনীর সঙ্গে আত্মারূপে, শুভেচ্ছারূপে মিশে রইলেন স্বয়ং কৃষ্ণ।

শূন্য ইন্দ্রপ্রস্থ যুধিষ্ঠিরের কাছে আরও শূন্য হয়ে উঠল, যখন কৃষ্ণ বললেন—আমি দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করব। দ্বারাবতীর অদর্শনে আমি ব্যাকুল। সেখানেও তো আমার কিছু কর্তব্য রয়েছে।

সেদিন বাসুদেব অন্তঃপুরচারিণী সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের কুশলাদি জ্ঞাত হয়ে পিতৃস্বসা কুন্তীকে প্রণাম করে যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কুন্তীও জানতেন যে কৃষ্ণই পাণ্ডবদের শক্তির উৎস। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে ম্রিয়মাণ হয়ে যায় যুধিষ্ঠির। তাই তিনি বললেন, হে কৃষ্ণ! দ্বারকায় গিয়ে তুমি ইন্দ্রপ্রস্থের কথা বিস্মৃত হোয়ো না। তোমার উপদেশ ছাড়া যুধিষ্ঠির পদমাত্রও

অগ্রসর হতে পারে না।

পিতৃস্বসাকে আশ্বস্ত করে কৃষ্ণ সবাইকে অশ্রুসাগরে নিমজ্জিত করে নিজের গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করলেন।

কৃষ্ণের নির্দেশে, দারুকের বল্গার আকর্ষণে রথ গতিশীল হয়ে উঠল।

এদিকে অর্জুনের বিজয়বাহিনী এগিয়ে চলল উত্তরের দেশগুলি লক্ষ্য করে। এই দিগ্বিজয় যাত্রায় অর্জুনকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবল সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয় নি। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে নির্গত হওয়ার পর নিকটবর্তী রাজ্যগুলি যেমন, মদ্র (পাণ্ডুর দ্বিতীয়া স্ত্রী মাদ্রীর পিত্রালয়), কেকয়, কাশ্মীর, ইত্যাদি রাজ্য অতি সহজেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে যজ্ঞকর প্রদান করে। এরপর অর্জুন হিমালয়ের উত্তরাংশে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও মানস সরোবরের নিকটবর্তী রাজ্যগুলি জয় করে কিম্‌পুরুষবর্ষ এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলিও জয় করল। এই অঞ্চলে একমাত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর-নৃপতি ভগদত্তের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অর্জুনের বিক্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হয়ে ভগদত্ত অল্পদিনের মধ্যে বশ্যতা স্বীকার করে করদানে প্রস্তুত হন। অর্জুন উত্তর হরিবর্ষ পর্যন্ত জয় করে বহু ধনরত্ন ও উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করল।

অন্যদিকে ভীম পূর্বাঞ্চল জয় করতে যাত্রা করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে সে পাঞ্চালে এসে উপস্থিত হল। পাঞ্চাল যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করে নিল। তখন সে বিদেহ ও গণ্ডকদের পরাজিত করল। অতঃপর ভীমসেন দশার্ণ দেশে এসে উপস্থিত হল। দশার্ণপতি সুধন্বার সঙ্গে তার প্রবল যুদ্ধ হয়। সুধন্বা পরাজিত হলেও তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ ভীমসেন তাঁকে পাণ্ডববাহিনীর এক সেনাপতির পদে বরণ করল। এরপর ভীমসেন মহারাজ

রোচমানকে পরাজিত করে পুলিন্দ নগরে উপস্থিত হল। সেখানে সুকুমার ও সুমিত্রনামা নামক দুইজন নৃপতিকে বশ্যতা স্বীকার করাল। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশমতো ভীম যুদ্ধের কোনও উত্তেজনা সৃষ্টি না করে রাজা শিশুপালের কাছে দূত পাঠাল। বার্তা পেয়ে শিশুপাল সাদর অভ্যর্থনায় ভীমকে রাজধানীতে আহ্বান করে নিয়ে গেল। শিশুপাল পাণ্ডবদের মাতৃষ্বসা শ্রুতশ্রবার পুত্র। জরাসন্ধ-মহাজোটের অন্যতম অংশীদার শিশুপাল জরাসন্ধের মৃত্যুর পর নিজেই রাজনৈতিক প্রাধান্য কামনা করছিল। তার বিশ্বাস, জরাসন্ধের পর সেই-ই ভারতভূমিতে একমাত্র প্রবলতম শক্তি। রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করে যুধিষ্ঠির কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে সে পাদপ্রদীপের আলোকে আসার কামনা করছিল। তাই সে ভীমসেনকে আদর আপ্যায়নে রাজধানী শক্তিমতিপুরে মাসাধিক কাল ব্যয় করতে বাধ্য করল। পরে বিপুল উপঢৌকন এবং অর্থ দান করে তাকে বিদায় জানাল।

অতঃপর ভীমসেন যথারীতি মগধে উপস্থিত হতে মগধাধিপতি জরাসন্ধপুত্রও তাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে বিপুল অর্থদানে সম্মানিত করল।

মগধ পরিত্যাগ করে ভীমসেন পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য জয় করে যজ্ঞকর গ্রহণ করল। প্রত্যাবর্তনের পথে ভীম প্রবেশ করল অঙ্গরাজ্যে। কর্ণও ভীমকে যথারীতি আদর-অভ্যর্থনায় বিস্মিত করল। ভীম কর্ণকে যজ্ঞসভায় উপস্থিত থাকার জন্যে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাল।

সবশেষে সফল ভীম বিপুল অর্থ এবং রত্নাদি সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করল। সে তার দিগ্বিজয়ের কাহিনী নিবেদন করল যুধিষ্ঠিরকে। প্রীত যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে অর্থ এবং রত্নরাজি রক্ষিত হল পাণ্ডব কোষাগারে।

চতুর্থ পাণ্ডব নকুল সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল জয় করে অপরিমিত যজ্ঞ-

কর সঙ্গে নিয়ে এক সময়ে প্রত্যাবর্তন করল ইন্দ্রপ্রস্থে।

প্রত্যাবর্তন করল কনিষ্ঠ পাণ্ডব — সকল ভ্রাতাদের নয়নের মণি সহদেব—সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল জয় করে।

ভ্রাতাদের প্রত্যাবর্তনে আবার কলহাস্যময় হয়ে উঠল ইন্দ্রপ্রস্থ।

মহর্ষি কৃষ্ণবেদব্যাস, পুরোহিত ধৌম্য প্রমুখ মহর্ষিগণের নির্দেশে যজ্ঞের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সহদেব। আমন্ত্রণ লিপি নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ধাবিত হল পাণ্ডব দূত। বিশেষ দূত গেল দ্বারকায়। যুধিষ্ঠির নকুলকে পাঠালেন হস্তিনায়। নকুলের মাধ্যমে যুধিষ্ঠির নিবেদন করে পাঠালেন, এ যজ্ঞ পাণ্ডবদের নয়—সমগ্র কুরুবংশের। তাই আপনারা উপস্থিত থেকে বিভিন্ন দায়দায়িত্বের ভার গ্রহণ করে যজ্ঞকে সফল করে তুলুন। কৌরব-হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে অন্যান্য সকলের সঙ্গে আমন্ত্রিত হল কর্ণও।

দ্বারকা থেকে এলেন কৃষ্ণ। সঙ্গে বলরাম, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, গদ প্রভৃতি মহারথেরা।

হস্তিনাপুর থেকে এলেন পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃব্য বিদুর, আচার্য দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও তার শতভ্রাতা, কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ। পাঞ্চাল থেকে এলেন সপুত্র মহারাজ যজ্ঞসেন। এছাড়াও এলেন উপকূলবাসী ম্লেচ্ছগণ, পার্বতীয় ভূপালগণ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্র বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি, কুন্তীভোজ, সপুত্র রাজা বিরাট, শিশুপাল, শাল্ব, শল্য। অতিথি অভ্যাগতদের আগমনে পূর্ণ হয়ে উঠল ইন্দ্রপ্রস্থ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন স্বয়ং যজ্ঞে ব্রহ্মকার্যে নিযুক্ত হলেন! বেদ-বেদাঙ্গ পারঙ্গম কিছু ঋষি নিযুক্ত হলেন ঋত্বিকের কার্যে। ধনঞ্জয়-গোত্রশ্রেষ্ঠ সুসামা সামগানার্থে ব্রতী হলেন। ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, অধ্বর্যু, বসুপুত্র পৌল এবং পুরোহিত ধৌম্য হোতা এবং তাঁদের বেদ-বেদাঙ্গপারগ শিষ্যবর্গ এবং পুত্রগণ হলেন সদস্য।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সমাগত রাজন্যবর্গ, ঋষি এবং ব্রাহ্মণ অতিথিদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে তাঁদের পৃথক-পৃথক বাসস্থান প্রদান করলেন। প্রতিটি গৃহই ভক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ—মণিময় কুট্টিমে (পাকা মেঝে) অলংকৃত। চতুর্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। গবাক্ষ সকল সুবর্ণজালে সজ্জিত—সুসজ্জিত দ্বারসকল।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ও অন্যান্য গুরুজন এবং স্বজনদের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায় বসলেন। তিনি ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ইত্যাদি সকলকে সম্বোধন করে বললেন, এই যজ্ঞ মহান কুরু-কুলের যজ্ঞ। ভরত বংশের যজ্ঞ। আপনারা আমাকে সাহায্যকরুন। আপনারা যজ্ঞকার্য সুপরিচালনার জন্যে এক-একজন এক-একটি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। রাজকোষ আপনাদেরই। আপনারা যথেচ্ছভাবে তার উপযোগ করুন।

প্রীত ভীষ্ম বললেন, হে ধর্মরাজ! তোমার বক্তব্য অতি সাধু এবং ভরত বংশের উপযুক্ত। আমরা তোমার বিবেচনার প্রশস্তি করি। তুমিই বল, কে কোন কার্যের উপযুক্ত?

যুধিষ্ঠির নীরবে কৃষ্ণের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে তাঁরই সঙ্গে পূর্বে আলোচিত তালিকাটি প্রকাশ করলেন।—হে পিতামহ! সঙ্গত ও অসঙ্গত এবং আবশ্যক ও অনাবশ্যক কার্য স্থির করার দায়িত্বের পুরোভাগে অবস্থান করবেন আপনি এবং আচার্য দ্রোণ। খাদ্য বিভাগের দায়িত্বে থাকবে অনুজ দুঃশাসন। ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা এবং আতিথেয়তার সুব্যবস্থার জন্য থাকবেন গুরুপুত্র অশ্বত্থামা। রাজন্যবর্গের অভ্যর্থনা ও সেবার দায়িত্ব থাকবে স্থিতধী সঞ্জয়ের ওপর। কোষাগার, রত্নভাণ্ডার রক্ষা ও দক্ষিণা দান প্রভৃতি কার্যের জন্যে থাকবেন ঐশ্বর্যে বীতস্পৃহ গুরু কৃপাচার্য। আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করবেন ধর্মজ্ঞ বিদুর। পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন, ও সামগ্রিকভাবে কর্তৃত্বের ভার থাকবে কুরুরাজ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের উপর। বাহ্লিক, সোমদত্ত ও জয়দ্রথের উপর

উপহার-উপঢৌকনাদি গ্রহণ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের দায়িত্বে থাকবে আমার প্রিয় অনুজ মহামানী সুযোধন (দুর্যোধন)। দান-ধ্যান বিভাগের দায়িত্বে থাকুন দানবীর অঙ্গাধিপতি কর্ণ। একটু থেমে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, বলুন, আমার এ নির্বাচন অযৌক্তিক কিনা?

শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম আনন্দের সঙ্গে বললেন, হে ধর্মরাজ, এই বিভাগ-বণ্টন তোমার রাজকীয় বুদ্ধিমত্তাই নির্দেশ করছে। আমরা তোমার নির্বাচনের সঙ্গে সহমত। কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? বাসুদেব কি দায়িত্বহীন ভাবে অবস্থান করবেন এই মহাযজ্ঞে?

কৃষ্ণ মৃদু হাসলেন।—হে গঙ্গাপুত্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির আমার নামোল্লেখ না করলেও দুটি বিভাগের দায়িত্বভার আমি স্বইচ্ছায় গ্রহণ করেছি। একটি, আগত ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালন। অপরটি, যজ্ঞ রক্ষা করা।

সকলে বলে উঠলেন, সাধু! সাধু!

[এখানে আমার একটি বক্তব্য রয়েছে। ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালনের মাধ্যমে কৃষ্ণের মধ্যেকার বিনয় প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে—ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। এ পর্যন্ত ঠিকই রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তদানীন্তন ভারতে কোন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের থেকেও মহিমময় ছিলেন? কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন কৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ? কৃষ্ণ তাঁর বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে আপামর ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালন করবেন? কোনও নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের কথা বলা হলেও তা না হয় মেনে নেওয়া যেত। যজ্ঞের শেষের দিকে আমরা দেখব—কৃষ্ণ স্বীকৃত হচ্ছেন তদানীন্তন ভারতভূমির শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হিসাবে। তাঁর প্রতি আরোপিত হচ্ছে দেবত্ব। এহেন কৃষ্ণকে দিয়ে ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালন করানোর ব্যাপারটি মোটেই স্বাভাবিক নয়। এর পশ্চাতে ব্রাহ্মণদের অহঙ্কার-বোধ প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং বিষয়টি অভি-

সন্ধিমূলক। এই বিষয়টি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেও পীড়িত করেছিল।]

মন্ত্রণাসভার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। এক সময়ে মন্ত্রণাসভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হল।

*   *   *

এরপর অভিষেক দিবস। মহর্ষি, ব্রাহ্মণগণ এবং রাজন্যগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্বেদীতে প্রবেশ করলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির। নারদ প্রমুখ দেবর্ষিগণ, নানাশাস্ত্র পারঙ্গম ব্রহ্মর্ষিগণ এবং দেবতাগণ ব্রহ্মভবনে সমাগত হয়ে অবসর সময়ে যজ্ঞসজ্জার সমালোচনা করতে লাগলেন। এইরূপে তৎকালীন ভারতভূমির শ্রেষ্ঠ ও মেধাবী ব্যক্তি-গণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞবেদীতে অধিষ্ঠিত হলেন। তখন গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম বললেন, হে ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! উপস্থিত রাজগণের যথোচিত সৎকার বিধান কর। তারপর সর্ব প্রথম অর্ঘ্য-প্রদান-কার্যানুষ্ঠান কর্তব্য। আচার্য, ঋত্বিক, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি, এবং প্রিয় ব্যক্তি—এই ছয়জন অর্ঘপ্রাপ্তির যোগ্য। এদের সকলের জন্যে এক একটি অর্ঘ্য আনয়ন কর। এঁদের মধ্যে যিনি সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন, তিনি ওই অর্ঘ্য দ্বারা পূজিত হবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে পিতামহ! উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচনে আপনি আমাকে পরামর্শ দান করুন। বলুন, সমাগত অতিথিদের মধ্যে কে অর্ঘ্য লাভের যোগ্য ?

ভীষ্ম দ্বিধাহীন স্বরে বললেন, হে ধর্মরাজ। যে সভায় স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ উপস্থিত, সেই সভায় আর কে অর্ঘ্য লাভের যোগ্য হতে পারেন ? তুমি কেশবকে অর্ঘ্য নিবেদন কর।

তখন যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে সহদেব কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করল। তিনি শাস্ত্রাচারে বিধিমতো সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন।

নীরব সভাস্থলে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল। কুরুপিতামহ ভীষ্মের প্রস্তাব অর্ঘ্য-আকাঙ্ক্ষী শিশুপালের অসহ্য বোধ হল। শিশুপাল আসন ত্যাগ করে চিৎকার করে উঠল, এই সভায় অনেক যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও অযোগ্য কৃষ্ণকে কেন অর্ঘ্য প্রদান করা হল?

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! অন্যান্য সকলকে অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করা আপনার উচিত হয় নি। ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব এখনও আপনার আয়ত্তাধীন নয়—আপনি নামেই শুধু ধর্মরাজ। আপনার এই কার্য খুবই নিন্দনীয়। আর এই ভীষ্ম অদূরদর্শী এবং শক্তিবিহীন। হে ভীষ্ম! আপনার মতো ধার্মিক সাধুসমাজে অপাঙক্তেয়। যে কৃষ্ণ রাজা নয় তাকে কি করে অর্ঘ্য প্রদান করলেন? আর সেই বা মহীপালের পূজা গ্রহণ করল কিভাবে? হে ধর্মরাজ, এ সভায় কৃষ্ণই কি সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ? ভীষ্ম, ব্যাসদেব ও বসুদেব অপেক্ষাও কি বয়োজ্যেষ্ঠ? মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অপেক্ষাও কি কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক? কৃষ্ণ আপনার প্রিয় হলেও মহারাজ দ্রুপদ উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণের পূজা করা আপনার উচিত হয় নি। কৃষ্ণ যদি আচার্যরূপে পূজিত হয়ে থাকে তবে স্বয়ং দ্রোণ উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণের পূজা কেন? হে রাজন! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সর্বশাস্ত্রবিশারদ। মহাবীর অশ্বত্থামা, রাজেন্দ্র দুর্যোধন, আচার্য কৃপ, কিমপুরুষাচার্য দ্রুম, এবং মদ্র অধিপতি শল্য—এই সকল মহাত্মা উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য কেন? হে মহারাজ যুধিষ্ঠির। পরশুরাম জামদগ্ন্যের প্রিয় শিষ্য কর্ণ উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণ কিভাবে পূজিত হতে পারে? কৃষ্ণ ঋত্বিক নয়, আচার্য নয়, রাজাও নয়—বয়োবৃদ্ধও নয়। তাই হে মহারাজ, যদি প্রীতির বশে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করে থাকেন তবে আমাদের আমন্ত্রণ করে অপমানিত করলেন কেন? আমরাও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ভীত হয়ে অথবা লোভবশত করদান করি নি। তিনি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত এবং সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী—এই জন্যে কর প্রদান করেছি। কিন্তু আপনি আমাদের সম্মান

রক্ষা করলেন না। ধর্মরাজের ধর্মত্বিতা—এই যশ অর্থহীন। কোন ধার্মিক পুরুষ ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করে থাকে? যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মহাত্মা জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করেছে, সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করাতে আজ যুধিষ্ঠিরের নীচত্ব প্রকাশিত হল। তিনি ধর্মভ্রষ্ট হলেন। পাণ্ডবেরা ভীত—নীচ-স্বভাব তপস্বী। কিন্তু কৃষ্ণ, অর্ঘ্য গ্রহণ করার পূর্বে তোমার কি উচিত ছিল না বিবেচনা করে দেখা—তুমি অর্ঘ্য লাভের যোগ্য কি না? নীচ ব্যক্তি যদি সহসা আশাতীত ভাবে সম্মানিত হয়—তাতে সে আত্মশ্লাঘা লাভ করে—তুমিও সেরূপ। যেমন ক্লীবের দারপরিগ্রহ ও অন্ধের রূপদর্শন নিরর্থক—সেইরূপ রাজ্যবিহীনের রাজসম্মান লাভ লজ্জাজনক।

অতঃপর ক্রুদ্ধ শিশুপাল তার অনুগত রাজন্যদের নিয়ে যজ্ঞ পরিত্যাগে উদ্যত হল।

শিশুপালের অসূয়াপূর্ণ পরুষবাক্য শ্রবণ করেও কৃষ্ণ উত্তেজিত হলেন না। তিনি পরম ধৈর্য সহকারে নীরব রইলেন। ক্ষমাই পরম ধর্ম। শিশুপালও তাঁর নিকট আত্মীয়—অপর পিতৃষ্বসা শ্রুতশ্রবার পুত্র। তাছাড়া শিশুপালকে দণ্ডদান করতে উদ্যত হয়ে যজ্ঞসভায় বিঘ্ন সৃষ্টি করাও তাঁর মনঃপূত ছিল না।

উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ শিশুপাল প্রমুখদের সভাত্যাগের উদ্যোগ দর্শন করে সত্বর ছুটে এলেন। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, হে চেদিরাজ! তুমি কুরুপিতামহ এবং যদুকুল-শিরোমণি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যে পরুষবাক্য প্রয়োগ করলে তা উচিত হয় নি। তোমার ধর্মজ্ঞান পরিপূর্ণ হলে শান্তনুনন্দনের প্রতি এমন অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করতে না। এই যজ্ঞসভায় উপস্থিত সমস্ত রাজন্যবর্গ, মহর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ কৃষ্ণের পূজা সমর্থন করেছেন। তুমি কেন অন্যথা করছ? তুমি শান্ত হও।

উত্তেজিত শান্তনুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কৃষ্ণের অর্চনা

যার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় করা বা সান্ত্বনা দান করা অনুচিত। তারপর ভীষ্ম বললেন, এই যজ্ঞসভায় কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে রয়েছেন—যিনি অর্ঘ্য দাবী করতে পারেন? একটু বিরত থেকে ভীষ্ম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুনরায় বললেন, এই মহতী সভায় একজনও মহীপাল দৃষ্ট হয় না যাকে কৃষ্ণ তেজবলে পরাজিত করেন নি। কৃষ্ণ জন্মাবধি যে সকল কার্য করেছেন, তা বহু ব্যক্তি বহুবার আমার কাছে কীর্তন করেছেন। আমি কৃষ্ণের শৌর্য-বীর্য-কীর্তি এবং বিজয় প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হয়েই তাঁকে বরণ করেছি। তিনি নিখিল বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী এবং সমধিক বলশালী। মনুষ্যলোকে তাঁর ন্যায় বলশালী এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া কঠিন। দান, দাক্ষ্য (দক্ষতা), শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান), শৌর্য লজ্জা, কীর্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপমশ্রী, ধৈর্য ও সন্তোষ প্রভৃতি গুণাবলী কৃষ্ণে সতত বিরাজমান। যে ষড়ৈশ্চর্য গুণ মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে—সেই সকল গুণের একমাত্র অধিকারী কৃষ্ণ। তাই কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

ভীষ্ম ক্ষণিক বিরামের পর কৃষ্ণকে বিশদভাবে দেবত্বে উন্নীত করলেন। কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্তা এবং সর্বভূতের অধীশ্বর—সুতরাং কৃষ্ণ যে পরম পূজনীয় তাতে আর সন্দেহ কী? যুধিষ্ঠির, তুমি শিশুপালকে যজ্ঞসভা ত্যাগ করার অনুমতি দান কর। চেদিরাজ সভা পরিত্যাগ করলে যজ্ঞের কোনও ক্ষতি সাধন হবে না।

ভীষ্মের কথা শেষ হওয়া মাত্র কৃষ্ণের অপমানে উত্তেজিত সহদেব বলে উঠল, যারা কৃষ্ণকে হিংসা করে আমি তাদের মস্তকে এই পদ রক্ষা করলাম।

সহদেবের গর্বিত বাক্যের জন্যে কোনও নৃপতিকণ্ঠই প্রতিবাদী হল না। এই সময় দেবর্ষি নারদ বললেন, যারা পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের আরাধনায় অনিচ্ছুক, তারা মনুষ্যাধম এবং জীবন্মৃত।

তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও উচিত নয়।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি-বিশেষজ্ঞ সহদেব এই সময় পূজার্হ জনগণের পূজা এবং কৃষ্ণের অর্চনা সম্পাদন করল।

কিন্তু সহদেবের মন্তব্য কৃষ্ণ-বিরোধীদের মর্মস্থল বিদ্ধ করেছিল। সুনীল নামে জরাসন্ধ-গোষ্ঠীভুক্ত এক পরাক্রান্ত নৃপতি শিশুপালের স্বপক্ষে গর্জন করে উঠল, আমি এই অন্যায় স্বীকার করি না। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।

শিশুপাল তার পক্ষীয় রাজন্যদের সরব হতে দেখে উৎসাহিত হয়ে চিৎকার করল, কুলাধম ভীষ্মটাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে দগ্ধ কর। বৃষ্ণি কৃষ্ণকে বধ কর। তারা স্পষ্টতই যজ্ঞ নষ্ট করার দিকে অগ্রসর হল।

অশুভ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হলেন যুধিষ্ঠির। তিনি পরমপ্রাজ্ঞ ভীষ্মকে বললেন, হে পিতামহ! সভাস্থ অনেক নৃপতি সংক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাদের শান্ত করার উপায় নির্ধারণ করুন।

কুরুপিতামহ ভীষ্ম বললেন, হে যুধিষ্ঠির! শান্ত হও। যজ্ঞের রক্ষাকর্তা স্বয়ং কৃষ্ণ। সিংহবিক্রম বাসুদেবের কাছে ওদের চিৎকার কুকুরের আর্তনাদের মতোই শোনাবে। শিশুপালের মৃত্যু আসন্ন, তাই এত আস্ফালন।

ভীষ্মের উক্তিতে শিশুপাল ক্রোধে অধীর হয়ে বলতে লাগল, রে বৃদ্ধ! বিভীষিকা প্রদর্শন করতে কি তুই লজ্জা বোধ করছিস না! তুই বয়সে বৃদ্ধ হলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হোস নি। তাই তোর মুখে কৃষ্ণের অযাচিত প্রশংসা। যে বাল্যকালে নিকৃষ্ট গোপকুলে অসংস্কৃত জীবন-যাপন করেছে, সে কি করে রাজকুলের মর্যাদা উপলব্ধি করবে? গোচারণে গিয়ে বনে-জঙ্গলে যে দু-একটি হিংস্র পশুর জীবন নাশ করেছে—রাখাল বালকেরা গোপালের সেই কার্যকে বীরত্ব বলে প্রচার করেছে। কৃষ্ণ বাল্যকালে পক্ষী এবং অশ্ব ও বৃষভ বিনাশ করেছিল, চেতনাশূন্য কাষ্ঠময় শকট পাদদ্বারা

পাতিত করেছিল—একেই তুই অদ্ভুত কর্ম বলে প্রচার করছিস? যে কৃষ্ণ কংসের অন্নে প্রতিপালিত—সেই অন্নদাতা কংসকে সে সংহার করেছে। রে কুরুকুলাধম ভীষ্ম! তুই অধার্মিক। তোকে কিছু উপদেশ দান করছি। শোন, সাধু ব্যক্তিরা বলেন—গো, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা ও প্রতিজ্ঞা দ্বারা আশ্বাসিত ব্যক্তির উপর অস্ত্রাঘাত করবে না। রে কৌরবাধম! তোর বাক্য মিথ্যে হলেও—তোকে আর কিছুই বলতে চাই না। কারণ স্তাবকের স্তুতি অত্যুক্তিদোষে দুষ্ট হলেও—তার চাটুকারিতার জন্যে তাকে কেউ শাসন করে না। তোর কথায় গোঘাতি বিশ্বাসঘাতক কৃষ্ণের পূজা করব? রে ভীষ্ম! তুই অধার্মিক ও জঘন্য প্রকৃতির। তাই তুই যাদের মন্ত্রী, কৃষ্ণ যাদের পূজনীয়, সেই পাণ্ডবদের স্বভাবও যে দূষিত হবে তাতে আর সন্দেহ কী? তুই ধার্মিকের ভান করে যে সকল কার্য করছিস তা অধর্মের চূড়ান্ত। নইলে ধার্মিকপ্রবর কাশীরাজের কন্যা বাগদত্তা হওয়া সত্বেও তুই কোন নীতিজ্ঞানে তাদের অপহরণ করেছিলিস? তোর অপকীর্তির কথা আর কত ব্যক্ত করব! তোরই সম্মুখে তোর ভ্রাতৃজায়াদের গর্ভে সন্তান উৎপাদিত হল। রে ভীষ্ম! তুই ব্রহ্মচর্যের আবরণে নিজের ক্লীবত্বকে গোপন করার প্রয়াস পেয়েছিস। কোন ব্যক্তি এই জঘন্য কার্যকে ন্যায় বলে স্বীকার করবে? তুই কৃষ্ণকে জগদীশ্বর বলে প্রচার করছিস। তুই পাণ্ডবদের অধর্মের পথে পরিচালিত করছিস। তোর মতো ক্লীব-নপুংসক যাদের পথপ্রদর্শক—তাদের পক্ষে অধর্মের কাজ করা কিছুমাত্র আশ্চর্যের নয়।

বৃকোদর শিশুপালের কুৎসা রটনা এবং কটূক্তি শ্রবণে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে শিশুপালকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। কিন্তু ভীষ্ম কৃতান্ত ভীমকে নিরস্ত করলেন। তিনি বললেন, হে বৃকোদর! শান্ত হও। সভাস্থ সকলেই শুনেছেন এই পাপাত্মা শিশুপাল আমার প্রতি কি নিদারুণ কটূক্তি এবং অপমানসূচক

বাক্য প্রয়োগ করেছে। তা সত্ত্বেও আমি ধৈর্য ধারণ করে শান্ত রয়েছি। কারণ যজ্ঞ রক্ষাকর্তা স্বয়ং বাসুদেব এখানে উপস্থিত। যথা কর্তব্য তিনিই স্থির করবেন।

কৃষ্ণস্তুতি শুনে শিশুপাল আবার উন্মাদ হয়ে উঠল। সে কুরুপিতামহকে বলল, রে ভীষ্ম! স্তাবকের কার্যই যদি তোর প্রিয়, তবে কৃষ্ণের স্তুতি না করে এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন বহু বীর, তাদের স্তুতি কর। বাহ্লিকরাজ দরদের স্তুতি পাঠ কর—যাঁর প্রতাপে পৃথিবী কম্পমান। মহাবীর কর্ণের প্রশংসা কর—যিনি বীরগণের শিরোমণি, বাসবের ন্যায় যুদ্ধদুর্মদ। মহারথ দ্রোণ ও অশ্বত্থামার স্তব কর—যাঁদের তেজে পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে। সসাগরা পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর দুর্যোধনের স্তব না করে কৃষ্ণের স্তব করছিস? দৃঢ়বিক্রম রাজা জয়দ্রথ, প্রখ্যাত বীর কিন্নরাচার্য দ্রুম, আচার্য কৃপ, মহাধনুর্ধর রুক্মি, ভগদত্ত, বিরাট, দ্রুপদ, বৃহদ্বল, শকুনি, অবন্তীর বিন্দ, অনুবিন্দ প্রমুখ বীরগণকে উপেক্ষা করে কেশবের প্রশংসা করছিস কেন? রে ভীষ্ম! তোর যদি নিতান্তই স্তব করতে হয় তবে এই সভায় শল্য প্রভৃতি আরও অনেক মহারথ আছেন, তাঁদের স্তব কর। তুই কেশবের স্তব করে অন্যান্য নৃপতিদের বিরাগভাজন হয়েছিস। তবু তাঁরা এখনও তোকে সহ্য করছেন। কেন না তোকে তাঁরা ভূলিঙ্গ-নামা (ক্ষুদ্র পক্ষী বিশেষ) পক্ষীর ন্যায় জ্ঞান করেন। সেই পক্ষী সিংহের দন্ত সংলগ্ন মাংস সংগ্রহ করে। সিংহের অনুগ্রহেই সে জীবিত থাকে। ভীষ্ম তোর জীবনও তেমন ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন। তাঁরা ইচ্ছা করলেই তোর প্রাণ সংহার করতে পারেন।

শিশুপালের এইরূপ কটুবাক্য শ্রবণ করে ভীষ্ম বললেন, হে চেদিরাজ! তুমি বলছ, আমার জীবন এই সকল মহীপালগণের করুণাধীন, কিন্তু আমি এঁদের তৃণজ্ঞানও করি না।

ভীষ্মের এই কথায় সভায় প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। মহী-

পালদের কেউ কেউ ক্রোধে বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগলেন। কেউ কেউ কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন। কোনও কোনও ধনুর্ধর বলে উঠলেন, এই গর্বিত কুলাঙ্গার ক্ষমার অযোগ্য, একে পশুর ন্যায় বধ কর অথবা অগ্নিতে দগ্ধ কর।

তখন কুরু-পিতামহ ভীষ্ম বললেন, হে নৃপতিবৃন্দ। তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর বা অগ্নিতে দগ্ধ কর বা যা তোমাদের ইচ্ছা তা কর, এই আমি তোমাদের মস্তকে পদাঘাত করছি। আমরা যাঁর পূজা করছি, সেই চক্রধারী বাসুদেব সম্মুখে বিদ্যমান। যার সাহস আছে, তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান কর।

ভীষ্মের এই বাক্যে শিশুপাল ক্রোধে জ্বলে উঠল। সে কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করে বলল, কৃষ্ণ তোকে আমি যুদ্ধে আহ্বান করছি। এই যজ্ঞসভায় পাণ্ডবগণের সঙ্গে তোকে যমালয়ে পাঠাব।

কৃষ্ণের পক্ষে আর নিস্পৃহ থাকা সম্ভব হল না। কারণ, যুদ্ধে আহূত হলে ক্ষত্রিয় কখনই নিস্পৃহ থাকতে পারে না। এই-ই ক্ষত্রিয় ধর্ম। তাছাড়া তিনি ছিলেন যজ্ঞ রক্ষাকর্তার ভূমিকায়। যজ্ঞ রক্ষা করা তাঁর অনুষ্ঠেয় কর্ম। শিশুপাল-জোট যজ্ঞ নষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। এখন আর তাকে ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না।

এবার বাসুদেব শিশুপালের কীর্তিকাহিনী প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় বলে বোধ করলেন। কারণ, শিশুপালের কীর্তিকাহিনী প্রকাশ করলে—শিশুপাল যাদের প্ররোচিত করেছে—তাদের অনেকেই নিশ্চয় দলত্যাগ করবে। এসব ছাড়াও শিশুপালকে নিধন করার স্বপক্ষে প্রকৃত যুক্তির অবতারণা করাও নিতান্তই আবশ্যক। কৃষ্ণ বললেন, শিশুপাল আমার নিকট আত্মীয়। পাণ্ডবদের মতোই সেও আমার আর এক পিতৃস্বসার পুত্র। এর অনেক অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি। আজ সে তার সকল অপরাধের সীমা লঙ্ঘন করেছে—শান্তনুনন্দনকে হীন ভাষায় কটূক্তি করেছে—আপনারা জানেন



গঙ্গাপুত্র এক মহান চরিত্রের পুরুষ। এই শিশুপাল চিরকালই আমার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে এসেছে। জরাসন্ধ যখন মথুরা আক্রমণ করে তখন জরাসন্ধের সেনাপতি শিশুপাল আমায় বন্দী করার প্রয়াস করে—যদিও ব্যর্থ হয়। আমি যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে—শিশুপাল তখন দ্বারকায় অগ্নি সংযোগ করে পলায়ন করে। কোনও এক সময়ে সে অরক্ষিত দ্বারকাকে আক্রমণ করে বহু যাদবকে হত্যা ও বন্দী করে। পিতা বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব সে চুরি করে। এসবই ছিল দণ্ডযোগ্য অপরাধ। কিন্তু যেহেতু সবই ছিল ব্যক্তিগত স্তরে—তাই তাকে ক্ষমা করেছিলাম। পূর্বে জরাসন্ধ মথুরা জয় করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি অযথা লোকক্ষয় কামনা করি নি। তাই মথুরা থেকে বহু দূরে দ্বারকায় একরকম নির্বাসনই গ্রহণ করেছিলাম। তবু জরাসন্ধ তখনও পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত শত্রুতে রূপান্তরিত হয় নি। কিন্তু যখন দেখা গেল, জরাসন্ধ ছিয়াশিজন রাজাকে বন্দী করে বলিদানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন—তখন তো ধর্ম লঙ্ঘিত হল। কারণ, নরবলি অধর্মাচার। জরাসন্ধের নিধনে আমি কোনও ছলনার আশ্রয় নিই নি। শত্রুবেশে নগরে প্রবেশ করে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ধর্ম পালন করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি তা স্বীকার করেন নি। অতঃপর আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম যে ভীম, অর্জুন আর আমি—এই তিনজনের মধ্যে থেকে যে কোনও একজনের সঙ্গে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হোন। আমি গোপালক—ঘৃণায় তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অর্জুন কনিষ্ঠ—তাই তিনি অর্জুনকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে স্বীকার করতে চান নি। তিনি মৃত্যুরূপী ভীমকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং সর্বসমক্ষে চোদ্দদিন ব্যাপী এক দীর্ঘ মল্লযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। এতে আমার ছলনার কিছু ছিল না। জরাসন্ধকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে আমাদেরও প্রাণ সংশয় হতে পারত। ধর্ম আমাদের রক্ষা করেছেন—যেহেতু আমরা

ধর্মকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।

এক্ষণের ভীষ্মনিন্দা, পাণ্ডবনিন্দা, যজ্ঞ নষ্ট করার চক্রান্ত এবং আমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করা—এ সমস্তই নির্দেশ করেছে, শিশুপালের মৃত্যু সন্নিকট। আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না।

বাসুদেবের বক্তৃতা শিশুপাল-পক্ষের অধিকাংশ নৃপতিকে নিরুৎসাহ করল। তারা শিশুপালের সাহায্যে অগ্রসর হল না। শিশুপাল একাকী বাসুদেবকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। মুহূর্তের মধ্যে বাসুদেব তাঁর চক্রাস্ত্রের সাহায্যে শিশুপালের শিরচ্ছেদ করলেন।

সভার সকলে এই ভীষণ কার্য দর্শনে কিছুক্ষণের জন্য মৌন-মূক হয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির স্থির চিত্তে শিশুপাল-নিধনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকলেন।

অতি উৎসাহী রাজারা নীরব হয়ে রইলেন। মহর্ষি, ব্রাহ্মণেরা খুশির ভাব প্রকাশ করলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের আদেশ করলেন, শিশুপালের মৃতদেহের সংকার কর। রাজাহীন রাজ্য থাকতে পারে না। তাই তিনি কৃষ্ণের সম্মতিতে শিশুপালের পুত্রকে চেদির সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন সেই যজ্ঞ-সভায়।

যজ্ঞরক্ষাকর্তা কৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণ করে সভাস্থল পরিভ্রমণ করতে থাকলেন। যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে যজ্ঞের যথাকর্তব্য সমাপ্ত করলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির অবভৃথ স্নান করলেন। এই সময়ে ভূপতি-গণ সমবেত হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি মহা ভাগ্যবান। আপনি নির্বিঘ্নে সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেন। আপনি কুরুবংশীয় নৃপতিদের যশ বর্দ্ধন করলেন। আমরা আপনার প্রীতি কামনা করি। অনুমতি করুন, আমরা নিজ-নিজ রাজ্যে গমন করি।

রাজন্যরা এবং অন্যান্য অতিথিগণ বিদায় নিলে কৃষ্ণও একদিন বললেন, হে ধর্মরাজ! বহুদিন হল দ্বারকা ত্যাগ করে এসেছি।

এবার আমাকেও অনুমতি করুন, দ্বারকায় গমন করি।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ! এই সাম্রাজ্য তোমারই কৃপার দান। কিন্তু স্বার্থপরের ন্যায় তোমাকে আমি ইন্দ্রপ্রস্থে বন্দী করে রাখতে পারি না। তুমি দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন কর—কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের কথা স্মরণে রেখো। তোমার অনুপস্থিতিতে ইন্দ্রপ্রস্থ অন্ধকার। পাণ্ডবেরা অসহায়।

কৃষ্ণ পিতৃষ্বসা কুন্তীর কাছে বিদায় নিয়ে, দ্রৌপদী আর সুভদ্রার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সারথি দারুককে রথ প্রস্তুত করতে বললেন।

বাসুদেবের রথ দ্বারাবতীর পথে যাত্রা করল। পঞ্চপাণ্ডব পদব্রজে বাসুদেবের রথের অনুসরণ করলেন। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হলে বাসুদেব রথ থেকে নেমে পুনরায় বিদায় গ্রহণ করে তাদের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করার অনুরোধ জানালেন। সকলকে অশ্রুসিক্ত করে কৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ রথ দ্রুত বেগে দ্বারকার পথে ধাবিত হল।

হস্তিনাপুরের অতিথিবৃন্দের বিদায় নেওয়া শুরু হল। দুর্যোধন বিদায় প্রার্থনা করতে এলে যুধিষ্ঠির বললেন, তা হয় না। আরও কয়েকটি দিন এখানে অতিবাহিত করে যাও। অগত্যা দুর্যোধনকে থেকে যেতেই হল। যজ্ঞাগার, সভাগৃহ ইত্যাদি সে পর্যবেক্ষণ করে স্তম্ভিত হল। পাণ্ডবদের অতুল ঐশ্বর্য তাকে হতবাক করে তুলল। অপরিমিত ধনরত্ন—কোষাগারেও স্থান সংকুলান হয় নি। উপহার গ্রহণের দায়িত্ব ছিল দুর্যোধনেরই ওপর। কিন্তু তখন সে প্রকৃত পরিমাণ সম্পর্কে অনুমান করতে পারে নি। এখন অমিত ধনরত্ন তার মনে ঈর্ষার বীজ রোপণ করা শুরু করল।

দ্যূত সভা

কয়েকদিন পর দুর্যোধন মাতুল শকুনির সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাকে বিষণ্ন নিরুত্তাপ দর্শন করে শকুনি প্রশ্ন করল, তুমি এমন হতোদ্যম কেন, ভাগিনেয়? এমন উৎসাহহীন বিমর্ষ তো তোমায় কখনও দেখি নি!

দুর্যোধন বলল, মাতুল, ঈর্ষার বিষদংশনে আমি মৃতপ্রায়। পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি, ধনরত্ন আমায় উন্মাদ করে দিয়েছে। আমার জীবন ধারণ করাই বৃথা।

শকুনি বলল, এতে ক্ষোভের কী আছে? তোমার যা সহায় এবং সম্বল রয়েছে তার সাহায্যে তুমি বিশ্বজয় করতে পার। যে পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথাদি বীরগণ রয়েছেন—তাকে পরাভূত করে কোন শক্তি?

উৎসাহিত হয়ে উঠে দুর্যোধন বলল, তাহলে আমি ইন্দ্রপ্রস্থ আক্রমণ করতে চাই। জয় করতে চাই ইন্দ্রপ্রস্থ।

শকুনি বলল, তুমি উন্মাদ। যুদ্ধ করে তাদের জয় করা অসম্ভব। ও পক্ষে রয়েছে পাঞ্চালেরা, যাদবেরা এবং স্বয়ং কৃষ্ণ!

—তবে! হতাশ স্বরে দুর্যোধন বলল।—তবে আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কী? পাণ্ডব-পাণ্ডব-পাণ্ডব! অসহ্য!

শকুনি ক্রুর হাস্য করে বলল, অস্ত্রের চেয়ে ভয়ানক অস্ত্র রয়েছে আমার কাছে। তুমি পাণ্ডবদের ধনসম্পত্তি—রাজ্য করায়ত্ত করতে চাও তো? বেশ। তাই হবে।

সন্দিগ্ধ চোখে দুর্যোধন বলল, কী সেই অস্ত্র?

—দ্যূত। দ্যূতসভার আয়োজন কর। আমি পাণ্ডবদের সর্বস্ব তোমার চরণে সমর্পণ করব। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়া পছন্দ করেন বটে। তবে দক্ষ নন এবং কৌশলীও নন। আমি কপট দ্যূতে তার সর্বস্ব হরণ করব। কিন্তু……।

—কিন্তু কিসের মাতুল ?

—তোমার পিতার অনুমতি প্রয়োজন। বিদুর থাকতে সে অনুমতি লাভ করা বড়ই কষ্টকর। আর তোমার পিতার আদেশ হলে যুধিষ্ঠির যোগদান করতে বাধ্য।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বরে দুর্যোধন বলল, সে দায়িত্ব আমার! পিতাকে মতদান করতে আমি বাধ্য করব।

হস্তিনাপুরে ফিরে এসে দুর্যোধন বিমর্ষভাবে দিন কাটাতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্র এই বিমর্ষতার সংবাদ জ্ঞাত হয়ে পুত্রকে আহ্বান করলেন।

দুর্যোধন পিতৃসমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, হে পিতা! হস্তিনার সিংহাসনে উপবেশন করার আনন্দ আমার ম্লান হয়ে গেছে। এখন প্রজারা কেবল ইন্দ্রপ্রস্থেরই জয়গান করে। ইন্দ্রপ্রস্থের সমৃদ্ধি দর্শন করে এসে আমার হস্তিনাকে এখন তুচ্ছ বলে মনে হয়। তারা ঊষর খাণ্ডবপ্রস্থে অমরাবতী রচনা করেছে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পুত্র তোমাকে সুখী করার তো কোনও ত্রুটি করিনি আমি। রাজ্য বণ্টনের ব্যাপারেও আমি সমৃদ্ধিশালী অংশটুকু তোমাকেই দান করেছিলাম। তারা নিজের প্রচেষ্টায় উন্নতি লাভ করেছে। এ তো সুখের কথা। এতে তোমার হিংসা করা উচিত নয়। তুমিও যদি রাজসূয় যজ্ঞ করে আরও সাম্রাজ্য—আরও ধনের অধিকারী হতে চাও—তবে তার আয়োজন কর। পাণ্ডবেরা তোমার জ্ঞাতিভ্রাতা। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। তাদের হিংসা করা কোনক্রমেই উচিত নয়। হিংসা ধ্বংস আনয়ন করে। যুধিষ্ঠির হিংসা করে না। তার মধ্যে পরশ্রীকাতরতা নেই। তাই তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। সে তোমাকে স্নেহ করে—আমাকে পিতৃজ্ঞান করে। তার অমঙ্গল কামনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। তারা দিক্‌পাল এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাও। তাদের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ করাও বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

দুর্যোধন বলল, হে পিতা! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি নই। তবু শাস্ত্রের বাণী আমারও কিছু জানা রয়েছে। যে ব্যক্তি রাজা —তার যদি হিংসাই না থাকে—সে রাজ্যের উন্নতি সাধন করতে পারে না। আমি বুঝতে পারছি না, স্বার্থ সাধনে কেন আপনার এই অনীহা? বৃহস্পতি বলেছেন, সামাজিক-ব্যাপার, ও রাজ্য-ব্যাপার উভয়ই স্বতন্ত্র বিষয়। রাজারা সব সময়ে অপ্রমত্ত চিত্তে স্বার্থ চিন্তা করবে। ক্ষত্রিয়দের জয়ই প্রধান বৃত্তি। জিগীষু ব্যক্তি পর-সম্পত্তি গ্রহণাভিলাষে সর্বদিকে ধাবমান হয়। কে শত্রু, কে মিত্র—কোনো নির্দিষ্ট সূত্র নেই। যে যাকে সন্তাপ দেয়—সেই তার শত্রু। সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ব্যাপারে অসন্তোষই মূল কারণ। পূর্ব সঞ্চিত ধন অন্যে বলপূর্বক হরণ করতে পারে। বলপূর্বক হরণ করাই রাজধর্ম। জাতি অনুসারে বৃত্তি সমান হলেই শত্রুতা হয়। শত্রু ক্ষুদ্র হলেও তাকে উপেক্ষা করতে নেই। কারণ বৃক্ষমূলে নির্ভর ক্ষুদ্র বল্মীক একদিন বৃক্ষকেই নিপাতিত করে। সেইরূপ শত্রু ক্ষুদ্র হলেও একদিন বলবীর্য লাভ করে সে তাকে সংহার করতে পারে। সর্বত্র নীতির অনুসরণ করলে সবসময়ে বিশেষ লাভবান হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি অর্থবৃদ্ধির চেষ্টা করে সে নিঃসন্দেহে জ্ঞাতিদের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তাই এখন আমার অন্য চিন্তা নেই। পাণ্ডব-লক্ষ্মীশ্রী করায়ত্ত করাই একমাত্র কামনা। নচেৎ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করব। আমার এ জীবন অর্থহীন।

বিচলিত ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পুত্র! জ্ঞাতিহিংসা কুল নাশ করে। পাণ্ডবেরা পরাক্রমশালী। শুধু তাই-ই নয়, দৈব তাদের সহায়। তাদের সঙ্গে সংগ্রামে তোমার ক্ষতিরই আশংকা। তুমি পাণ্ডব-হিংসা ত্যাগ কর।

—তবে অনুমতি করুন—আমি কৌশলে পাণ্ডব-রাজলক্ষ্মী জয় করার চেষ্টা করি। এতে লোকক্ষয় নেই। রক্তপাত নেই। ধনব্যয় নেই—অথচ জয় করার জন্যে রয়েছে সব কিছু।

—কেমন করে তা সম্ভব ?

—মাতুল শকুনি একজন প্রতিভাবান অক্ষক্রীড়াবিদ। তিনি আমার স্বপক্ষে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করবেন এবং যুধিষ্ঠিরের সর্বস্ব হরণ করবেন।

—পুত্র, দ্যূতক্রীড়া সর্বনাশকে আহ্বান করে।

—কিন্তু দ্যূতক্রীড়া তো রাজকীয় বিলাস !

—শোন, বৎস। আমি মহামন্ত্রী বিদুরের পরামর্শে চলি। তার সঙ্গে পরামর্শ করে আমি তোমায় আমার মতামত জানাব।

—বিদুর পাণ্ডবহিতৈষী। তিনি আমাদের ভাল দেখেন না। সুতরাং তিনি এই দ্যূতক্রীড়া অনুমোদন করবেন না। অতএব পিতা, আপনি বিদুরের সঙ্গেই থাকুন। আমায় বিদায় দিন। আমি হস্তিনা ত্যাগ করে যাব।

শকুনি এতক্ষণ নীরব ছিল। এবার সে বলল, মহারাজ ! পুত্র-বিচ্ছেদ কি আপনি সহ্য করতে পারবেন ?

—গান্ধার-নন্দন। তুমি কি দ্যূতক্রীড়া অনুমোদন করেছ ?

—হ্যাঁ মহারাজ ! পাণ্ডব-রাজলক্ষ্মী জয় করার এটিই সহজতম পথ। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় কৌশলী বা পারদর্শী কোনটিই নয়। কিন্তু আপনি আহ্বান করলে যুধিষ্ঠির তা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। আপনি অনুমতি দিন মহারাজ।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন, শোন পুত্র। বলবান ব্যক্তিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার মোটেই অভিপ্রেত নয়। কারণ, বৈরভাব থেকে বিকার জন্মে। সেই বিকার অলৌহ-নির্মিত অস্ত্রস্বরূপ। বৎস ! তুমি যে এই অনর্থকর সংগ্রাম ঘটানোর সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ—এই অসাবধানতা থেকেই শাণিত শায়ক ও অসি নিষ্কাশিত হবে।

উত্তরে দুর্যোধন বলল, পূর্বে বহু ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান করতেন। তাতে কোনও বিকৃতি বা সংগ্রাম-সম্ভাবনা দেখা যায় নি।

অতএব, মাতুলকে অনুমোদন করুন। সভা নির্মিত হোক।

অন্ধ পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মজ্ঞান-নীতিজ্ঞান ভেসে গেল। বিদুরকে আহ্বান করে তিনি বললেন—হে বিদুর, তুমি আমার বার্তাবহ রূপে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কর। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান জানাবে। উদ্দেশ্য নবসভাগৃহের উদ্বোধন।

বিদুরের কোনও প্রতিবাদই গ্রাহ্য হল না। কোনও ধর্মকথা ধৃতরাষ্ট্রকে স্পর্শ করতে পারল না। অতএব একদিন ভগ্নদূতের মতোই বিদুর গিয়ে উপস্থিত হল ইন্দ্রপ্রস্থে।

যুধিষ্ঠির সাদর অভ্যর্থনা জানালেন পিতৃব্য বিদুরকে। প্রশ্ন করলেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

বিমর্ষ বিদুর বললেন, তিনি পিতৃব্য হিসাবে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হন নি। তিনি এসেছেন ধৃতরাষ্ট্রের বার্তাবহ রূপে। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের নবসভাগৃহের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আহূত দ্যূতক্রীড়ায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

যুধিষ্ঠির জানেন, এইসব প্রতিযোগিতামূলক দ্যূতক্রীড়ার পরিণতি। পরাজিতের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। নির্বোধের মতো আচরণ করে সে। তবু তিনি জানতে চাইলেন, হে পিতৃব্য এহেন দ্যূতক্রীড়ায় আমার যোগদান করা উচিত কি অনুচিত ?

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বিদুর বললেন, হে পুত্র! আজ আমি পিতৃব্য হিসাবে উপদেশ দানে অক্ষম। কারণ, আমার আগমন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বার্তাবহ রূপে—তোমাদের পিতৃব্য হিসাবে নয়। উচিত-অনুচিতের সিদ্ধান্ত তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, বেশ। তবে বলুন কোন কোন অক্ষক্রীড়াবিদ উপস্থিত হচ্ছেন ?

বিদুর বললেন, কেন ? যোগদান করছে শকুনি, বিবিংশতি, চিত্রসেন, সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, সব অসৎ-কপট ক্রীড়াবিদদেরই সমাবেশ

ঘটবে তাহলে ! আমি এক ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি ।

বিদুর নীরব রইলেন ।

যুধিষ্ঠির বললেন, রণ বা দ্যূতের আহ্বানে সাড়া দেওয়া ক্ষত্রিয় মাত্রেরই ধর্ম । তাছাড়া, এ আহ্বান এসেছে জ্যেষ্ঠতাতের কাছ থেকে । তাঁর আদেশ অলঙ্ঘনীয় । হে পিতৃব্য ! মহারাজকে বলবেন, পাণ্ডবেরা ধর্ম পালন করার জন্য দ্যূতক্রীড়ায় নিশ্চয়ই উপস্থিত হবে ।

—বিষণ্ণ বিদুর বললেন, তোমাদের কল্যাণ হোক । এরপর তিনি বিদায় নিয়েছিলেন ।

নির্দিষ্ট দিনে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন । সকলের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করার পর বিশ্রাম নেবার আয়োজন করলেন ।

পরদিন প্রভাতে পূর্ণসভাগৃহে প্রবেশ করলেন যুধিষ্ঠির । তাঁর পশ্চাতে প্রবেশ করল তাঁর চার ভ্রাতা । প্রণামাদি শিষ্টাচারের পালা সাঙ্গ করে ভ্রাতাদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করলেন তিনি । তারপর দুর্যোধনকে প্রশ্ন করলেন, ক্রীড়া কিভাবে হবে ?

দুর্যোধন বলল, আমার হয়ে অক্ষ নিক্ষেপ করবেন মাতুল শকুনি । শর্ত মতো অর্থ-ধন আমি দেব ।

ক্ষণিকের জন্যে চিন্তাগ্রস্ত দেখাল যুধিষ্ঠিরকে । তিনি শকুনিকে বললেন, মাতুল ! কোনো শঠতার আশ্রয় নেবে না তো ?

শকুনি ক্রুদ্ধ হল । সে বলল, হে ধর্মরাজ ! যদি সংশয় থাকে তবে ক্রীড়ায় যোগদান কোরো না । আমরা বুঝব, ধর্মরাজ ভীত হয়েছেন ।

ক্লিষ্ট হেসে যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যূতে আহূত হলে তা স্বীকার না করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্মজনক । আমি প্রস্তুত ।

ক্ষণিক মাত্র সময়ের ব্যবধান । যা সংঘটিত হবার ছিল—তাই-ই সংঘটিত হল । শকুনির পাশার দানে যুধিষ্ঠির এক এক করে তাঁর

সমস্ত সম্পদ, রাজ্য, এমনকি ভ্রাতাদেরও হারালেন। শেষ দান—যুধিষ্ঠির ব্যবহার করেছেন স্বয়ং নিজেকে।

সারা সভাগৃহ নিস্তব্ধ-নিঝুম। অধীর উত্তেজনায় টানটান। শুধুমাত্র সুবলনন্দন শকুনির দুহাতের তালুর মধ্যে পাশাগুলি ঘর্ষিত হয়ে খড়্‌খড়্ শব্দ সৃষ্টি করছে। সভাসদদের হৃদপিণ্ডের শব্দটুকুও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাদের ভয়ার্ত দৃষ্টিগুলি লোভ আর ধূর্ততার প্রতিমূর্তি শকুনির মুখের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে।

এক সময় শকুনি সাপের মতো বিষাক্ত-পিচ্ছিল এক হাসি উপহার দিয়ে পাশাগুলিকে গড়িয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে সকলের দৃষ্টি শকুনির মুখের ওপর থেকে সরে গিয়ে পাশাগুলির ওপর যেন সবেগে পতিত হল। পরমুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রদের কর্ণ বধির-করা চিৎকারে সভাস্থল পূর্ণ হয়ে উঠল,—যুধিষ্ঠির—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এখন আমাদের দাস মাত্র!

দুর্যোধন আনন্দে-উত্তেজনায় অসভ্যের মতো নৃত্য করে উঠল—ধন্য, মাতুল! তুমি ধন্য! যুধিষ্ঠির কৌরবের দাস···! হে···হা ···হা······। হাসির গমকে ভূলুণ্ঠিত হল দুর্যোধন। সঙ্গে সুর মেলাল দুঃশাসন প্রভৃতি অন্যান্য ভ্রাতারা এবং তাদের সুহৃৎগণ।

চক্ষু বিস্ফারিত করে অপলকে যুধিষ্ঠির দৃষ্টিপাত করেছিলেন তাঁর সম্মুখে পড়ে থাকা পাশাগুলির দিকে। ভাবলেন, ওগুলি পাশা নয়—তাঁর বিধ্বস্ত ভাগ্য। মুখ তুলে ভ্রাতাদের দিকেও দৃষ্টিপাত করতে সংকোচ হচ্ছিল তাঁর। সবকিছু হারাবার আগেই তাঁর থামা উচিত ছিল। কিন্তু কেউ পারে না। দ্যূতে পরাজিত মানুষটি হয় যূপবদ্ধ পশুর ন্যায়। পরিণামে—তাঁরই অবিমৃষ্য-কারিতায় মহান পাণ্ডবেরা এই মুহূর্তে ভিখারীরও অধম—দাসে পরিণত হয়েছে। সর্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত। কী ভীষণ বেদনা! কিন্তু তিনি কীই বা করতে পারতেন? সর্বস্বান্ত হওয়ার পূর্বেও যদি তিনি ক্ষান্ত হতেন তবে তা হত অক্ষত্রিয়সুলভ আচরণ,

অধর্ম। সংসারে অযশ ঘোষিত হত। আর এ তো ষড়যন্ত্র! এই ষড়যন্ত্রের কথা তিনি কি ক্রীড়ায় যোগদান করার পূর্বেই উপলব্ধি করতে পারেন নি? সভাসদেরা কি জানেন না যে শকুনি কপট-দ্যূতে তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছে?

হঠাৎ সভাস্থলে পুনর্বার যেন বিস্ফোরণ ঘটল। মহামন্ত্রী বিদুর চিৎকার করে উঠলেন, মহারাজ! আপনি জাগ্রত না নিদ্রিত? আপনারই সম্মুখে পাণ্ডবদের ধনসম্পত্তি সব লুণ্ঠন করে ধর্মরাজকে দাসে পরিণত করা হয়েছে—এ আপনি সহ্য করছেন? সৌবল শকুনির শঠতা আর আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের লোভ-হিংসা কুরুকুলকে যে এক মহাসর্বনাশের প্রান্তে উপস্থিত করে দিয়েছে তা কি উপলব্ধি করতে পারছেন? পবিত্র — মহান ভরতকুলকে যদি রক্ষা করতে চান, নিজে যদি রক্ষিত হতে ইচ্ছুক হন, তবে কুলাঙ্গার দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন। দূর করুন ওকে! ধর্মরাজ কি না আজ দাস! এ কল্পনারও অতীত!

বিদুরের তীব্র ভর্ৎসনায় সভার উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল। বিদুরের সাবধানবাণী নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সত্যি! একি মহা অনর্থপাত!

পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে দেখে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল দুর্যোধন। ভীষণ স্বরে—অভব্য ভাষায় সে বলে উঠল, ক্ষত্তা বিদুর! তুই চিরকাল কৌরবদের অন্নে প্রতিপালিত হয়েও পাণ্ডবদের জয়গান করে এসেছিস! এখনও করছিস! তুই যদি সম্পর্কে পিতৃব্য না হতিস তবে এই মুহূর্তে তোকে বধ করতাম।

দুর্যোধনের মুখনির্গত বাক্যবাণগুলি সায়কের মতো বিদ্ধ করল যুধিষ্ঠিরকে। তাঁদের সম্মুখে দুর্যোধন ধর্মাত্মা, বিদুরকে অপমান করার দুঃসাহস করেছে। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি শান্ত হবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা এখন সর্ব অধিকার-বঞ্চিত দাস মাত্র। প্রতিবাদ-ক্ষমতা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত। স্বাভা-

বিক ভাবে বৃকোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। ক্রুদ্ধ সিংহ-সদৃশ ভীম দুর্যোধনকে বধ করার জন্য নীরব অনুমতি প্রার্থনা করল। অসহায়ভাবে যুধিষ্ঠির মস্তক অবনত করে নিলেন।

অপমানে-লজ্জায় কম্পিত দেহে বিদুর বসে পড়লেন। যুধিষ্ঠির যান্ত্রিকভাবে এক এক করে পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ আর কৃপাচার্যের দিকে তাকালেন। তাঁরাও সবাই নতমস্তক, বিস্মিত হলেন যুধিষ্ঠির, শকুনির শঠতাকে না হয় তাঁরা স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু বিদুরের অপমান! একী ভীষণ ক্লীবত্ব! দীনতা!

যুধিষ্ঠিরের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল শকুনি। দুর্যোধন যে উত্তেজনার বশে মাত্রাতিরিক্ত আচরণ করে ফেলেছে—তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। তবে লক্ষ্য পূরণের পূর্বেই সভাস্থল আলোড়িত হোক—এ কামনা করতে পারছিল না শকুনি। তাই সভাগৃহের মনোযোগ তার দিকে আকর্ষণ করার জন্যে সে যুধিষ্ঠিরকে বলল, হে ধর্মরাজ! তাহলে পরাজয় স্বীকার করছ?

শকুনির তীক্ষ্ন বাক্যশায়ক স্থানভ্রষ্ট হল না, যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করল। যুধিষ্ঠির জ্বলে ওঠার চেষ্টা করেও নিভে গেলেন—উপায় কী, মাতুল? পণ রাখার তো আর কিছু নেই! সবই তো জয় করে নিয়েছ, এমন কি আমাকেও।

ধূর্ত শৃগালের হাসি হাসল শকুনি।—রয়েছে, এখনও তোমার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ রয়ে গেছে। তাই পণ রাখ। আর নয় তো পরাজয় স্বীকার কর সর্বসমক্ষে।

অবাক হলেন যুধিষ্ঠির।—শ্রেষ্ঠ সম্পদ! কি সেটি?

শকুনি শান্ত স্বরে অতি ধূর্ততার সঙ্গে বলল, কেন? তোমার স্ত্রীরূপী সেই নারীরত্নটি রয়ে গেছে। বিস্মরণ ঘটেছে? দ্রোপদী—পাঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণা।

—দ্রোপদী! আর্তনাদ করে উঠলেন যুধিষ্ঠির।—অসম্ভব। এ তুমি কি বলছ মাতুল! এ কি সম্ভব?

নির্দয় শকুনি বলল, হ্যাঁ, দ্রৌপদী। পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদী—পাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠ রত্ন। পণ রাখ, পণ রাখ, ধর্মরাজ।

—না-না, মাতুল, না। এমন অশোভন কথা তুমি বোলো না। দ্রৌপদী কি পণ রাখার বস্তু? দ্রৌপদী জগতের সেরা সম্পদ। তোমার লোভের অগ্নিতে আমি সর্বস্ব আহুতি দিয়েছি। কিন্তু পাঞ্চালীকে দেব না, কখনই নয়।

শকুনি কপট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল,—মূর্খ, ধর্মরাজ, তুমি মূর্খ! আমি যদি বলি তোমার হারাবার মতো আর কিছু নেই—কিন্তু জয় করার মতো রয়ে গেছে সব কিছু!

—কেমন করে? বিস্ফারিত যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন।

—পাণ্ডবেরা দাস—তুমি দাসে পরিণত হয়েছ। তোমার—তোমাদের ব্যক্তিগত সব সম্পদ এখন কৌরবের—দ্রৌপদীও তাই দাসী। তবু তোমাকে আমি একটি সুযোগ দিতে ইচ্ছুক। পণ রাখ দ্রৌপদীকে। পাণ্ডবভাগ্যে দ্রৌপদী লক্ষ্মীস্বরূপা। কে জানে, তার ভাগ্যে তুমি আবার লাভ করবে কিনা তোমার হৃত সম্পত্তি—এমন কি এই হস্তিনাপুর। চিন্তা কর ভাগিনেয়, চিন্তা কর। হারাবার কিছু নেই, জয় করার রয়েছে সব কিছু। আমি পরাজয় কামনা করি না। চিরজয়ী পাণ্ডবেরা বিজয়ী হোক।

দৈবের ষড়যন্ত্রের বলি হতে বাধ্য হলেন যুধিষ্ঠির। পাশবদ্ধ পশুর অবস্থা তাঁর। বুদ্ধিভ্রষ্ট! তিনি চিন্তা করলেন, সত্যিই তো, হারাবার কিছু নেই। জয় করার জন্যে রয়ে গেছে সব কিছু। দ্যূতের দানে দ্রৌপদীকে হারাবার ভয়? দাসের স্ত্রী তো দাসী! তবে? স্ত্রী মাত্রেই পুরুষের সম্পত্তি। ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদী তো ইতিমধ্যেই দাসী।

আবার ধূর্তের হাসি হাসল শকুনি।—ঠিক আছে, ধর্মরাজ! যদি এতই দ্বিধা—তবে সর্বসমক্ষে স্বীকার কর, তুমি পরাজিত। পাণ্ডবেরা পরাজিত।

—পরাজয় ! চিরবিজয়ী পাণ্ডবেরা পরাজয় স্বীকার করবে ! পরাজয় শব্দটি পাণ্ডব-জীবন অভিধানে কোথায় ? যুধিষ্ঠিরের তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ লোহিতাভ হয়ে উঠল।—বেশ ! রাখলাম দ্রৌপদীকে পণ।

শকুনির হাতের তালুর মধ্যে পাশকগুলি আবার খড়্‌মড়্‌ শব্দ করে উঠল। চক্ষের নিমেষে সে গড়িয়ে দিল পাশকগুলি। —এই নাও।

পরমুহূর্তে আবার সেই গগনভেদী চিৎকার,—দ্রৌপদী আমাদের দাসী। দাসী। উৎকট নৃত্যে অধীর হয়ে উঠল ধার্তরাষ্ট্রেরা। সেই চিৎকারে ধৃতরাষ্ট্রেরও কপট নিদ্রা ভঙ্গ হল। ব্যগ্র কণ্ঠে তিনি জনান্তিকে প্রশ্ন করলেন, কার জয় ? কারা বিজয়ী হল ?

জনৈক সভাসদ বলে উঠল—আপনার পুত্রেরা। পাণ্ডবেরা পরাজিত।

যুধিষ্ঠির মস্তক অবনত করলেন। মস্তক অবনত করল ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে পাণ্ডবেরা দাসে পরিণত হয়েছে। এ যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা ! এ কী ভীষণ ষড়যন্ত্র !

যুধিষ্ঠির তাঁর সর্বনাশের কথা পূর্বে অনুমান করতে পারলেও পরাজয়ের পর যে অপমান-লাঞ্ছনা তাঁদের প্রাপ্য হবে—সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করতে পারেন নি। তিনি এই দ্যূতক্রীড়ার সর্বনাশের কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু বীভৎসতার কথা চিন্তা করতে পারেন নি।

সর্ব প্রথম আঘাতটি এল কর্ণের কাছ থেকে। পাণ্ডবদের পরাজয়ে তৃপ্ত অঙ্গরাজ কর্ণ দুর্যোধনকে বলল, সখা, পাণ্ডবেরা এখন দাসমাত্র। তাদের কী অধিকার রয়েছে যে তারা প্রভুদের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করবে ?

দুর্যোধনের জ্ঞানচক্ষু যেন উন্মীলিত হল।—আরে! তাই তো! ওরে কে কোথায় আছিস—দাসগুলোর পোশাক-আশাক—রত্নাদি খুলে নিয়ে ওদের ভূমির ওপর বসিয়ে দে!

দুর্যোধনের বশংবদ ভ্রাতা দুঃশাসন উৎসাহের সঙ্গে উঠে এসে যুধিষ্ঠিরের বাহুমূল আকর্ষণ করল।

পাণ্ডব তথা যুধিষ্ঠিরের এই অপমান শুধু কেবলমাত্র তাঁদেরই নয়—সমগ্র সভার অপমান। চর্শকেরা দুর্যোধনের ভয়ে ভীত হয়ে মস্তক আনত করে নিলেন। এক অজ্ঞাত আশংকায় তাঁরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ধর্মের প্রতীক—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। তাঁকে ভূমিতে উপবেশন করতে বাধ্য করানোর অর্থ ধর্মকেই ভূলুণ্ঠিত করা। কিন্তু দুর্যোধনকে প্রতিবাদ জানাবে কে? কার এত দুঃসাহস?

না। সাহসের অভাব কিছুমাত্র ছিল না বৃকোদরের মধ্যে। ধর্মরাজের এই অপমান তার অসহ্য বলে বোধ হল। সে নীরবে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করল ধার্তরাষ্ট্রদের যমলোকে প্রেরণ করার জন্যে।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর এই লাঞ্ছনা যদি দৈব কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় তবে তা তাঁকে স্বীকার করতেই হবে। ভীমের কাতর প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টি এড়াবার জন্যে তিনি আবার মস্তক অবনত করে নিলেন।

অনুশাসনবদ্ধ বৃকোদর নিরুপায় ক্রোধে ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে থাকল। অর্জুন বৃকোদরকে অনুভব করতে পারল। তাই সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, শত্রুকে খুশি করার জন্যে পিতৃসম অগ্রজকে অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। শান্ত হও।

চতুর অঙ্গরাজ কর্ণ নিশ্চিত হল যে যুধিষ্ঠির পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রতিবাদ করবেন না বা কৃতান্ত স্বরূপ বৃকোদরকে প্রত্যাঘাত করার আদেশ দানও করবেন না। সুতরাং সে নির্ভয় হয়ে দুর্যোধনকে বলল, সখা, এবার দাসী দ্রৌপদীকে

সভায় আনয়ন কর। পাঞ্চালীর অহঙ্কার চূর্ণ করার এই-ই প্রকৃত ক্ষণ। সভা শিহরিত হল।

যুধিষ্ঠিরের গৌর মুখমণ্ডলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলেও তিনি প্রতিবাদহীন ভাবে লক্ষ্য করলেন যে, ধর্মকামিতায় দুর্যোধনও কর্ণের অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নয়। সে কর্কশ কণ্ঠে বিদুরকে আদেশ করল, ক্ষত্তা, দ্রৌপদীকে উপস্থিত কর।

বিদুর ধর্মাত্মা নিশ্চয়। কিন্তু সহনশীলতায় তিনি যুধিষ্ঠির নন। ক্রোধে আরক্ত হয়ে কম্পিত কলেবরে তিনি বলে উঠলেন, তোর মৃত্যু আসন্ন, তাই পাণ্ডবদের ক্রুদ্ধ করে তুলে তুই নিজের মৃত্যুকেই আহ্বান করছিস। দৌপদীর ওপর তোর কোনও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ধর্মরাজ পূর্বে নিজেকে হারিয়েছেন —তার পরে দ্রৌপদীকে। তাছাড়া দ্রৌপদী কেবলমাত্র ধর্মরাজের স্ত্রী নয়। তার অপর চার জন স্বামী রয়েছেন। পণ রাখার সময় ধর্মরাজ তাদের সম্মতি প্রার্থনা করেন নি। তোর কি মতিভ্রম ঘটেছে? কুলবধূকে প্রকাশ্য রাজসভায় উপস্থিত করে অপমানিত করবি? তোকে করুণাও করা যায় না। স্বয়ং ঈশ্বরও তোকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না। ধর্মরাজের ক্রোধদ্দীপ্ত চক্ষু দুটিই তোদের যে কোনো মুহূর্তে ভস্ম করে ফেলতে পারে। সাবধান।

দুর্যোধন উত্তেজিত হয়ে কটু-অশ্রাব্য ভাষায় বিদুরকে পুনরায় ভৎসনা করল। তারপর বিদুরের ওপর বিরক্ত হয়ে সঞ্জয়-পুত্র প্রাতিকামীকে আদেশ করল, যাও, তুমিও যাও প্রাতিকামী। কৃষ্ণাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে সভায় নিয়ে এস। পাণ্ডবদের থেকে ভীত হবার আর কিছু নেই। ওরা দাস মাত্র। উচ্চৈঃস্বরে বিপুল হাস্যে কম্পিত হল দুর্যোধন। সেই মদমত্ত-বিকারগ্রস্ত হাসি নবসভাগৃহের রত্নখচিত দেওয়াল-গাত্রে প্রতিধ্বনিত হল। সভাসদদের উল্লাস স্তিমিত হয়ে এল। এক অশুভ আশঙ্কায় তাঁরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তবু তাঁরা প্রতিবাদহীন রইলেন।

দ্রৌপদীর মর্যাদা লঙ্ঘন করা প্রাতিকামীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্রৌপদীর প্রশ্নমালা নিয়ে সে কয়েকবার সভাগৃহে যাতায়াত করল। দুর্যোধন বুঝল, প্রাতিকামীর সাহায্যে দ্রৌপদীকে উপস্থিত করানো সম্ভব হবে না। অনর্থক সময় নষ্ট। তাই এবার সে দুঃশাসনকে বলল, প্রাতিকামীর পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যাও, দুঃশাসন। দাসী দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করে সভায় উপস্থিত কর। তার যা জিজ্ঞাস্য —সভায় এসে প্রশ্ন করুক।

দুঃশাসন দুর্যোধনের উপযুক্ত অনুচর। সে রজস্বলা—একবস্ত্রা দ্রৌপদীর সব অনুরোধ, মিনতি অগ্রাহ্য করে সত্যই নির্দয়ের মতো কেশ আকর্ষণ করে কৃষ্ণাকে সভায় উপস্থিত করল—তারপর ধাক্কা দিয়ে ভূমিতে ফেলে দিল। রক্তরঞ্জিত একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দেখে সভার সকলে এক অশুভ আশংকায় পুনরায় শিহরিত হলেন। ঘটনাটি এতই অবিশ্বাস্য যে বিস্ময়ে সকলে যেন মূক হয়ে গেলেন। লজ্জায়—ঘৃণায় তাঁরা নতমস্তকে বসে রইলেন। ধার্তরাষ্ট্রেরা দ্রৌপদীর রূপসৌন্দর্য নির্লজ্জের মতো পান করতে থাকল।

যুধিষ্ঠির নিজের মধ্যে আগ্নেয়গিরির উত্তাপ অনুভব করলেও প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করে রাখলেন।

বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী স্বামীদের অবস্থা অনুমান করতে ভুল করল না। স্বামীরা যে কোনও সাহায্যেই আসবে না, তা সে বুঝতে পারল। সভাসদদের লোলুপ দৃষ্টি যেন তাকে বিদ্ধ করছিল। কোনক্রমে সে দেহ আবৃত করে ক্রন্দন করতে করতে সভাস্থ সকলকে অনুযোগ জানাল, এই সভায় রয়েছেন কুরু-পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, আচার্য কৃপ, বিদুর, বাহ্লিক প্রমুখ মাননীয়রা। তাঁরা ভরত-কুলবধূকে এভাবে লাঞ্ছিত করার জন্যে দুরাচারী দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা পর্যন্ত করছেন না। আশ্চর্য! তাঁদের চোখের সামনেই এই অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে! তাহলে কি বুঝব যে, পবিত্র সোমবংশ আজ ধ্বংসের উপান্তে? কুরুকুলের ধ্বংস আসন্ন?

দ্রৌপদীর করুণ আবেদন সভাগৃহে হাহাকার সৃষ্টি করলেও—দুর্যোধনের ভয়ে ভীত সভাসদেরা কোনও প্রতিবাদ করলেন না। এমনকি নির্ভয়ে যাঁদের সরব হওয়া উচিত ছিল—সেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপও নিরুত্তর রইলেন।

বৃকোদর ভীম আর যাই হোক, সে সহনশীল নয়। প্রিয়তমা নারীর ক্রন্দন তার সহনসীমা অতিক্রম করে গেল। অসহিষ্ণু হয়ে সে ক্ষোভের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলল, হে ধর্মরাজ! দ্যূতে আপনি সর্বস্বান্ত হলেও আমার দুঃখ নেই। কিন্তু আপনার কৃতকর্মের জন্য পাঞ্চালীকে কেন এমনভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে? অসভ্য বর্বরের দল কৃষ্ণাকে বিদ্রূপ করছে, তার দিকে পশুর ন্যায় দৃষ্টিপাত করছে। আমি এসব কেমন করে সহ্য করব? আপনি অনুমতি দিন। আমি পশুগুলির মস্তক এই মুহূর্তে চূর্ণ করি।

যুধিষ্ঠির ভীমের মানসিক যাতনা অনুভব করতে পারছিলেন। বুঝতে পারছিলেন যে, কী ভীষণ আত্মশক্তির সাহায্যে ভীম নিজেকে সংযত করে রেখেছে। তবু তিনি ভীমকে সাহায্য করতে পারেন না। কারণ তিনি ধর্মপাশে বদ্ধ। দৈব যদি তাঁদের এবং দ্রৌপদীর জন্য এই লাঞ্ছনা-অপমান নির্দিষ্ট করে রেখে থাকে—তাহলে তা সহ্য করতেই হবে।

বুদ্ধিমান অর্জুন এবারও যুধিষ্ঠিরকে উপলব্ধি করতে পারল। তাই সে ভীমকে শান্ত করার জন্যে বলল, হে অগ্রজ ভীম, শান্ত হোন। ধর্মরাজকে গঞ্জনা করা আপনার উচিত হচ্ছে না। আমাদের নিজেদের মধ্যের বাগবিতণ্ডায় শত্রুপক্ষই কেবল খুশি হবে। তাদের খুশি করার দায় আমাদের নয়। ভাগ্য মহারাজকে সাহায্য করে নি। কৃষ্ণার ভাগ্যেও নিশ্চয় এই লাঞ্ছনা লিখিত ছিল। তাই মহারাজকে দোষারোপ করে কী লাভ? তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার। তবে আমাদের ধর্ম আমরা পালন করব এবং সেটাই উচিত।

ব্যথিত-ক্রুদ্ধ ভীম বলল, হে অনুজ ধনঞ্জয়। তুমি যা বললে, তা সবই সত্য। কিন্তু আমার যে অসহ্য বোধ হচ্ছে। আমার এই হস্ত যদি কৃষ্ণাকেই বর্বরদের কাছ থেকে রক্ষা করতে না পারল —তখন এর প্রয়োজন কী?

যুধিষ্ঠিরের সহ্যশক্তি নিশ্চয় অতিমানবীয়। দ্রৌপদীর ক্রন্দন ভীমকে বিচলিত করে তুললেও—তাঁর সহনশীলতার বর্মে সামান্যতম ছেদ করতে সক্ষম হল না। তিনি চিন্তা করলেন, বিদুরের কণ্ঠে যদি দৈবের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে থাকে—তাহলে দ্রৌপদীর ক্রন্দন বাস্তবে তার বীজ রোপণ করল। যথাকালে তা মহীরুহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেই। দৈব আজ পাণ্ডবদের ধৈর্য-সহনশীলতার পরীক্ষা নিচ্ছে। এ পরীক্ষায় তাঁদের উত্তীর্ণ হতেই হবে। অপমানের দণ্ড তোলা থাক ভবিষ্যতের উপযুক্ত সময়ের জন্যে।

সভার করুণ বাতাবরণ ছিন্ন করে হঠাৎ পুনরায় একটি বিস্ফোরণ ঘটল। সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে দুর্যোধনের এক অনুজ ভ্রাতা—বিকর্ণ প্রতিবাদ করে উঠল। —এই সভায় বিজ্ঞজনেরা উপস্থিত রয়েছেন। তাঁরা পাঞ্চালীর প্রশ্নের কেন উত্তর দিচ্ছেন না? বলুন সে বিজিতা কি অবিজিতা? এ কথার উত্তর দান করতে কেন আপনারা সংকোচ বোধ করছেন? ধর্মরাজ স্বইচ্ছায় এই দ্যূতক্রীড়ায় যোগদান করেন নি। তাঁকে কৌশলের সাহায্যে আনয়ন করা হয়েছিল। মাতুল যে কপটতার আশ্রয় নিয়েছেন—এ তথ্যও সকলের জ্ঞাত। ধর্মরাজ প্রথমে তাঁর চার ভ্রাতাকে এবং পরে স্বয়ং নিজেকে হারান। দ্রৌপদীকে হারাবার পূর্বেই তিনি স্বয়ং নিজেকে হারিয়েছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণার ওপর তাঁর কোনও অধিকারই ছিল না যে, তিনি তাকে পণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।

বিকর্ণের এই আচরণ দুর্যোধন স্বপ্নেও কল্পনা করে নি। তাই দুর্যোধন বিভ্রান্ত হয়ে উঠে কর্ণের দিকে সাহায্যের জন্য দৃষ্টিপাত

করল।

কর্ণ বিকর্ণকে বলল, আশ্চর্য! যে কুলে তোর জন্ম—তুই সেই কুলেরই বিরোধিতা করছিস? তোর জ্ঞানবুদ্ধি কি কিছুমাত্র পরিণত হয়েছে? তুই এখনও বালক মাত্র। কৃষ্ণাকে এই সভায় উপস্থিত করানোটা যদি গর্হিতই হত—তবে তোর ওই সব গুরুজনেরা কি নিশ্চুপ থাকতেন? দেখছিস না—সবাই মূক হয়ে রয়েছেন। শুনে রাখ, পাণ্ডবেরা যখন দাস—তখন দ্রৌপদীও দাসী। তাছাড়া যে নারীর একাধিক স্বামী থাকে সে তো বেশ্যা। বেশ্যার আবার মান-সম্মান কিসের? রজস্বলাই হোক বা একবস্ত্রাই হোক—তাকে সভায় উপস্থিত করানোর মধ্যে বাধা কোথায়? এখন বৃথা তর্কবিতর্ক না করে আসনে বসে থাক - না হয় সভাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'।

যুধিষ্ঠির কর্ণের কথাগুলি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটি কথাই তাঁর মনে হল—এই কি সেই কর্ণ, যে সম্রাজ্ঞী হিসাবে দ্রৌপদীকে সেদিন অভিবাদন করেছিল? রাজসূয় যজ্ঞে দানধ্যান বিভাগে উৎসাহের সঙ্গে কার্য সম্পাদন করেছিল? সামান্য কয়েকটি দিনের ব্যবধানে সে কি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অপেক্ষাও অধিক ধর্মজ্ঞ হয়ে উঠেছে যে দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলতেও আপত্তি হল না! এই মানুষটির মধ্যে সামান্যতম লজ্জা বা সম্ভ্রমবোধ বা কৃতজ্ঞতা বোধ কি নেই? সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা—এই কৌরব-সভাগৃহে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, আচার্য কৃপের উপস্থিতেতে সে পবিত্র কুরুকুলবধূকে বেশ্যা বলার স্পর্ধা প্রকাশ করল—অথচ কেউই কোনো প্রতিবাদ করলেন না! এক নিদারুণ ক্ষোভে, ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে উঠলেন যুধিষ্ঠির। হে ধর্ম—এ কি সুকঠোর পরীক্ষা তোমার!

কর্ণের যুক্তিজ্ঞান দুর্যোধনের মনঃপূত হল। সে বিকর্ণকে তীব্র ভর্ৎসনা করে একই কথার পুনরাবৃত্তি করল।

অসহায় বিকর্ণ সাহায্যকারী কোনও কণ্ঠস্বর শুনতে না পেয়ে মস্তক অবনত করে আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

অতঃপর দুর্যোধন দুঃশাসনকে আদেশ করল, পাণ্ডবদের সব বস্ত্র-আভরণ কেড়ে নাও। ওদের বল্কল ধারণ করাও।

ক্রোধের এক ফল্গুধারা যুধিষ্ঠিরকে গ্রাস করার চেষ্টা করছিল। তাঁর ইঙ্গিতে সকল ভ্রাতা বল্কল ধারণ এবং রাজবস্ত্র-আভরণ স্বয়ং পরিত্যাগ করে অপমানের হাত থেকে নিস্তার পেল।

পাণ্ডবদের নিগ্রহ করার সুযোগ না পেয়ে হিংস্র দুঃশাসনের লক্ষ্যবস্তু হল একবস্ত্রা দৌপদী। এক কুৎসিত উল্লাসে সে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করল।

যুধিষ্ঠির চক্ষু মুদিত করে ধর্মকে স্মরণ করলেন।

শ্বাপদ দুঃশাসনের হাত থেকে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যে দ্রৌপদী ব্যাধ-ভীতা হরিণীর মতো সভাগৃহে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। ক্রন্দনমুখর দ্রৌপদী জনে জনে প্রশ্ন করল, বলুন— আমি বিজিতা কি অবিজিতা?

কিন্তু সভাসদগণ তখনও রহস্যময়ভাবে নিশ্চুপ রইলেন।

নীরব যুধিষ্ঠির সভাসদগণকে মনে মনে বলতে চাইলেন— এটি বিজিতা-অবিজিতার প্রশ্ন নয়। আসলে, কৃষ্ণা কুরুকুলের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করছে, তাকে এই পূর্ণ সভাগৃহে গুরুজন এবং অন্যান্য সভাসদদের সামনে লাঞ্ছিত, অপমানিত, এবং বিবস্ত্র করার অধিকার ধার্তরাষ্ট্রদের রয়েছে কি না? এ কোনও সাধারণ প্রশ্ন নয়, এ নীতির প্রশ্ন। বিবেকের প্রশ্ন। নারীর সম্ভ্রমের প্রশ্ন।

এই সভায় উপস্থিত একজন মাত্র পুরুষ—সামান্য একটি বাক্যের দ্বারা এই নির্লজ্জ-অশোভন-বর্বরোচিত নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেন। তিনি কুরুকুলপতি পিতামহ ভীষ্ম। তাঁর সামান্যতম ক্রোধদীপ্ত অঙ্গুলীহেলনকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস হবে না দুর্যোধনের। তিনিই কেবল রক্ষা করতে পারেন কুরুকুলবধূর

সম্ভ্রম। অথচ, তিনিও কোন সে রহস্যময় কারণে তাঁর দৌহিত্র পুত্রবধূর আবেদন বারবার উপেক্ষা করছেন ? কেন প্রত্যুত্তর করছেন না ?

শেষপর্যন্ত প্রত্যুত্তর করতে বাধ্য হলেন ভীষ্ম। অন্তত নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, আমায় কেন বারবার উত্যক্ত করছ, কৃষ্ণা ? ধর্মাধর্ম অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার। ধর্মরাজ তো এখানে সশরীরে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁকেই প্রশ্ন কর না কেন।

হতবাক হয়ে গেলেন যুধিষ্ঠির! এই কি কুলপ্রেমিক পিতামহ ভীষ্ম! কৌশলের আশ্রয় নিয়ে প্রত্যুত্তর করা থেকে বিরত রইলেন! আশ্চর্য! তিনি কি বিস্মৃত হচ্ছেন যে, দ্যূতক্রীড়ার পরিণতি—ভরতকুল থেকে পাণ্ডবদের নির্বাসন দিতে পারে না। তাঁরাও ভরতকুলের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এখনও! দ্যূতক্রীড়া কি পাণ্ডবদের সঙ্গে পাঞ্চালীর ধর্মীয় বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে ? এসব ছাড়াও, নারী হিসাবে দ্রৌপদীর সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব কি এই সভা অস্বীকার করতে পারে ? জ্ঞানে পিতামহ একাধারে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য! তাঁর বিবেকবোধ কি সামান্যতম পীড়িত হচ্ছে না ? তাঁর কিসের সঙ্কোচ ? ধৃতরাষ্ট্রের অন্নঋণ কি তিনি এই অধর্মাচারেই পরিশোধ করবেন ? এটাই কি ধর্মসঙ্গত পথ ?

বিদুর ঘোষিত দৈব নিয়মের বাস্তবতা ক্রমেই যুধিষ্ঠিরের চোখের সামনে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। ক্রোধ নয়—আসন্ন কুরুকুলের ধ্বংসের ইঙ্গিত তাঁকে বিষণ্ণ করে তুলল। তিনি জানেন, যে সভাস্থলে, শিষ্টাচার, মানবতা, নারীর সম্ভ্রম পদদলিত হয়—সেই সভার ধ্বংস অনিবার্য। ধর্ম ভূলুণ্ঠিত হলে—সেই অধর্মের ঋণ রক্তমূল্যে পরিশোধ করতে হয়। যুধিষ্ঠির দৃঢ়নিশ্চয় হলেন, এই অধর্মাচারের নীরব দর্শক পিতামহ ভীষ্মকে, আচার্য দ্রোণকে এবং কৃপকে কাল গ্রাস করেছে। এই সভায় উপস্থিত সভাসদেরা মৃত্যুকে আহ্বান করেছেন।

দ্রৌপদী শেষপর্যন্ত উপলব্ধি করল যে, এই সভায় তাকে

সাহায্যকারী হিসাবে কেউই উপস্থিত নেই। তাকে নিজের প্রচেষ্টা-তেই আত্মরক্ষা করতে হবে। মুহূর্তের মধ্যে দ্রৌপদীর ক্রন্দনশীল মূর্তি পরিবর্তিত হল রোষকশায়িত ভীষণায়। তার সেই আরক্ত চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি স্থির হল দুঃশাসনের ওপর। অভিশাপ দানে উদ্যত হল সে।

দ্রৌপদীর তীব্র দৃষ্টি শঙ্কিত করে তুলল দুঃশাসনকে। অজ্ঞাত-সারেই তার দৃষ্টি পতিত হল কালসম বৃকোদরের ওপর। চতুর্দিকে অশুভ সব ধ্বনি শ্রুত হতে থাকল। ঘর্মাক্ত দেহে কম্পিত কলেবরে ক্ষান্ত দিল দুঃশাসন। তার অন্তরাত্মা কম্পিত। দেহ কম্পিত।

[দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সম্পর্কে একটি অলৌকিক—শিশুসুলভ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। নিগ্রহকারী দুঃশাসনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে এবং বিবস্ত্রা হওয়ার লজ্জা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করে। দুঃশাসন যতই দ্রৌপদীর বস্ত্র উন্মোচন করার চেষ্টা করতে থাকে—অলক্ষ্যে থেকে কৃষ্ণ ততই বস্ত্র সরবরাহ করে যেতে থাকেন। শেষ-পর্যন্ত দুঃশাসন ক্লান্ত এবং ভীত হয়ে তার নারকীয় প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়। বালখিল্যরাই একমাত্র এই অলৌকিক কাহিনীতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন। আমার মনে হয়, দ্রৌপদী তার তেজবলে ভীত করে তুলেছিল দুঃশাসনকে। তার সহায়ক হয়েছিল ভীমসেনের ক্রোধদীপ্ত অবয়ব। সে আশংকা করছিল, যে কোনও মুহূর্তে শৃঙ্খলমুক্ত সিংহের মতো বৃকোদর তার ওপর লম্ফ প্রদান করবে। মৃত্যুভয় কাপুরুষদের সর্বাধিক। ভীম যে কি পরিমাণ ক্রুদ্ধ হয়েছিল তা পরমুহূর্তেই অনুমান করা যায়।]

দুঃশাসন সকল পাণ্ডবের ক্ষমা লাভ করলেও বৃকোদর ভীমের ক্ষমা লাভ করতে পারল না। ভীম শত্রুকে ক্ষমা করে না। তাই দুঃশাসন তার বর্বরসুলভ কার্য থেকে বিরত হতেই সভাস্থল

প্রকম্পিত করে সে বজ্র নিনাদে বিস্ফোরিত হল।—সকলে শ্রবণ করুন। দুঃশাসন, তুইও উত্তমরূপে শ্রবণ কর। ভবিষ্যতে রণাঙ্গণে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করে আমি রক্তপান করব। যদি ব্যর্থ হই তবে আমার পিতৃপুরুষেরা যেন গতি লাভ না করেন।

ক্রুদ্ধ ভীমের রণহুংকার সভাসদদের মন থেকে দুর্যোধন-ভীতি মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত করল। সকলেই সরব হয়ে দুর্যোধন আর ধার্তরাষ্ট্রদের নিন্দাবাদ শুরু করে দিল। ধর্মাত্মা বিদুর সম্ভবত এইরকমই একটি সুযোগের অপেক্ষায় সভায় অপমানিত হয়েও অবস্থান করছিলেন। তিনি আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন, হে সভাসদগণ, সভায় উপস্থিত থেকে যদি আপনারা ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন না করেন তবে সেই সভা নরকগামী হবে। যদি কাউকে ভয়ই করবেন—তবে সভায় আগমন করেছেন কেন? এরূপ ক্ষেত্রে সভায় অনুপস্থিত থাকাটাই মঙ্গলজনক।

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন, পিতৃব্য বিদুরের এই কথাগুলি আসলে পিতামহ আর দুই আচার্যকে লক্ষ্য করেই বলা। এঁরা এই অনাচারকে বন্ধ করতে পারতেন—কিন্তু করেন নি। নীরবে প্রশ্রয় দান করেছেন।

দুঃশাসনকে নিরস্ত হতে দেখে সকলে আশা করেছিল, এটিই সম্ভবত নাটকের শেষ দৃশ্য। কিন্তু না। তখনও কিছু অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। দুঃশাসনের প্রস্থান এক নতুন দৃশ্যের সূচনা মাত্র।

সভার গতিপ্রকৃতি বিচার করে ধূর্ত কর্ণ আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করল না। স্বয়ম্বর সভার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে অবীরসুলভ কণ্ঠে দুর্যোধনকে বলল, সখা, তুমি কার ভয়ে ভীত? দাসীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দাও।

পরিস্থিতি অপরিবর্ত দেখে দ্রৌপদী সত্যিই ভীত হল। সে পুনরায় ক্রন্দনশীল অবস্থায় পিতামহের শরণাপন্ন হল।—হে

পিতামহ, আমি পাণ্ডববধূ। কুরুকুলবধূ। আপনি জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় এরা আমাকে দাসী হতে বলছে। আপনি প্রতিবাদ করুন।

এবারেও সভাস্থল গঙ্গাপুত্রের কথা শুনে বিস্ময় বোধ করল। —আমাকে কেন? ধর্মরাজ তো উপস্থিত। তাকেই প্রশ্ন কর না কেন. এটি উচিত কি অনুচিত?

পিতামহের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দুর্যোধনকে তার চক্ষুলজ্জার শেষ আবরণটুকুও অপসারণ করতে সাহায্য করল। সে বলল, কৃষ্ণা তুই বৃথা ক্রন্দন করছিস। তোর কথা হচ্ছে, আমরা তোকে ধর্মত জয় করি নি। এই তো? তবে তোর অন্য স্বামীরাই বলুক যে যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী। তোকে পণ রাখার অধিকার তার নেই! তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এত চিৎকার—কোলাহলের প্রয়োজনটা কী?

সভার অধিকাংশ সদস্যই সোচ্চারে দুর্যোধনকে সমর্থন জানাল। তারা সকলেই দ্রৌপদীর প্রশ্নের গভীরতা এড়িয়ে গেল। প্রকৃত প্রশ্নটি হচ্ছে কপট দ্যূতের দানে বিজয়ী হয়ে এক কুলবধূকে অপমান এবং সতীত্ব থেকে বঞ্চিত করা যায় কি না? পাশার দান কাউকে বংশের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে কি না? আরও একটি প্রশ্ন—কোনও নারীর সম্ভ্রম হানি করার অধিকার এই সভা-গৃহের রয়েছে কি না? যুধিষ্ঠির বুঝতে পারছেন, কেউই প্রকৃত উত্তর দান করে দুর্যোধনের রোষভাজন হতে ইচ্ছুক নন। তাই তাঁরা কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে দিয়েই এই প্রশ্নের মীমাংসা করাতে চান।

যুধিষ্ঠিরও বদ্ধপরিকর—তিনি দাস। তিনি কোনও উত্তর দেবেন না।

যুধিষ্ঠিরের মনোভাব বৃকোদর এবার উপলব্ধি করতে পারল। তাই অগ্রজের স্বপক্ষে সে-ই উত্তর দানে এগিয়ে এল। ভীমকণ্ঠে ভীম বলল, শোন গর্দভের দল, পাণ্ডবদের প্রভু হচ্ছেন ধর্মরাজ

যুধিষ্ঠির। যদি তাই না হত—তাহলে তোরা কি এতক্ষণ জীবিত থাকতিস? আমার গদার আঘাতে তোদের যমলোকে প্রেরণ করতাম। ধর্মরাজই যখন দাস হয়ে গেছেন তখন আমরাও দাস— দ্রৌপদীও দাসী। এখন তোদের যা খুশি হয় কর। তবে একটা কথা মনে রাখিস—আমি জীবিত থাকতে তোদের কোনও মঙ্গল হবে না। যে মুহূর্তে তোরা ধর্মরাজকে ভূমিতে উপবেশন করিয়েছিস —ধর্মও তোদের পরিত্যাগ করেছে ঘৃণায়। তোরা এখন অধর্মের কবলে। তোদের আয়ুও শেষ হয়ে গেছে। ধর্মের পাশে আবদ্ধ হয়েছেন ধর্মরাজ। তাই তোদের উল্লাস। আমি প্রতিজ্ঞা করছি —ভবিষ্যতে রণাঙ্গণে আমি প্রতিটি ধার্তরাষ্ট্রকে বধ করব। তোদের কেউই জীবিত থাকবে না।

ভীমের বাণী যাতে সভার ওপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সেজন্যে কর্ণ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ভীম স্বীকার করেছে, পাণ্ডবেরা দাস। দ্রৌপদীও দাসী। তার প্রভু হচ্ছে মহারাজ-পুত্রেরা। এদের মধ্যে থেকেই তুই স্বামী হিসাবে কাউকে নির্বাচন করে সুখে ঘর সংসার কর। পাণ্ডবেরা তোকে স্পর্শও করতে পারবে না।

ভীম সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল।—ধর্মরাজের জন্যে তোকে এখনই খণ্ড-বিখণ্ড করতে পারছি না। তবে সময়ে তুইও প্রতিফল পাবি, কর্ণ।

ভীমের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় দুর্যোধন সম্ভবত একটু ভীতবোধ করছিল। তাই সে এবার সরাসরি যুধিষ্ঠিরকেই বলল, তুই-ই বল না, কৃষ্ণা বিজিতা না কি অবিজিতা?

যুধিষ্ঠিরের নীরবতা আর ভীমের নিষ্ফল আস্ফালন দুর্যোধনকে প্ররোচিত করল। রজস্বলা, একবস্ত্রা দ্রৌপদীর নগ্নপ্রায় সৌন্দর্য তাকে কামার্ত করে তুলল। সে তার বাম উরুর বস্ত্র অপসারণ করে দ্রৌপদীকে সেখানে উপবেশন করার ইঙ্গিত করল।

প্রকাশ্য সভাস্থলে একি বর্বরতা ! এ কি কদর্যতা !

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত সিংহের মতো গর্জন করে উঠল ভীম। —ওরে নির্লজ্জ পশু। যে ঊরু তুই প্রকাশ্য সভায় পাঞ্চালীকে প্রদর্শন করলি, যুদ্ধক্ষেত্রে গদার আঘাতে সেই ঊরু আমি চূর্ণ করে তোর মস্তকে পদাঘাত করব।

ভীমের ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সভাস্থল যেন হিমশীতল হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বিদুর বললেন, কুরুকুলের ধ্বংস আমি স্পষ্ট দর্শন করছি। ভীমের ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দেবতাদেরও অসাধ্য।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সম্ভবত এতক্ষণ নিদ্রামগ্ন ছিলেন। নচেৎ বিদুরের ভৎসনা, দ্রৌপদীর ক্রন্দন, দুঃশাসন আর অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রদের সম্পর্কে ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা শোনার পরও তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায় নি। কিন্তু তাঁর কর্ণে দুর্যোধনের নামটি প্রবেশ করা মাত্র তিনি হায় হায় করে উঠলেন। দুর্যোধনই তাঁর স্বপ্ন—তাঁর আকাঙ্ক্ষা ! আর তাঁকেই কিনা বধ করবে ভীম ! তিনি ভীষণ ভীত হয়ে উঠলেন। কারণ নির্মম—অমোঘ ভীমকে তিনি চেনেন। শত্রুর সম্পর্কে সে ক্ষমাহীন। তার প্রতিজ্ঞা ভয়ঙ্কর। দুর্যোধনই যদি না রইল—তবে কিসের জন্যে এতসব আয়োজন ?

যাঁরা এতক্ষণ পাণ্ডবদের নীরবতাকে দুর্বলতা বলে জ্ঞান করছিলেন ভীমের প্রতিজ্ঞা তাদেরও ভীত ত্রস্ত করে তুলল। দ্রৌপদীর অভিশাপ তো এখনও অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

চতুর্দিকের অশুভ সব ধ্বনি ক্রমেই ভীষণতর হতে থাকল। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের শান্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ধৃতরাষ্ট্র চতুর। তিনি জানেন, দ্রৌপদীর ক্ষমা লাভ করলেই অন্যান্যরাও ক্ষমা করবে। ভবিষ্যতে যুদ্ধ-পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে ভীমের প্রতিজ্ঞাও পূরণ হবে না। তাই তিনি দ্রৌপদীকে সম্মুখে আহ্বান করে বললেন, হে কৃষ্ণা, আমার পুত্রেরা তোমার ওপর

যথেষ্ট অত্যাচার করেছে। দুর্যোধন আজ ভরতবংশের মুখ কালিমা-লিপ্ত করেছে। যুগযুগান্তরের মানুষ এই বর্বরতার কথা বিস্মৃত হতে পারবে না। তবু হে পাঞ্চালী, তুমি ক্ষমাশীল ধর্মরাজের ভার্যা। তুমি তোমার চরিত্রগুণে অর্বাচীনদের অপরাধ ক্ষমা কর। অভিশাপ প্রদান কোরো না। তুমি বরং একটি বর প্রার্থনা কর। তোমাকে তা দান করে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

জ্যেষ্ঠতাতের আচরণ লক্ষ্য করে যুধিষ্ঠিরের বুঝতে অসুবিধে হল না যে, তিনি বিদুরের সত্যতা অনুভব করতে পেরেছেন। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুভয়ে তিনি আশংকিত। ভীমের অমোঘ প্রতিজ্ঞাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যেই দ্রৌপদীকে তুষ্ট করতে চাইছেন। ক্রোধ নয়, যুধিষ্ঠির করুণা বোধ করলেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি।

যুধিষ্ঠির জানতেন, দ্রৌপদী সঠিক বরটিই প্রার্থনা করবে। সে নিশ্চয় উপলব্ধি করেছে যে, স্বামীহীনা এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ নারীর সঙ্গে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ পশুর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তাই যুধিষ্ঠিরের অনুমান মতোই দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্রকে বলল, হে মহারাজ, ধর্মরাজকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করুন। আজ্ঞা করুন যাতে আমার পুত্রগণ দাস বলে অভিহিত না হয়।

ভীমের ভীষণ প্রতিজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে তখনও প্রতিক্রিয়া করে চলেছিল। লোভ আর হিংসার জন্য যা সংঘটিত হবার তা হয়ে গেছে। এখন তারই প্রতিকারের জন্যে তিনি উন্মাদ হয়ে উঠলেন। তিনি জানেন, দ্রৌপদীই পাণ্ডবদের মূল শক্তি। দ্রৌপদী শান্ত হলে পাণ্ডবেরাও শান্ত হবে। তাই কৃষ্ণার প্রার্থনার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তথাস্তু। কিন্তু আরও একটি বর প্রার্থনা কর। একটি মাত্র বরদানে আমি তৃপ্ত হচ্ছি না। উদার হয়ে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র।

বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় ধৃতরাষ্ট্র পরাজিত হলেন, তিনি আশা করেছিলেন যে, দ্রৌপদী অন্তত আর একটি বর প্রার্থনা করবে, যার ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। তাঁর পুত্রদের জীবন নিরাপদ হবে।

কিন্তু দ্রৌপদী চিন্তা করল যে, তার পঞ্চ স্বামীর তুলনায় রাজ্য-সম্পদ সব তুচ্ছ। স্বামীরা দাসত্ব থেকে মুক্ত হলে রাজ্য-সম্পদ আর ধৃতরাষ্ট্রের দয়ার দানের ওপর নির্ভর করবে না। তাঁরা বাহুবলেই সব উদ্ধার করে নিতে পারবেন। তাই দ্রৌপদী বলল, যদি সত্যিই আমাকে খুশি করতে চান, তবে আমার অন্য চার স্বামীও মুক্ত হোক।

হৃদয়ের হতাশা গোপন করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তথাস্তু। আরও একটি বর প্রার্থনা কর।

কিন্তু দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্রকে এবার সত্যিই হতাশ করল। সে বলল, তৃতীয় বরের আমার প্রয়োজন নেই। আমি ক্ষত্রিয় ভার্যা, শাস্ত্রানুসারে আমার পক্ষে দুটি বরই প্রার্থনীয়।

যে ভীতির সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য এই বরদানের আয়োজন, তা ব্যর্থ হতে দেখে ধৃতরাষ্ট্র শেষপর্যন্ত নিজেই বললেন, আমি শুধুমাত্র তোমার নীতিজ্ঞান পরীক্ষা করছিলাম। আমি ভীষণ সন্তুষ্ট। তাই বলছি, পাণ্ডবেরা হৃতসর্বস্ব পুনর্লাভ করুক। যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে তা বিস্মৃত হয়ে তারা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করুক। পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য দিয়েই আমরা জীবন অতিবাহিত করব।

ধৃতরাষ্ট্রের বদান্যতায় সভা পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের স্বীকারোক্তি ব্যতীত সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। কারণ তিনি জানেন, যুধিষ্ঠিরই পাণ্ডবদের শেষ কথা। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের অজস্র প্রশংসা করে বললেন, হে ধর্মরাজ! আমার পুত্রদের তুমি ক্ষমা কর। তুমি বংশের শ্রেষ্ঠ

পুত্র। তুমি যদি কনিষ্ঠদের ক্ষমা না কর তবে কে করবে? বিদুরের আশংকাই তাহলে সত্য হয়ে উঠবে।

জ্যেষ্ঠতাতের এই অকপট সত্য ভাষণ যুধিষ্ঠিরকে স্পর্শ করল। তাই তিনি আন্তরিকভাবেই বললেন, হে মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি যদি সত্যিই ক্রুদ্ধ হতাম তাহলে আপনার পুত্রেরা কি এখনও জীবিত থাকত? জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের কথা সবসময়ে স্মরণে রাখব।

শুধুমাত্র ধৃতরাষ্ট্র কেন—সভার সকলে কৃষ্ণাপ্রিয় তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের এই পুরুষটিকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন। পুরুষটি সিংহের মতো বলবান। অথচ এঁর সারা অঙ্গে এক বিনম্রতার বিচ্ছুরণ। এঁর দুই আয়ত চক্ষুতে স্বপ্ন আর ক্ষমার প্রকাশ।

যুধিষ্ঠিরের জয়ধ্বনিতে সভাগৃহ পূর্ণ হয়ে উঠল।

পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করছিল। যুধিষ্ঠির চিন্তা করছিলেন, সবই তিনি পুনর্লাভ করেছেন সত্য। কিন্তু তিক্ততা—যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে তা কি দূর হয়েছে? তা কি হবে কোনও দিন? তিনি ক্ষমা করলেও তার ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদী কি পারবে ক্ষমা করতে? ভীমের ভীষণ প্রতিজ্ঞা তাঁকে শিহরিত করল। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভীম যখন তার প্রতিজ্ঞা পালন করবে—তখন কি তিনি তাকে নিবৃত্ত করতে পারবেন? অপমানিতা-লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী কি কখনও সব জ্বালা-যন্ত্রণা বিস্মৃত হতে পারবে? সম্ভবত না।

রথে যুধিষ্ঠিরের পাশেই অবস্থান করছিল দ্রৌপদী। আলুলায়িত কুন্তলা। রক্তরঞ্জিত বস্ত্র! দুচোখে তার উন্মাদের জ্বালা। কম্পন অনুভব করলেন তিনি।

পশ্চাতে কৌরব সভাগৃহে তখন অভিনীত হচ্ছে আর একটি নাটক।

শকুনি—একি মূর্খতা ! এত আয়োজন সব বিফলে গেল !

দুর্যোধন—(গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে) রাজ্য, সম্পদ তো তুচ্ছ। দ্রৌপদীকে লাভ করেও—হারালাম। ধর্ম ! ধিক ধর্মকে !

শকুনি—মহাভুল—মহাভুল হল ভাগিনেয়। পাণ্ডবেরা এখন আহত সিংহের মতো আচরণ করবে। মুখে ওরা যাই বলুক না কেন, এই অপমান—এই তিক্ততার কথা ওরা বিস্মৃত হবে না। তোমার পিতার মতিভ্রম ঘটেছে। ছিঃ ! ছলে-বলে ওরা প্রতিশোধ গ্রহণ করবেই।

দুর্যোধন—ওই রাক্ষস বৃকোদরের ভয়ে ভীত হয়ে কি আমাদের অবশিষ্ট জীবনটুকু ব্যয় করতে হবে ? মাতুল, একটি উপায় কর। নচেৎ আমি দেহত্যাগ করব। আত্মঘাতী হব।

শকুনি—উপায় একটিই। পুনরায় দ্যূতক্রীড়া। আজই—এখনই। পারবে ?

দুর্যোধন—তা কি করে সম্ভব, মাতুল ? যুধিষ্ঠির কি সম্মত হবে ?

শকুনি—ভাগিনেয়, হবে—যদি তোমার পিতা আদেশ দেন। তোমার পিতার আদেশ কখনই অমান্য করবে না মূর্খ ধর্মরাজ। যাও, তুমি তোমার পিতাকে সম্মত করাও। তোমাকে অদেয় তাঁর কিছু নেই। তুমি শুধুমাত্র বলবে, এবারের শর্ত হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে পক্ষের পরাজয় ঘটবে—তারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও একটি বৎসর অজ্ঞাতবাসে বাস করবে। ওই অজ্ঞাতবাসের সময় যদি তাদের সন্ধান পাওয়া যায়—তাহলে পুনরায় দ্বাদশ বর্ষের বনবাস এবং এক বর্ষের অজ্ঞাতবাস। তুমি তোমার পিতাকে বল, যদি তিনি সম্মত না হন, তবে তুমি আত্মহত্যা করবে—দেশান্তরী হবে।

দুর্যোধন—ধন্য মাতুল। ধন্য তোমার কূটকৌশল···! (উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুর্যোধনের মুখমণ্ডল।)

প্রাতিকামীর অশ্ব যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্তী হল।—জয় হোক ধর্মরাজের।

সচকিত যুধিষ্ঠির বললেন, কোনও দুঃসংবাদ, প্রাতিকামী ?

—হ্যাঁ, ধর্মরাজ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় আপনাকে দ্যূতসভায় আহ্বান করেছেন। এখনই।

বিভ্রান্ত যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে তাদের বললেন, তোমরা কি আমাকে ধর্মপালনে সুযোগ দান করবে ?

ভীমই উত্তর দিল।—হে অগ্রজ। আপনি পিতৃতুল্য। ধর্ম থেকে আপনাকে আমরা বিচ্যুত করতে পারি না। কৌরবদের মনোভাবও উপলব্ধি করার কোনও অসুবিধে নেই। পাণ্ডবদের রাজ্য-সম্পদ গ্রাস করার জন্যে তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তবে রাজ্য, সম্পদের জন্য চিন্তা করি না। আমার একটি অনুরোধ—দাসত্বের শর্ত বা কৃষ্ণাকে পণ রাখার শর্ত আর স্বীকার করবেন না।

যুধিষ্ঠির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, তাই হবে।

পাণ্ডবদের রথ আবার হস্তিনাপুরের দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

দ্রৌপদীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করে ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির পুনরায় সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভার গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত করে চিন্তা করলেন, যুধিষ্ঠির কি নির্বোধ—না অতিমানব, না ক্ষমার দেবতা ?

যুধিষ্ঠির স্বাভাবিকভাবে গুরুজনদের প্রণাম নিবেদন করে সমবয়সীদের অভিনন্দন জানিয়ে পিতৃব্য বিদুরের দিকে এগিয়ে গেলেন। বিদুরকে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদুর বললেন, পুত্র! আবার! তুমি কি জান না ?

সরলভাবে যুধিষ্ঠির বললেন, জানি। দৈব আজ পাণ্ডবদের নিয়ে এক ষড়যন্ত্র রচনা করেছে। আমি অসহায়। জ্যেষ্ঠতাতের আহ্বান—কেমন করে উপেক্ষা করব ?

উচ্ছ্বসিত বিদুর বললেন, তুমি প্রকৃতই ধর্মরাজ। কল্যাণ হোক তোমার।

আসন গ্রহণ করার পর শকুনি আবার সেই ধূর্তের হাসি হেসে বলল, ধর্মরাজ! আগেরবার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। তাই এবারের শর্ত অন্যরকম। স্বীকার করছ ?

—স্বীকার করছি। পরাজিত পক্ষের জন্যে দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের কালে সন্ধান পাওয়া গেলে আবার দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস যাপন করতে হবে।

—তবে শুরু হোক। পিচ্ছিল হাস্যে উদ্ভাসিত হল শকুনির মুখ।

মুহূর্তেই পাণ্ডবদের ভাগ্য আবার পরিবর্তিত হল। দ্যূত-সভায় পুনরায় শ্রুত হল ধার্তরাষ্ট্রদের উৎকট উল্লাস—দ্বাদশ বৎসর বনবাস! এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস!

বিকৃত উল্লাসের আতিশয্যে দুঃশাসন বিস্মৃত হল ভীমের পূর্ব প্রতিজ্ঞা। সে দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করে বলল, মহারাজ যাজ্ঞসেন কী ভীষণ নির্বোধ। যাজ্ঞসেনীর মতো কন্যাকে সম্প্রদান করেছেন নপুংসক পাণ্ডবদের হস্তে! বনবাসের দুঃখ পাঞ্চালী কেমন করে সহ্য করবে ? তার চেয়ে বরং আমাদের মধ্যে থেকেই কাউকে, নির্বাচন করে সুখে দিন কাটাক।

ভীম দুঃশাসনের নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভ্রাতৃবধূর প্রতি এহেন বাক্য! অবিশ্বাস্য! তারপর সে বলল, রে কামুক কুকুর দুঃশাসন! আমার প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হলি! তবে আরও একবার উত্তম রূপে শ্রবণ কর। রণক্ষেত্রে তোর বক্ষ-রক্ত পান

করব। যদি তা না পারি—তবে আমার পিতৃপুরুষেরা যেন গতি লাভ না করেন।

অদূরদর্শী দুর্যোধনও ভীমকে ব্যঙ্গ করে তার চলন অনুকরণ করে দেখাল।

ফলে, ভীম তার প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হল। —যে দিন রণক্ষেত্রে আমাদের সাক্ষাৎ হবে সেদিন কিন্তু এমন স্বচ্ছন্দ গতিতে আর চলন সম্ভব হবে না। তোর উরু আমি গদার আঘাতে চূর্ণ করব। তোর মস্তকে পদাঘাত করব। তোর শত ভ্রাতা আর কুচক্রী সহযোগীর প্রত্যেকটিকে বধ করব। ওই হীন সূতপুত্রটিকে আমি গদার আঘাতে যমলোকে পাঠাতে পারি। কিন্তু না। অর্জুনের ওপর ওর বড় ঈর্ষা। অর্জুনই ওকে যমলোকে প্রেরণ করবে। আর এই শঠ-প্রবঞ্চক সুবলনন্দনের গতি করবে সহদেব।

সভাস্থল পুনরায় আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ভীমবাক্য কখনও নিষ্ফল হয় না।

বনবাস

শিষ্টাচারী যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবেরা প্রতিটি গুরুজনের কাছ থেকে বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁরা নিজেদের দুর্বলতায় লজ্জিত হয়ে অধোমুখে তাঁদের অনুমতি দান করলেন। শেষপর্যন্ত যুধিষ্ঠির প্রণাম করলেন পিতৃব্য বিদুরকে। বিদুর তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, পুত্র, আমি আমার সাধ্যমতো এই দুর্ঘটনা রোধ করার চেষ্টা করেছিলাম। ব্যর্থ হয়েছি। আমাকে কেউই সাহায্য করলেন না!

আমি বিশ্বাস করি, কেউ না করলেও তুমি অন্ততঃ দুর্ঘটনা রোধ

করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। তারপর দৈবের ইচ্ছা। কামনা করি, সত্য পালন করে বিজয়ীর বেশে ত্রয়োদশ বর্ষ শেষে আবার প্রত্যাবর্তন করবে এই হতভাগ্য পিতৃব্যের কাছে। আর একটি কথা। তোমার মাতা বৃদ্ধা হয়েছেন। বনবাসের কষ্ট স্বীকার করতে পারবেন না। তিনি জ্যেষ্ঠতাতের আশ্রয়ে বাস করাও স্বীকার করবেন না। তাই আমার অনুরোধ, তুমি তাঁকে আমার আলয়ে প্রতিষ্ঠা করে যাও।

যুধিষ্ঠির পিতৃব্য বিদুরের নৈতিক সাহস দর্শন করে অভিভূত হলেন। আপ্লুত কণ্ঠে তিনি বললেন, হে ধর্মাত্মা বিদুর। আপনি আমাদের পিতৃতুল্য। সেই সম্মানই আমরা সর্ব সময়ে আপনাকে প্রদান করেছি। সুতরাং, আপনি আমাদের 'অনুনয়' বলে লজ্জিত করবেন না। বলুন, আদেশ। আপনি নিশ্চিন্ত হোন যে, মাতা আপনার গৃহেই এই ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত করবেন। আমি চিন্তামুক্ত হলাম।

বিদুর বললেন, আমি ধন্য হলাম পুত্র।

—ধন্য আপনি হলেন না। হলাম আমরা। বলুন, আমাদের প্রতি আপনার আর কী কী উপদেশ ?

ক্ষত্তা বিদুর বললেন, হে পৃথা-নন্দন। তুমি সর্ব ধর্মজ্ঞাতা। তবু বলছি, অধর্মের বিজয় কখনও স্থায়ী হয় না। আমি নিশ্চিত যে, ধার্তরাষ্ট্রদের মৃত্যু সন্নিকট। পরিণতি খুবই শোকাবহ হলেও করণীয় কিছু নেই। শুধু ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে ত্রয়োদশ বর্ষের শেষে বিজয়ীয় বেশে প্রত্যাবর্তন কর। এই আমার কামনা।

হস্তিনাপুরের রাজপথে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। প্রায় সব নগরবাসীই পাণ্ডবদের অনুসরণ করল। সর্ব প্রথমে যুধিষ্ঠির —দুই হস্তে তাঁর চক্ষু আবৃত। উদ্দেশ্য, তাঁর অন্তরের ক্রোধ যেন নয়নপথে নির্গত হয়ে কুরুকুল ধ্বংস না করে।

অনুসরণকারী নগরবাসীদের ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হলেন যুধিষ্ঠির। নগরসীমান্তে তিনি তাঁদের অনুরোধ করলেন, আপনারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। রাত্রি সমাগত। কাল প্রভাতে আমরা বনে প্রবেশ করব।

পুরবাসীরা প্রতিবাদ করে বলল, আমরা আপনার অনুগামী হব।

যুধিষ্ঠির শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপনারা শান্ত চিত্তে বিচার করুন। এই নগরেই রয়ে গেছেন গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, আমাদের জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র। মাতা কুন্তী, গান্ধারী এবং বিদুর। আমাদের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় তাঁরা কাতর হয়ে পড়েছেন। এখন আপনারা তাঁদের পরিচর্যা না করলে কে করবে? দয়া করে আপনারা ত্রয়োদশ বর্ষ এই নগরেই আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করুন। পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আপনাদের ভালোবাসা ও স্নেহে আমি অভিভূত ও মুগ্ধ। আপনারা নিশ্চয় আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন।

অবশেষে পুরবাসীগণ হাহাকার করে ক্ষান্ত হল। তবু কিছু দ্বিজ কোনও মূল্যেই যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করে যেতে সম্মত হল না। অগত্যা যুধিষ্ঠির তাদের অনুগমন করার অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন।

কাম্যক বনে কৃষ্ণ

দুঃসংবাদ স্থির হয়ে থাকে না। কথায় বলে, দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ধায়। কপট দ্যূতে সত্যবদ্ধ যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ের সমাচার দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল, পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনবাস এবং এক বৎসরের জন্যে অজ্ঞাতবাসকে স্বীকার করে নিয়ে অজিন ধারণ করে মুনিদের আবাসভূমি রমণীয়

কাম্যক বনে আশ্রয় নিয়েছেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজকীয় ভোগবিলাস ত্যাগ করে—ময়দানব নির্মিত ইন্দ্রসভাগৃহ তুল্য সভা পরিত্যাগ করে তাঁরা এখন পর্ণকুটিরে বসবাস করছেন। স্বাভাবিক ভাবেই পাণ্ডবদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা ছুটে এলেন কাম্যক বনে। এলেন পাঞ্চাল রাজের পুত্রগণ। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় রাজপুত্রগণ। সকলের মধ্যমণি হয়ে ছুটে এলেন বাসুদেব কৃষ্ণ দ্বারকা থেকে।

সেদিন পর্ণকুটিরে নিতান্তই স্থানাভাব। পাণ্ডব-সুহৃদ আর শুভাকাঙ্ক্ষীর দল পাণ্ডবদের বেষ্টন করে সমস্ত ঘটনার বৃত্তান্ত শুনছেন এবং ক্রোধে অধীর হয়ে উঠছেন।

ভগিনী দ্রৌপদী আর তার ভগ্নিপতির অপমান-লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা শুনে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন। রাগে দুঃখে সে আকুল হয়ে উঠে যুধিষ্ঠিরের কাছে হস্তিনাপুর আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করল। হস্তিনাপুরকে আমি এখনই ভূমিস্যাৎ করে দিতে চাই।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, শান্ত হও, পাঞ্চালনন্দন। তোমার হৃদয়ের রাগ-দুঃখ-ঘৃণা আমি অনুভব করতে পারছি! কিন্তু হস্তিনা আক্রমণের অনুমতি এখন আমি দিতে পারি না। কারণ আমরা সত্যবদ্ধ। এ সত্য আমাদের জীবনের বিনিময়েও পালন করতে হবে। ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত না হলে যুদ্ধের কথা চিন্তা করা অন্যায় হবে। সবই দৈবের ব্যাপার। নচেৎ কৃষ্ণকে আহ্বান করে এনে তার পরামর্শ গ্রহণ করতেও আমরা ব্যর্থ হলাম কেন? কৃষ্ণ দ্বারকায় ছিল না। দৈব-যোগে বাসুদেব সেদিন দ্বারকায় উপস্থিত থাকলে কৃষ্ণপ্রিয় পাণ্ডব-দের এ দুর্দশা নিশ্চয় হত না। লাঞ্ছিত হত না পাঞ্চালী।

যুধিষ্ঠিরের অনুযোগের প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই বাধা পেলেন। উদভ্রান্তার মতো আলুলায়িত

কেশা, পদ্মচক্ষু, ক্ষীণ মধ্যমা—গুরু নিতম্বিনী পাঞ্চালী এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

দ্রৌপদীর মুখ-চোখ যেন প্রদীপ্ত অগ্নির মতো অনলবর্ষী। সকলের কাছেই দ্রৌপদীর এই উত্তেজিত মূর্তি অপরিচিত। তাই সবাই আলাপ-আলোচনা ত্যাগ করে উৎকণ্ঠিত ভাবে দ্রৌপদীর দিকে দৃষ্টিপাত করল। দ্রৌপদীর রুদ্রমূর্তি ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পর্যন্ত মূক করে দিল। কিছুদিন আগে রাজসূয় যজ্ঞসভায় দেখা দ্রৌপদীর সেই উজ্জ্বল মূর্তি আজ কোথায়? দুঃশাসনের কলুষ হস্ত যেন নিষ্প্রভ করে দিয়েছে কৃষ্ণাকে। শুষ্ক হয়ে গেছে একটি কুসুম।

দ্রৌপদী স্থির দৃষ্টে সবাইকে লক্ষ্য করল। তার অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি স্বামীদের, ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে অতিক্রম করে কৃষ্ণের ওপর এসে স্থির হল। স্পষ্টতই সে কৃষ্ণকে তার আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করল। পরক্ষণেই ঘটল এক বিস্ফোরণ। জ্বালা-মুখীর মতো বিস্ফোরিত হল দ্রৌপদী। —হে দেবকীনন্দন, আমি পাণ্ডব ভার্যা, পাঞ্চাল রাজনন্দিনী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং তোমার সখি। এ হেন পাঞ্চালীর কেশ আকর্ষণ করে রজস্বলা, একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে রাজসভাগৃহে কোন দুঃসাহসে অপমান করে দুঃশাসন? সূতপুত্র কর্ণ আমাকে স্বৈরিণী বলে লাঞ্ছিত করেছে। দুর্যোধন সতীত্বের পক্ষে অবমাননাকর কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে। ওরা আমাকে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করার জন্যে বাধ্য করছিল। আমার নারীত্বের অপমানে, মর্যাদার লঙ্ঘনে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, আচার্য কৃপ নীরব ছিলেন। মহামতি বিদুর আর বিকর্ণ ছাড়া সবাই ছিলেন নিশ্চুপ। প্রতিকারের সামান্যতম প্রচেষ্টাও কেউ করে নি। স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষায় আমার মহাবল স্বামীরা, পুত্রেরা কেউই অগ্রসর হয় নি। ওই ভীষণ লাঞ্ছনার পরও আমি জীবিত। আমার এই চরম বিপদের সময় তুমি কোথায় ছিলে সখা? তোমার

সখির অপমান কি তোমার অপমান নয় ? তার দুঃখ, তার লজ্জা কি তোমারও দুঃখ, তোমারও লজ্জা নয় ? আমি সকলের আশা ত্যাগ করে শুধুমাত্র তোমাকেই প্রশ্ন করছি, বল সখা, আমার এই অপমানের, এই মর্যাদাহানির, কী প্রতিকার তুমি করবে ? বল। প্রতিশোধ বিনা আমি শান্ত হতে পারছি না। আমার হৃদয়ে দাবানল।

দ্রৌপদীর পদ্মপলাশ চক্ষুতে অশ্রু আর বহ্নিমান অগ্নি—দুয়েরই প্রকাশে দ্রাবিত এবং দগ্ধ হলেন কৃষ্ণ। দ্রৌপদীর অন্তরের জ্বালার প্রকাশ দেখে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। যুধিষ্ঠিরও যেন এই প্রথম অনুভব করলেন দ্রৌপদীর অন্তরের হাহাকার। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল তাঁর। কিন্তু যুধিষ্ঠির সঙ্গে সঙ্গে অসহায় ভাবে এ কথাও চিন্তা করলেন—সে সময় তিনি ধর্মপাশে বদ্ধ ছিলেন। তাঁর পক্ষে ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করে—প্রতিকার করারও কি সত্যিই কিছু ছিল ?

ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীর অভিযোগে আচ্ছন্ন হয়ে কৃষ্ণ শেষপর্যন্ত সরব হলেন। বললেন, হে কৃষ্ণা, শান্ত হও। বিশ্বাস কর, আমি ওই দ্যূতক্রীড়া সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত ছিলাম না। কারণ, তখন আমি শাল্ব দৈত্যকে নিধন করার জন্যে স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলাম। নচেৎ, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, তোমাদের আহ্বান শ্রবণ করা সত্ত্বেও আমি দ্বারকায় কালহরণ করতাম ? যা ভবিতব্য তা সংঘটিত হয়েছে। যা এখনও সংঘটিত হবার তাও নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে। ধার্তরাষ্ট্ররা নিশ্চয় সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কারণ, তারা নিশ্চিত ছিল, দ্যূতক্রীড়ার ষড়যন্ত্রের কথা আমি শ্রবণ করা মাত্রেই হস্তিনায় এসে উপস্থিত হব। আমার আগমন তাদের ইচ্ছার পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াত। প্রথমে তাদের দ্যূতক্রীড়ার কুফল সম্পর্কে বোঝাতাম। তবুও যদি তারা —ক্রীড়া অব্যাহত রাখার চেষ্টা করত—তবে আমি বল প্রয়োগে সে ক্রীড়া বন্ধ করতাম। ক্ষোভ ত্যাগ কর, পাঞ্চালী। ধর্মরাজ

ধর্মত কোনও অন্যায় করেন নি। তিনি এবং তাঁর ভ্রাতারা ধর্মপাশে আবদ্ধ ছিলেন। নচেৎ ধর্মরাজের সামান্যতম ইঙ্গিতে বৃকোদর ধার্তরাষ্ট্রদের সেই সভাগৃহেই নিপাত করত -একথা ধ্রুব সত্য। তবে, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো আমি ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারি যে, ত্রয়োদশ বর্ষের অন্তে এক ভয়ানক যুদ্ধে ধার্তরাষ্ট্ররা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হবে। তোমার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন তোমার স্বামীরা। কুরুনারীরা তোমার মতোই সেদিন ক্রন্দন করবে। ধৈর্যশীলা হও, কৃষ্ণা। সামনে সুদীর্ঘ সময়।

কৃষ্ণ উল্লসিত ভীম আর বিবর্ণ যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

—হে কেশব! এ কি ভবিষ্যৎ বাণী তুমি করলে! আর্তনাদ করলেন যুধিষ্ঠির।

ম্লান হাসলেন কৃষ্ণ।—লোকক্ষয় আমি পছন্দ করি না, ধর্মরাজ। কিন্তু যা ভবিতব্য তা কেউই রোধ করতে পারে না। আসুন আমরা কামনা করি, দুর্যোধনের যেন সুবুদ্ধির উদয় হয়। সে যেন যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ত্রয়োদশবর্ষের অন্তে সত্য পালন করে। আপনাকে রাজ্যপাট প্রত্যর্পণ করে। সে যেন আপনাকে ইন্দ্রপ্রস্থে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করে।

ম্লান মুখে যুধিষ্ঠির বললেন, হে কেশব! তুমি কি ভবিষ্যতকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলে? সত্যই কি যুদ্ধ অনিবার্য? অনিবার্য কুরুকুলক্ষয়?

কৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ! অনিবার্য কি অনিবার্য নয় তা আমি এ মুহূর্তে বলতে ইচ্ছুক নই। তবে আমার এ ভবিষ্যৎ বাণী চাক্ষুষ দর্শনের ফলশ্রুতি না হলেও—এ সত্য! কারণ, যে সভায় নারীর মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়—যে সভার সভাসদেরা প্রতিকারে সমর্থ হয়েও প্রতিকার করেন না বা প্রতিবাদী হন না—তাঁরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয়রা কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারেন?—

যুদ্ধ! এ এক সরল সিদ্ধান্ত। আমাদের কামনা যদি দুর্যোধনের চৈতন্য আনয়ন করতে সমর্থ হয়—তবেই যুদ্ধকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বিমর্ষ যুধিষ্ঠির বললেন, দুর্যোধন অসাধু পরামর্শদাতাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। বিপদের লক্ষণ। যা হোক, আমরা ধর্মবদ্ধ। ত্রয়োদশবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই কেবলমাত্র আমরা দাবী জানাতে পারব। তার আগে নয়। তবে আমি কামনা করি না যে, ভীমের ক্রূর প্রতিজ্ঞা সফল হোক। তবু যদি সত্যই যুদ্ধ শুরু হয়, আমি ভীমকে নিবৃত্ত করতেও সক্ষম হব না! কারণ ভীম এক ধর্মপ্রাণ সত্যনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়। প্রতিজ্ঞা পালন ক্ষত্রিয়ের অবশ্য পালনীয় ধর্ম। আমি সেই ধর্মাচরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারি না। পারবও না।

সভার আবহাওয়া গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল। শেষে যুধিষ্ঠিরই তা তরল করার জন্যে কৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, হে কেশব! আমি দূতের পর দূত প্রেরণ করেও তোমার কোনও সন্ধান পাই নি। দ্বারকার কেউই সংবাদ দিতে পারে নি যে তুমি কোথায় অবস্থান করছ। তুমি পান্ডবদের সেই দুঃসময়ে কোথায় ছিলে, কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ বললেন, হে ধর্মরাজ! আপনি আপনার রাজসূয় যজ্ঞের কথা স্মরণ করুন। স্মরণ করুন সেই দৃশ্য—শিশুপাল তার সহযোগী নৃপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞ নষ্ট করার চক্রান্ত শুরু করেছে! সেই সময় শান্তনুনন্দনের কথায় উত্তেজিত হয়ে শিশুপাল একাকী আমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করল। কোনও ধর্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়ই যুদ্ধ-আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারে না। শিশুপাল যখন কটূক্তি করছিল, তখনও আমি নিশ্চুপ ছিলাম। কিন্তু সে যখন উন্মাদের মতো যজ্ঞ নাশ করতে উদ্যত হল, তখন আমি সাড়া দিলাম। তার সমস্ত কুকীর্তি সেই যজ্ঞসভায় প্রকাশ করার পর তার আহ্বান স্বীকার করে নিলাম। যুদ্ধে শিশুপাল নিহত হল।

তার সহযোগী নৃপতিরা শিশুপালের অবস্থা দর্শন করে কেউই আর আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে সাহসী হল না। কিন্তু তাদেরই মধ্যে একজন ছিল—সে ক্রূরমনা দৈত্যরাজ শাল্ব। শিশুপালের মৃত্যুতে সে নিঃশব্দে ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করে গিয়ে—প্রতিশোধের ভাবনায় চালিত হয়ে অপ্রস্তুত দ্বারকার ওপর আক্রমণ চালাল এবং দ্বারকার প্রভূত ক্ষতি সাধন করল। শেষপর্যন্ত আমার বীরপুত্র প্রদ্যুম্ন, শাম্ব চারুদেষ্ণ, মহাবীর কৃতবর্মা, পিতা বাসুদেব, মহারাজ উগ্রসেন প্রমুখ যাদব বীরগণ প্রবল বিক্রমে দৈত্যরাজ শাল্বকে প্রতিরোধ করলেন। তাই আমার প্রিয় দ্বারাবতীকে শ্রীভ্রষ্ট করার পর শাল্ব শেষপর্যন্ত পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

আমি, অগ্রজ এবং সাত্যকি প্রমুখ কিছু যাদব যে আপনার রাজ-যজ্ঞে ব্যস্ত আছি—সে সংবাদ তো শাল্ব জেনেই গিয়েছিল এবং ধূর্ততার সঙ্গে আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল। শাল্ব এক বিশেষ ধরনের যানের অধিকারী ছিল। নিজের রাজধানীর নাম অনুসারে সে সেই যানের নাম রেখেছিল সৌভযান। সেই যানটির জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অবাধ গতি ছিল। তাতে আরোহণ করেই সে যুদ্ধ করত।

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্বারাবতীতে পৌঁছেই আমরা শাল্বের আক্রমণের কথা অবগত হই। শাল্বের স্পর্ধা দর্শন করে আমি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে প্রতিজ্ঞা করি, শাল্বকে বধ না করা পর্যন্ত আমি আর দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করব না। অতঃপর কিছু সমর-কুশল যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে আমি শাল্বের অনুসন্ধানে নির্গত হই। মায়াবী শাল্বকে অনুসন্ধান করে নিহত করার জন্যে আমাকে দীর্ঘ সময় দ্বারকার বাইরে অবস্থান করতে হয়। সেইজন্যেই আপনার দূত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যাহোক, শাল্ব ছিল এক নিদারুণ মায়াবী যোদ্ধা। প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর আমার সফলতা আসে। তার মায়ার জাল ছিন্ন করে তার সৌভযান ধ্বংস করি

এবং নিহত করি। কিন্তু উল্লাস করার সুযোগ বোধহয় আমার ভাগ্যে নেই। দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে দেখি, আপনাদের দুঃসংবাদ আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। অতঃপর কালবিলম্ব না করে আমি কাম্যক বনে আপনাদের দর্শন করার জন্যে ছুটে এসেছি। এ আমার দুর্ভাগ্য মহারাজ।

যুধিষ্ঠির বললেন, সবই ভাগ্য, কেশব!

কৃষ্ণ বললেন, সে তো নিশ্চয়। কিন্তু মহারাজ, পরিণামে ধর্মই বিজয়ী হয়। আমার অনুমান, দৈব আপনাদের আরও সহনশীল, আর সত্যনিষ্ঠ করে গড়ে তোলার জন্যেই এই আয়োজন করেছে। ত্রয়োদশ বৎসরের শেষে আপনারা নিশ্চয় সূর্যের মতো পুনরুদিত হবেন। হস্তগত করবেন নিজের রাজ্যসম্পদ। আনন্দমুখর হয়ে উঠবে ইন্দ্রপ্রস্থ।

যদুকুল-শিরোমণি কৃষ্ণ এবং অন্যান্য সবাই সেই রাত্রি পর্ণ কুটিরেই ব্যয় করলেন—পাণ্ডবদের দুঃখের অংশভাগী হলেন। পর দিন প্রাতে যাত্রার আয়োজন হল। অতিথিরা একে একে বিদায় নিতে থাকলেন। কৃষ্ণ সুভদ্রা আর অভিমন্যুকে নিয়ে দ্বারকায় প্রস্থান করলেন। তিনি বিদায়বেলায় বলে গেলেন, মহারাজ! ধর্মই শক্তি। ক্ষমাই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। ধর্ম আর ক্ষমার সমাহার আপনি। কামনা করি—নিরাপদে আপনারা ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত করে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। দ্রৌপদীর পুত্রদের নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল পাঞ্চালে। ধৃষ্টকেতু তার ভগিনী—নকুলের স্ত্রী করেণুমতিকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল চেদি রাজ্যে। কেকয় রাজ্যে গমন করল কেকয় রাজপুত্রগণ।

অতিথিরা বিদায় নিতেই কাম্যক বন যেন শূন্য হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, আমাদের দীর্ঘ বারো বৎসর বনবাস করতে হবে। তোমরা এই মহারণ্যে এমন একটি স্থান নির্বাচন কর, যেখানে মৃগ, পক্ষী এবং ফলমূলের প্রাচুর্য রয়েছে!

—যেখানে সাধুজনেরা বসবাস করে।

অতঃপর পাণ্ডবেরা সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত দ্বৈতবনের দিকে প্রস্থান করলেন। দ্বৈতবন অতি মনোরম স্থান। সরস্বতী নদীকূলে আশ্রম রচনা করে তাঁরা বসবাস শুরু করলেন। সঙ্গে রয়ে গেল হস্তিনাপুর থেকে অনুগমনকারী দ্বিজেরা। তাঁরা ধর্মরাজের সঙ্গ ত্যাগ না করার জন্যে বদ্ধপরিকর। যুধিষ্ঠির তাঁদের ভালোবাসায় মুগ্ধ। আর রয়ে গেল ইন্দ্রসেন প্রমুখ সারথি ও কিছু দাস এবং দাসী।

দিন যায়—ক্ষণ যায়। যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর ভ্রাতারা বা দ্রৌপদী কেউই এই বনবাসকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। সকলের মধ্যেই এক অবরুদ্ধ উত্তেজনা বর্তমান। তাদের মন থেকে সুখবোধ বিদায় নিয়েছে। সদা হাস্যমুখর ভ্রাতাদের এবং পাঞ্চালীর মুখ থেকে হাসি বিদায় নিয়েছে। অপেক্ষা করে রইলেন যুধিষ্ঠির। তিনি জানেন, কাল সবকিছুর উপশম ঘটায়। এরাও অভ্যস্ত হয়ে উঠবে বনজীবনে।

যুধিষ্ঠিরের অনুমান সত্য হল। নারী এবং রাজনন্দিনী হওয়ার জন্যে একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হলেও দ্রৌপদী একসময় বনবাস-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তার মধ্যে ব্যক্তিগত দুঃখশোকের অবলুপ্তি ঘটলেও অন্য এক দুঃখবোধ জাগ্রত হল। যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণা একদিন তাই ক্ষোভ জানাল, হে মহারাজ! আপনার নির্লিপ্ততা আমায় বিস্মিত করে। আপনি কী ভীষণ নির্লিপ্ত! রত্নময় স্বর্ণপালঙ্ক যাঁর শয্যা ছিল—তাঁর শয্যা আজ কি না তীক্ষ্ণ-ধার কুশগুচ্ছ! হায়! যে দেহ সবসময়ে কস্তুরী আর চন্দন লেপে সুগন্ধিত থাকত—সেই দেহ আজ সবসময়ে ধূলি ধূসরিত! সভাসদদের পরিবর্তে মুনি-ঋষিরাই আজ তাঁর সভাসদ! অজস্র ক্ষুধার্ত মুখে যিনি নিত্য আহার যোগান দিতেন—তারই কি না ফলমূল একমাত্র ভক্ষ্য! ইন্দ্রের মতো রূপবান ভ্রাতাদের মুখ

শুষ্ক—মলিন। এসব দর্শন করেও কি আপনার কোনও দুঃখ-বোধ হয় না? পাঞ্চালীর এই অবর্ণনীয় কষ্টও কি আপনাকে বিচলিত করে না? আপনি কোন ধাতু দ্বারা নির্মিত? কেন আপনার ক্রোধ জাগ্রত হয় না? কেন আপনার ক্রোধ দুরাচারী দুর্যোধনকে ভস্মীভূত করে ফেলে না? হে মহারাজ! আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন যে ক্রোধহীন, তেজহীন রাজাকে সবাই অবমাননা করে, হীনজ্ঞান করে, তার ভার্যাকেও অপহরণ করে। শাস্ত্রে বলে অজ্ঞানকে একবারই মাত্র ক্ষমা করা উচিত এবং দ্বিতীয়বারে তাকে দণ্ডদান করা প্রয়োজনীয়। অথচ দুর্যোধন বারবার অপরাধ করা সত্ত্বেও আপনি তাকে ক্ষমা করে যাচ্ছেন। আপনি ক্ষাত্র তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে দুর্যোধনকে ধ্বংস করুন। ধর্মকে রক্ষা করুন। বাসুদেব আপনার পরম সহায়। আপনার কিসের চিন্তা? কিসের দ্বিধা?

দ্রৌপদীর অনুযোগে উত্তেজিত হলেন না যুধিষ্ঠির। বরং দ্রৌপদীর ক্ষোভকে উপলব্ধি করে তিনি বললেন, হে পাঞ্চালী, ক্ষমাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ শিক্ষা কেশবেরই শিক্ষা। ক্রোধ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে। ক্রোধ মহাপাপ, ক্রোধে কুলক্ষয় হয়। প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ করেই ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত। মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ—ক্ষমা। তা আমায় ত্যাগ করার জন্যে অনুরোধ কোরো না, কৃষ্ণা। বাসুদেবপ্রিয় যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অধর্মের পথে চলা অসম্ভব। আমি ক্রোধ প্রকাশ করলে কুরুকুলের ধ্বংস অনিবার্য। কুলক্ষয়ীকে মানুষ ঘৃণা করে। ধ্বংসকে যদি আহ্বান করতেই হয় তবে তা মূঢ় দুর্যোধনই করুক। আমি কেন?

প্রত্যুত্তরে দ্রৌপদী বলল, বিধাতাকে প্রণাম। প্রণাম ধর্মকে। যে মানুষটি আজ পর্যন্ত কোনও অধর্মাচরণ করেন নি—জগতের সব দুঃখই কি তাঁর ভাগ্যে! আর অধর্মাচারী দুর্যোধনের ভাগ্যেই

কি না যত সুখ—যত আনন্দ! ধর্মের এ কী বিচার?

উত্তেজিতা দ্রৌপদীর অন্তরের ক্রোধকে অনুভব করে যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণা, ফলাফলের আশায় কেউ ধর্মাচরণ করে না। করাও উচিত নয়। লাভের আশায় কিছু করা বৈশ্যবৃত্তি মাত্র। ধর্ম আমার সহজাত প্রবৃত্তি। ধর্মই আমার শক্তি। বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে আমি সেই মহাশক্তি দিয়েই সংঘর্ষ করতে চাই। সংগ্রামই জীবন। নিরবচ্ছিন্ন সুখ জীবনের পরিপূর্ণতা নয়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ জীবনে তিক্ততা আনে।

আলোচনা হয়তো আরও কিছুকাল স্থায়ী হত। কিন্তু কুটির-দ্বারে মহর্ষি বেদব্যাস এসে উপস্থিত হতেই আলোচনা বাধা পেল। উপস্থিত সকলে দ্বারদেশে গিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভ্যর্থনা জানালেন। আহার এবং বিশ্রামের পর মহর্ষি যুধিষ্ঠিরকে কিছু মূল্যবান উপদেশ দান করলেন। তিনি বললেন, বাসুদেবের মতো আমিও জানি, ত্রয়োদশ বর্ষের শেষে কী ঘটবে। কিন্তু আমি তোমাদের ব্যস্ত করতে চাই না। তবে বুদ্ধিমানেরা অশুভ পরিস্থিতির জন্যেই নিজেদের প্রস্তুত করে। পরিস্থিতি শুভ হলে তো কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু অশুভ হলে? যদি যুদ্ধই হয় তাহলে দেখা যাবে, কৌরবেরা অস্ত্রবলে জনবলে তোমাদের থেকে অগ্রণী হয়ে রয়েছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আর কর্ণ যে বাহিনীতে অবস্থান করবে সেই বাহিনী হয়ে উঠবে অপরাজেয়। মাত্র দুটি উপায়ে এদের পরাজিত করা সম্ভব। এক, ধর্মবলে নিজেদের বলিয়ান করা। দুই, দৈবাস্ত্রে বলীয়ান্ হওয়া। দৈবাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে পাশুপত। দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হলে, অন্যান্য দেবতারাও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন। তাই তেরোটি বৎসর একই স্থানে স্থবিরের মতো বসবাস কোরো না। ভ্রমণ কর, জ্ঞানার্জন কর, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর, ভবিষ্যতের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত কর।

অতঃপর মহর্ষি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি

বিদ্যা দান করলেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্বৈত বনের পর্ণকুটিরে কিছুদিন বাস করার পর বিদায় নিলেন। পাণ্ডবেরাও দ্বৈত বন পরিত্যাগ করে কাম্যক বনে ফিরে এলেন। কাম্যক বনে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে প্রতি-স্মৃতি বিদ্যায় দীক্ষিত করে দৈবাস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন।

অর্জুনের অনুপস্থিতির সময়ে মহর্ষি বৃহদশ্ব কাম্যক বনে এলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে নলদময়ন্তীর উপাখ্যানের ছলে বললেন, দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। দুঃখেরও একদিন অবসান ঘটে। তোমাদেরও দুঃখের অবসান নিশ্চয় ঘটবে। এরপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে অক্ষহৃদয় বিদ্যা দান করলেন। এই বিদ্যার দ্বারা অক্ষক্রীড়ায় অজেয় হওয়া সম্ভব। অজ্ঞাতবাসের সময়ে যুধিষ্ঠির এই বিদ্যাকেই ব্যবহার করেছিলেন বিরাট রাজ সভায় জীবিকা অর্জনের জন্যে।

মহর্ষি বৃহদশ্বের পর এক এক করে এলেন দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি লোমশ। তাঁরা যুধিষ্ঠিরের কাছে নানান তীর্থ-মাহাত্ম্যের কথা বললেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন পুরোহিত ধৌম্য। শেষপর্যন্ত যুধিষ্ঠির কাম্যক বন ত্যাগ করে তীর্থ পরিক্রমায় নির্গত হলেন।

বনবাসের দীর্ঘ চার বছর পর তাঁরা উপস্থিত হলেন নরনারায়ণা-শ্রমে। এইখানেই তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতে অর্জুনের প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করলেন।

সফল হয়ে দেবলোক থেকে অর্জুন একদিন প্রত্যাবর্তন করল। তার সংগ্রহে এখন নানান দৈবাস্ত্র। তারই মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে পাশুপত। উৎসাহিত হয়ে উঠলেন যুধিষ্ঠির। উল্লসিত হল ভীম, নকুল আর সহদেব। আশান্বিত হয়ে উঠল দ্রৌপদী। পাণ্ডবেরা এখন নিঃসন্দেহে অপরাজিত। তাঁদের আত্মবল সহস্র গুণে বর্ধিত হল।

যুধিষ্ঠির আবার কাম্যক বনে প্রত্যাবর্তন করলেন। ভবিষ্যতের জন্যে তিনি এখন প্রস্তুত। তাঁর ক্ষমার দৃষ্টিকে এখন আর কেউ দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করবে না।

দীর্ঘ অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণও। তিনি রাজ-সুখে অথচ তাঁর মানসশিষ্যেরা বনবাসী হয়ে দিনাতিপাত করছে। ছুটে এলেন তিনি কাম্যক বনে। সঙ্গে এলেন মহামুনি মার্কণ্ডেয়। আনন্দময় কৃষ্ণের উপস্থিতিতে পর্ণকুটির আবার আনন্দময় হয়ে উঠল।

যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন কৃষ্ণ। কোনও পরিবর্তন নেই যুধিষ্ঠিরের। সেই ব্যস্ত—সমাহিত রূপ। সেই পরম বিনয়ের বিচ্ছুরণ। যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা না করে পারলেন না কৃষ্ণ। বললেন, হে ধর্মরাজ! আপনি জিতেন্দ্রিয়। লোভ আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। লোভের মোহে আপনি কোনও কাজ করেন না। কোনও কিছুর মোহে আপনি ধর্মও ত্যাগ করেন না। আপনি সত্যই ধর্মরাজ। অন্য কেউ হলে সে নিঃসন্দেহে হস্তিনা-পুর আক্রমণ করত। অর্জুনের সংগ্রহ করা দৈবাস্ত্রের মুখোমুখি হবার দুঃসাহস এ জগতে আর কার হবে? পাণ্ডবশক্তি এখন অজেয়। অপ্রতিহত।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কেশব, অযথা আমার প্রশংসা কোরো না! ধর্মের প্রতিমূর্তি স্বয়ং তুমি। তুমিই আমাদের পথ-পরিদর্শক—পরিচালক। আমরা তোমার অনুগামী মাত্র।

অতঃপর যুধিষ্ঠির মহামুনি মার্কণ্ডেয়র কাছে শুনলেন নানান ধর্মকথা—লোক ব্যবহারের কথা। নিজের জ্ঞানের ঝুলি পূর্ণ করে নিলেন তিনি।

কয়েকদিন কাম্যক বনের পর্ণকুটিরে অতিবাহিত করে কৃষ্ণ আবার বিদায় নিলেন। অশ্রুর বন্যার মধ্যে পাণ্ডবেরা তাঁকে বিদায় দিলেন। নিঃসঙ্গতা গ্রাস করল পাণ্ডবদের।

এই সময়েই আরও একটি বিশেষ ঘটনা ঘটল। পাণ্ডবেরা তখন কাম্যক বন ত্যাগ করে প্রভাসতীর্থের কাছাকাছি বাস করছেন। পাণ্ডবদের হৃদয় ঈর্ষার অগ্নিতে দাহিত করার জন্যে দুর্যোধন সমস্ত রাজকীয় বৈভব নিয়ে প্রভাসতীর্থে ঘোষযাত্রা করল।

সৈন্যদলের কোলাহলে কৌতূহলী হয়ে শিকার ত্যাগ করে ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব সেই সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বিস্মিত হল। বাহিনী তাদের পরিচিত—কৌরববাহিনী। এই প্রভাস-তীর্থে তারা কেন? কিসের জন্যে?

সসৈন্যে দুর্যোধনকে দর্শন করে চার ভ্রাতাই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। অযথা সময় নষ্ট না করে তারা কুটিরে গিয়ে রণসাজে সজ্জিত হল। তারপর যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হয়ে কৌরববাহিনীকে আক্রমণ করার অনুমতি প্রার্থনা করল। —আত্মরক্ষার জন্যে আমাদেরই প্রথম আক্রমণ করা উচিত। রণনীতি তাই বলে, অগ্রজ। অনুমতি দিন।

যুধিষ্ঠির বিস্মিত হলেন। তারপর ভ্রাতাদের উগ্রতা দর্শন করে বললেন, আমাদের প্রথমে জ্ঞাত হওয়া উচিত, সে কোন উদ্দেশ্যে প্রভাসে আগমন করেছে? সন্দেহের বশে অযথা রক্তপাত করা উচিত নয়। প্রথমে দুর্যোধনের উদ্দেশ্য কী—তা অনুধাবন করার চেষ্টা কর।

সৌভাগ্যবশত অগ্রগামী বাহিনীর সঙ্গে আসছিল প্রাতিকামী। সে পাণ্ডবদের দর্শন করা মাত্র অভিবাদন জানাল এবং যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম নিবেদন করল। প্রাতিকামীর কাছ থেকেই জ্ঞাত হওয়া গেল যে, দুর্যোধন তীর্থযাত্রায় আগমন করেছে।

পাণ্ডবেরা অবশ্যই বুঝতে পারল যে দুর্যোধনের আসল উদ্দেশ্য বৈভব প্রদর্শন করে পাণ্ডবদের উত্যক্ত করা। অথচ প্রতিবাদ করারও কিছু নেই। তবু যুধিষ্ঠির প্রাতিকামীকে বললেন,

দুর্যোধনকে বলবে যে এভাবে পাণ্ডবদের ঈর্ষালু করে তোলা সম্ভব নয়। তবে, এই তীর্থে অসংখ্য সিদ্ধ পুরুষের বাস। দুর্যোধন যেন তাঁদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত না হয়। তাহলে অনর্থপাত ঘটবে।

প্রাতিকামী যুধিষ্ঠিরের উপদেশ নিবেদন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল এবং পাণ্ডবেরাও দুর্যোধনের উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হল। কিন্তু কয়েক দিন পরে দুর্যোধন সম্ভবত যুধিষ্ঠিরের আশংকাকে সত্যে পরিণত করার জন্যেই গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। শুরু হল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল অঙ্গরাজ কর্ণ, ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা, সৌবল শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি প্রভৃতি সব কৌরব সেনাপতি। দুর্যোধন সহ কুরুকুল-নারীরা বন্দী হল। বন্দীদের নিয়ে চিত্রসেন নিজ নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কলঙ্কিত হবার ভয়ে কুরুকুলনারীরা আর্তনাদ করা শুরু করল। দুর্যোধন অসহায়ভাবে তা প্রত্যক্ষ করল। তার করণীয় কিছু ছিল না। কারণ কৌরব সেনা এবং সেনাপতিরা পলায়ন করেছে।

দুর্যোধন-পত্নী ভানুমতী কিন্তু স্থির রইল না। সে চিত্রসেনের অলক্ষ্যে এক অনুচরকে প্রেরণ করল যুধিষ্ঠিরের সন্ধানে। সাহায্যের আবেদন জানাল ভানুমতী। ভানুমতী নিশ্চিত, এই জগতে তাদের সাহায্যকারী যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি যুধিষ্ঠির। শত্রুতার কথা তাঁর মনেও স্থান পাবে না।

তাই ঘটল। সংবাদটি শ্রবণ করা মাত্র যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জুনকে আদেশ করলেন দুর্যোধন এবং কুরুকুলনারীদের মুক্ত করতে।—গন্ধর্বরাজ নগরে প্রবেশ করলেই কুলনারীরা কলঙ্কিত হয়ে পড়বে। তার পূর্বেই সকলকে মুক্ত কর।

ভীম আর অর্জুন বিস্মিত হয়ে বলল, হে অগ্রজ, এ আপনি কী বলছেন! চিত্রসেনকেই বরং আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত যে, তিনি আমাদের হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। আপনি

কুরুকুলনারীদের জন্যে দুশ্চিন্তা করছেন ? ওই নরাধম দুর্যোধন কি দ্রৌপদীর প্রতি কোনও করুণা প্রদর্শন করেছিল ?

যুধিষ্ঠির শান্ত স্বরে বললেন, তোমরা যা বলছ তা সবই সত্যি। কিন্তু একটা কথা তোমরা বিস্মৃত হচ্ছ। কুরুকুলের সঙ্গে আমরা কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি না। আমরাও কৌরব। দুর্যোধনের সঙ্গে শত্রুতা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমরা নিজেরাই তার সমাধান করব। কিন্তু বহিরাগত! আমাদের উপস্থিতিতে কুরুকুলনারীদের কলঙ্কিত করার অধিকার চিত্রসেনের নেই। বহিরাগত শত্রুর সামনে আমরা পঞ্চ ভ্রাতা নই— পঞ্চোত্তর শত ভ্রাতা। তোমরা যদি গমন করতে অস্বীকার কর, তাহলে আমি নকুল আর সহদেবকে নিয়ে স্বয়ং গমন করব।

ভীম আর অর্জুন লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারা বলল, হে অগ্রজ, আপনি সত্য কথাই বলেছেন। দুর্যোধনের অপমান—আমাদেরও অপমান। আমরা এখুনি যাত্রা করছি।

অচিরেই ভীম আর অর্জুন চিত্রসেনকে বন্দী করে দুর্যোধন আর কুরুকুলনারীদের উদ্ধার করে নিয়ে এল।

গন্ধর্বপতির বন্দীদশা দেখে লজ্জিত হলেন যুধিষ্ঠির। বিনীত ভাবে তিনি বললেন, হে গন্ধর্বপতি! আপনার লাঞ্ছনার জন্যে আমি দুঃখিত। ভীম আর অর্জুনকে অল্পবয়স্ক জ্ঞান করে ক্ষমা করুন। আপনি সসম্মানে নিজ নগরে ফিরে যান। আপনার সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। ভীম আর অর্জুন শুধুমাত্র কর্তব্য-কর্ম করেছে।

যুধিষ্ঠিরের বিনয়ে প্রীত হয়ে আশীর্বাদ করলেন চিত্রসেন। তারপর হাসি মুখে নিজ নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

অপমান-দগ্ধ দুর্যোধনও এক সময় যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে বিদায় নিল।

কাম্যক বনের বনস্পতির নিবিড় ছায়ায় বসে যুধিষ্ঠির আজকাল

প্রায়ই চিন্তা করেন—একটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের সন্ধান করেন। পাণ্ডবদের না হয় অপমানিত হবার কারণ রয়েছে। কিন্তু দ্রৌপদী? পতিব্রতা দ্রৌপদী কেন বারবার লাঞ্ছিত হবে? তার এই লাঞ্ছনা কোন মহাবিপ্লবের সূচনাকারী?

সেদিন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সসৈন্যে শ্বশুরগৃহ হস্তিনাপুর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন নিজ দেশের উদ্দেশ্যে। বনমধ্যে কুটির-দ্বারে অসামান্যা দ্রৌপদীকে দেখে চিন্তা করলেন, এ নারী নিশ্চয় সহজলভ্যা। তিনি কামোন্মত্ত হয়ে দ্রৌপদীকে বলপূর্বক নিজের রথে তুললেন।

অতঃপর সংবাদ পেয়ে ভীম আর অর্জুন তার গতিরোধ করে তাকে নিদারুণ ভাবে প্রহার করল। অর্জুন যদি ভীমকে বাধা না দিত তাহলে জয়দ্রথ নিহত হত। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে বধ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও তার অকথ্য অপরাধের জন্যে মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি ছিল। কিন্তু জয়দ্রথের মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠতাতের একমাত্র কন্যা দুঃশলার অকাল বৈধব্য ঘটবে এবং জ্যেষ্ঠতাত মর্মাহত হবেন—একথা চিন্তা করেই যুধিষ্ঠির জয়দ্রথের ওপর কঠোর হতে পারেন নি। পরে যুধিষ্ঠিরের আদেশ মতো জয়দ্রথকে মুক্ত করে দেওয়া হলে চার ভ্রাতা এবং দ্রৌপদী ভীষণ মনঃক্ষুণ্ণ হল।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের শান্ত করার জন্যে বললেন, সাধারণ অবস্থায় জয়দ্রথ এ ধরনের অপরাধের কথা চিন্তাও করতে পারত না। তাদের দৈন্যই জয়দ্রথকে প্ররোচিত করেছিল। সে দীনহীনা দ্রৌপদীকে সহজলভ্যা বলে ভেবেছিল। মানুষমাত্রই ত্রুটিযুক্ত। তাকে যদি সংশোধনের অবকাশ দেওয়া না হয় তবে সংসার জনহীন হয়ে পড়বে।

সুখে-দুঃখে এগারটি বছর যেন ঝড়ের বেগে অতিক্রান্ত হল। এই এগারটি বছর ধরে যুধিষ্ঠির জীবনকে খুব নিকট থেকে দেখলেন। সঞ্চয় করলেন জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা।

এই এগার বছর শেষে আবার কৃষ্ণের রথ দেখা দিল কাম্যক বনে। আনন্দের সাড়া পড়ে গেল পাণ্ডব-কুটিরে। অপরিবর্তনীয় যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করে কৃষ্ণ প্রীত হলেন। আনন্দে উল্লাসে কিছু দিন অতিবাহিত করলেন কৃষ্ণ। পাণ্ডবদের বনবাসের কষ্টের অংশভাগী হলেন। আবার বিদায়বেলা ঘনিয়ে এল। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিলেন, আপনারা কাম্যক বন ত্যাগ করে পশু-পক্ষী-ফল মূলের প্রাচুর্যে ভরা যমুনার তীরবর্তী শূরসেন বনে প্রবেশ করুন। শূরসেন অতি রমণীয় বন। তাছাড়া শূরসেন হয়েই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-কাশী-পাঞ্চাল-মৎস্য ইত্যাদি নানান দেশে যাওয়ার সুবিধা রয়েছে। আপনারা অজ্ঞাতবাস করলে এই সব দেশের কোথাও অবস্থান করতে পারেন। ধার্তরাষ্ট্রেরা আপনাদের কোনো সন্ধানই পাবে না। কৃষ্ণ সম্ভাব্য ছদ্মবেশ ধারণ করার উপদেশও দান করলেন। বললেন, অজ্ঞাতবাসের বৎসরটি এইভাবে নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারবেন।

এক সময় শোকবিহ্বল পঞ্চ পাণ্ডব আর দ্রৌপদীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় যাত্রা করলেন। তাঁর মনে তখন আসন্ন ভবিষ্যতের চিন্তা।

কৃষ্ণের পরামর্শ মতো পাণ্ডবেরা শূরসেন বনে প্রবেশ করলেন। ক্রমে বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হবার সময় ঘনিয়ে এল। তার পূর্বেই পাণ্ডবেরা মনের চঞ্চলতার কারণে শূরসেন বন পরিত্যাগ করে আবার দ্বৈত বনে প্রবেশ করেছিলেন।

দ্বাদশ বর্ষের শেষপাদে আবার একটি ঘটনা ঘটল।

একটি ব্রাহ্মণ তাঁর অরণি আর মন্থ গাছের শাখায় ঝুলিয়ে রেখেছিল, একটি হরিণ গাছের তলা দিয়ে যাবার সময় ওই অরণি আর মন্থ তার শিংয়ে আটকে যায় এবং হরিণটি দ্রুত আত্ম-গোপন করে।

ব্রাহ্মণটি তার অরণি আর মন্থ উদ্ধার করার জন্যে পাণ্ডবদের

শরণাপন্ন হয়। কিন্তু পাণ্ডবেরা দীর্ঘ সময় ধরে হরিণটিকে সন্ধান করেও অরণি আর মন্থ উদ্ধার করতে পারলেন না! শেষে একটি বৃক্ষের নীচে উপবেশন করে যুধিষ্ঠির নকুলকে জলের সন্ধানে প্রেরণ করলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ সময়ের পরও নকুল না প্রত্যাবর্তন করতে চিন্তিত যুধিষ্ঠির নকুলের সন্ধানে সহদেবকে পাঠালেন। এইভাবে এক এক করে সব ভ্রাতাই একে অন্যের খোঁজে গিয়ে—আর কেউ প্রত্যাবর্তন করল না। শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির স্বয়ং ভ্রাতাদের সন্ধানে যাত্রা করলেন এবং একটি সরোবরের তীরে সবাইকে মৃত অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলেন। তবে শত্রুর অন্বেষণ করার পূর্বে জলপান করে নিজের ক্লান্তি দূর করাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি সরোবরে নেমে জলপান করতে উদ্যত হলেন সেই মুহূর্তে অন্তরীক্ষ থেকে একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে বলে উঠল, সাবধান। আগে আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জলপান করলে তোমারও দশা তোমার ভ্রাতাদের মতোই হবে। এই সরোবর আমার। আমার অনুমতি ছাড়া এখানে কেউ জলপান করতে পারে না।

যুধিষ্ঠির কণ্ঠস্বরটিকে অনুসরণ করে একটি বককে দেখতে পেলেন এবং বুঝলেন যে—ওটি একটি ছদ্মবেশী যক্ষ। অন্যান্য ভ্রাতাদের মতো হঠকারিতা করলেন না তিনি। কারণ, বুঝতে পারলেন যে—ওই ছদ্মবেশী বক নিশ্চয় মহাশক্তিমান। সুতরাং পূর্বে তার প্রশ্নের উত্তর দান করাই মঙ্গলজনক। যুধিষ্ঠির বললেন, বেশ, বল। আমি প্রস্তুত।

যুধিষ্ঠির তাঁর প্রজ্ঞা থেকে বকের প্রতিটি উত্তরই যথাযথ ভাবে দান করলেন। আনন্দিত বক যুধিষ্ঠিরকে বর দান করতে উদ্যত হয়ে বলল, হে যুধিষ্ঠির, তুমি সত্যই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। তুমি জ্ঞান দান কর না। সঞ্চয় কর। আমি তোমার একটিমাত্র ভ্রাতার জীবন প্রত্যর্পণ করতে ইচ্ছুক। বল, কার জীবন কামনা কর?

বিষণ্ণ যুধিষ্ঠির ভাবলেন, এই বক জানে না যে প্রতিটি ভ্রাতাই তাঁর কাছে পুত্রবৎ। কাকে ত্যাগ করে কার জীবন তিনি প্রার্থনা করবেন? তবু একটি ভ্রাতাই যদি জীবিত থাকে তবে তাই-ই থাকুক। —হে বক, সহদেবকে আপনি জীবন দান করুন।

বিস্মিত বক বলল, কেন! সহদেব? ভীম-অর্জুন থাকতে সহদেব কেন? ভীম কিংবা অর্জুন জীবিত থাকলে তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারবে! সহদেবের কী প্রয়োজন?

যুধিষ্ঠির বললেন, হে বক, সব ভ্রাতা-ই সহোদর তুল্য। মাতা কুন্তীর সন্তান হিসাবে আমি জীবিত রইলাম। মাতা মাদ্রীর সন্তান হিসাবে সহদেব থাকুক। তাছাড়া সহদেব মাতা কুন্তীর অতি প্রিয় সন্তান। সহদেব জীবিত থাকলে মাতা কুন্তী শান্তি লাভ করবেন—আর সহদেবের মাতৃকুল জলদান থেকেও বঞ্চিত হবে না।

বক আর ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকার প্রয়োজন বোধ করল না। সে মুগ্ধ হয়ে স্বমূর্তি ধারণ করে বলল, হে পুত্র যুধিষ্ঠির, তুমি ধন্য। আমি দেব—ধর্ম। তোমার সকল ভ্রাতা-ই জীবিত হোক। আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। তুমি এ জগতে তুলনাহীন। বল, আর কী বর প্রার্থনা কর?

যুধিষ্ঠির বললেন, হে ধর্ম, আশীর্বাদ করুন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন আপনাতে আমার মতি অক্ষুণ্ণ থাকে।

ধর্ম বললেন, তথাস্তু! তোমাকে আরও একটি বর দান করছি। অজ্ঞাতবাস নিরাপদে অতিবাহিত করবে। কেউই তোমাদের সনাক্ত করতে পারবে না। তুমি পুনরায় ভারতভূমির সম্রাট হবে।

ধর্মের আশীর্বাদে পরম আশ্বস্ত হলেন যুধিষ্ঠির। তাঁর মনের সকল চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল।

বকের ঘটনার কিছুদিন পর সহদেব গণনা করে বলল, দ্বাদশ বর্ষের শেষ হতে আর মাত্র ছ'টি দিন অবশিষ্ট রয়েছে। আমাদের এখনই স্থির করতে হবে, অজ্ঞাতবাসের বর্ষ আমরা কোথায় অতি-বাহিত করব ?

অর্জুন বলল, কুরু দেশের সকল দিকে প্রচুর খাদ্য-পেয়যুক্ত ও বহুতর মনোহর দেশ রয়েছে। যেমন পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন পটচ্চর, দর্শান, বিরাট, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, বিস্তীর্ণ, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র এবং অবন্তী।

অনেক বিচার-বিমর্শ করার পর যুধিষ্ঠির ঠিক করলেন, মৎস্য দেশের রাজা বিরাট ধার্মিক, দাতা, বৃদ্ধ, বলবান, এবং ধনবান। ওই মৎস্য দেশেই আমাদের আশ্রয় নেওয়া উচিত।

স্থির হল, যুধিষ্ঠির 'কঙ্ক' নাম নিয়ে বিরাটের সভায় উপস্থিত হয়ে বলবেন, আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় বয়স্য ছিলাম। দ্যূতক্রীড়ায় আমি দক্ষ। রত্নরাজির মূল্য নির্ধারণেও আমি অদ্বিতীয়। আপনার সভায় আমি কর্ম প্রার্থনা করি।

এইভাবে 'বল্লব' নাম নিয়ে ভীম গিয়ে বলবে, সে যুধিষ্ঠিরের পাচক ছিল এবং মল্লযুদ্ধে নিপুণ।

অর্জুন স্বর্গবাসের সময় অপ্সরাদের কাছ থেকে নৃত্যগীত শিক্ষা করে এসেছে। সে নপুংসক বেশে 'বৃহন্নলা' নাম নিয়ে অন্তঃপুরবাসিনীদের নৃত্যগীত শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করবে।

নকুল ও সহদেব যথাক্রমে 'গ্রন্থিক' ও 'তন্ত্রিপাল' নাম নিয়ে বলবে যে তারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্ব ও গো-বৈদ্য ছিল। বৈদ্য হিসাবেই তারা কর্ম প্রার্থনা করবে!

সবশেষে স্থির হল, দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী বেশে উপস্থিত হয়ে বলবে

যে, সে সম্রাজ্ঞী দ্রৌপদীর রূপ পরিচর্যা করত। সে মহারানী সুদেষ্ণার কাছে কর্মপ্রার্থিনী হবে।

যুধিষ্ঠিরের দৃঢ় বিশ্বাস, মহারাজ বিরাট তাঁদের রূপ, কর্ম-কুশলতা ও ব্যক্তিত্ব দর্শন করে মুগ্ধ হবেন এবং তাঁদের কর্ম দান করবেন। বিশেষ করে বিরাট যখন ইন্দ্রপ্রস্থের অনুগত ছিলেন — তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের অনুচরদের অবহেলা করবেন না।

পরামর্শ-সভা শেষ হওয়ার পর যুধিষ্ঠির তাঁর সব অনুগামীদের কাছে গিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন। দ্রৌপদীর দাসীদের পাঞ্চালে যাবার আদেশ করলেন। ইন্দ্রসেন প্রমুখ সারথিদের বললেন দ্বারকার পথে যাত্রা করতে। অতঃপর পুরোহিত ধৌম্য নানা মূল্যবান উপদেশ প্রদান করে অনুগামী দ্বিজদের নিয়ে প্রস্থান করলেন।

অশ্রুসিক্ত চক্ষে দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের অনুগামীদের বিদায় জানিয়ে পাণ্ডবেরা যমুনা অতিক্রম করে শূরসেনে প্রবেশ করলেন। তারপর পদব্রজে মৎস্য রাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেন।

মৎস্য দেশে প্রবেশ করার পর তাঁরা এক শ্মশানভূমির কাছে একটি শমীবৃক্ষের শাখায় তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করে ঝুলিয়ে রাখলেন। নিকটবর্তী গোপবালকদের বলে গেলেন যে, তাঁরা তাঁদের মাতার মৃতদেহ কুল-পরম্পরা হিসাবে শমীবৃক্ষের শাখায় বন্ধন করে এসেছেন। উদ্দেশ্য, যাতে আর কেউ কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করে। তারপর তাঁরা বিরাটের রাজসভা লক্ষ্য করে পুনরায় অগ্রসর হলেন।

যুধিষ্ঠিরের অনুমান সত্যি বলে প্রমাণিত হল। মহারাজ বিরাট তাঁদের কাউকেই নিরাশ করলেন না। সকলকেই প্রার্থনা অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত করলেন।

বিরাট রাজ্যে প্রাণ ধারণের জন্যে কোনও অসুবিধার সৃষ্টি না হলেও হীন জীবিকার জন্যে পাণ্ডবেরা মনে-মনে গ্লানি অনুভব

করলেন। যাঁরা অজস্র প্রার্থীকে নিত্য ধনদান—আহার্যদান করতেন —তাঁরাই আজ নিজেদের উদরপূর্তির জন্যে কায়িক শ্রমে নিযুক্ত হয়েছেন! সেই মর্যাদাহীন জীবন তাঁদের সহ্য করতেই হল। দৈবের সম্ভবত অভিপ্রায় ছিল যে, পাণ্ডবেরা অহঙ্কার-শূন্য হোক।

মর্যাদা অনুসারে যুধিষ্ঠির সবচেয়ে হীন বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। রাজসভায় দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা উপার্জিত অর্থেই তাঁকে জীবন ধারণ করতে হত। রত্নাদির মূল্য নির্ধারণেও তাঁর কিছু উপার্জন হত। তাঁকে স্তুতিকার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। মহারাজ বিরাটের মনরক্ষা করাই তাঁর প্রধান কর্ম হয়ে উঠেছিল। তবু তিনি নিজের রূপ—ব্যক্তিত্বের জোরে যেটুকু সম্ভ্রম আদায় করতে পারতেন সেটুকুকেই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। ভ্রাতাদের মতো তিনি নিরাশ হলেন না। দৈবের অভিপ্রায়কে স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলিষ্ঠভাবে দৈবের মুখোমুখি হলেন।

কিন্তু তাদের এই নিস্তরঙ্গ জীবনেও যে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এবং তা তাঁদের দ্বাদশ বর্ষের সাধনাকেও মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার উপক্রম করতে পারে সেকথা তাদের একবারও মনে হয় নি।

সমস্যার সৃষ্টি হল সৈরিন্ধ্রী বেশী দ্রৌপদীকে নিয়ে। রাজান্তঃপুরে আত্মরক্ষার জন্যে দ্রৌপদী প্রচার করেছিল যে,সে পঞ্চ গন্ধর্বের পত্নী। তার স্বামীরা অলক্ষ্যে রয়েছেন! কিন্তু রাজশ্যালক কীচক দ্রৌপদীকে দেখে কামোন্মত্ত হয়ে উঠল। পঞ্চ-গন্ধর্বের সম্ভাব্য ক্রোধকে অগ্রাহ্য করে সে ভগ্নী মহারানী সুদেষ্ণাকে বলল, সৈরিন্ধ্রীকে তার চাই-চাই। নইলে জীবনের কোনও অর্থ নেই। আত্মঘাতী হবে সে।

সৈরিন্ধ্রীর রূপ দর্শন করে মহারাজ বিরাট যাতে উন্মত্ত না হয়ে ওঠেন—এই আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়েছিল মহারানী সুদেষ্ণা। এখন বিপদটি ভ্রাতার দিক দিয়ে আসাতে সে আরও আশঙ্কিত হয়ে

পড়ল। ভাইয়ের নিচ প্রস্তাব স্বীকার করার অর্থ একদিকে যেমন সৈরিন্ধ্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা—অপর দিকে ভাইকে বঞ্চিত করলে তার ক্রোধ থেকে মুক্তি পাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। কারণ মৎস্য সেনা-পতি কীচকই মৎস্যের প্রকৃত শক্তি। কীচক ক্রুদ্ধ হওয়ার অর্থ মহারাজ বিরাটের সিংহাসনচ্যুত হওয়া। শেষপর্যন্ত সুদেষ্ণা আত্মরক্ষাই উত্তম ধর্ম জ্ঞান করে কোনও এক অজুহাতে দৌপদীকে কীচকের প্রাসাদে যেতে বাধ্য করল। সন্দিগ্ধ দ্রৌপদী কীচকের প্রাসাদে প্রবেশ করা মাত্রেই আক্রান্ত হল। সতীত্ব রক্ষার জন্যে দ্রৌপদী কোনরকমে আত্মরক্ষা করে রাজসভায় আশ্রয় নিল। দুর্বিনীত কীচক সেই প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে পদাঘাত করল।

সভায় তখন যুধিষ্ঠির এবং ভীম উপস্থিত। ক্রোধোন্মত্ত ভীম তখনই কীচককে হত্যা করার জন্যে নীরবে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করল। কিন্তু স্থির-বুদ্ধি যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বর্ষের কষ্টলব্ধ সাধনার ফলকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলতে চাইলেন না। তিনি নীরবে ভীমকে নিরস্ত করলেন। কীচক দ্রৌপদীকে অপমান করার সঙ্গে সঙ্গেই যে 'মৃত্যু'কে অর্জন করেছে—তাতে তাঁর কোনও সন্দেহই ছিল না। প্রশ্ন উপযুক্ত সময়ের। মহাবলবান কীচককে এই মুহূর্তে হত্যা করা হলে যে সমস্যার সৃষ্টি হবে তাতে তাঁদের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ব্যর্থ হয়ে যাবে দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষের সমস্ত দুঃখ কষ্ট। নিরাশ হবে বহু হিতাকাঙ্ক্ষী। উল্লসিত হবে ধার্তরাষ্ট্রেরা।

দ্রৌপদী স্বামীদের নিরুত্তর দেখে বিরাটের কাছে বিচার প্রার্থনা করল। কিন্তু কীচকের বিচার করার সামর্থ বিরাটের ছিল না। তাই তিনি দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্যে বললেন, সমস্ত ঘটনা বিশদ ভাবে জানার আগে বিচার করা সম্ভব নয়, সৈরিন্ধ্রী।

বিরাটের ক্লীবত্ব দর্শন করে মর্মাহত হলেন যুধিষ্ঠির। অতঃপর তিনি সৈরিন্ধ্রীকে বললেন, সূর্যের মতো তেজস্বী তোমার পঞ্চ

স্বামী সম্ভবত এখন চিন্তা করছেন যে, ক্রোধ প্রকাশ করার এটি উপযুক্ত সময় নয়। যথাকালে তাঁরা নিশ্চয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তুমি এখন প্রকাশ্য সভায় ক্রন্দন না করে অন্তঃপুরে চলে যাও।

স্বামীদের অসুবিধার কথা দ্রৌপদী হৃদয়ঙ্গম করল। সামান্যতম হঠকারিতায় ত্রয়োদশ বর্ষের সমস্ত দুঃখ কষ্ট অর্থহীন হয়ে যাবে। পুনরায় ত্রয়োদশ বর্ষ! অগত্যা পাঞ্চালী অন্তঃপুরে ফিরে গেল।

সেদিন রাত্রে দ্রৌপদী গোপনে রন্ধনশালায় ভীমের সঙ্গে দেখা করল। আদরে-সোহাগে-অভিমানে-ক্রন্দনে দ্রৌপদী ভীমকে উত্তেজিত করে তুলল। ভীমও সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করে দেখল কীচকের মৃত্যু নিতান্তই প্রয়োজনীয় এবং এখনই। নচেৎ দ্রৌপদীর ধর্ম রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। দ্রৌপদীর পক্ষে বা অন্যান্য কোনও ভ্রাতার পক্ষে অস্ত্রহীন হয়ে কীচককে বধ করাও সম্ভব নয়। অথচ অস্ত্র ধারণ করলে পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাই অনেক বিচার বিমর্শ করে সে দ্রৌপদীকে বলল, তুমি কাল রাত্রে রন্ধনশালায় কীচককে আমন্ত্রণ জানাবে। সে যেন গোপনে একাকী আসে। বলবে, নচেৎ তোমার পঞ্চস্বামী তা জ্ঞাত হবে এবং ফলাফল হবে ভয়ংকর। রন্ধনশালায় তোমার পরিবর্তে আমি উপস্থিত থাকব। কালই যমালয়ে যাবে কীচক।

দ্রৌপদীর আহ্বান মতো কামোন্মত্ত কীচক অন্ধকার রন্ধনশালায় শায়িত ভীমকে দ্রৌপদী ভেবে আলিঙ্গন করল! প্রকৃতপক্ষে সে আলিঙ্গন করল তার মৃত্যুকে।

দ্যূতসভা, জয়দ্রথ এবং বিরাট সভায় দ্রৌপদীর ওপর লাঞ্ছনা —এই তিন অপমানের প্রতিশোধ ভীম একত্রে কীচকের ওপর নিল। মহাবলশালী শত্রুত্রাস কীচক একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হল।

ভীম গোপনে রন্ধনশালায় ফিরে গেলে দ্রৌপদী চিৎকার করে কীচকের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করল।

কীচকের শতভ্রাতা উপকীচকেরা উপস্থিত হল। দ্রৌপদী সগর্বে বলল, তাঁর পঞ্চস্বামী প্রতিশোধ নিয়ে গেছে।

কীচকের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ সৈরিন্ধ্রীবেশী দ্রৌপদীকে উপকীচকেরা বন্ধন করে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা কীচকের সঙ্গেই দ্রৌপদীকে জীবন্ত দাহ করবে। তাহলে হয়তো তাদের ভ্রাতার আত্মা শান্তি লাভ করবে। উপকীচকেরাও কীচকের মতো দুর্ধর্ষ।

রন্ধনশালা থেকে ভীম সমস্ত ঘটনার ওপর দৃষ্টি রাখছিল। দ্রৌপদীর কান্নায় সে আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে রন্ধনশালার পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে নির্গত হল শ্মশানভূমির উদ্দেশ্যে। পথে একটি বিশাল বৃক্ষকে উৎপাটিত করে ভীম উপকীচকদের আক্রমণ এবং নিহত করল। পরিশেষে দ্রৌপদীকে মুক্ত করে দিয়ে আবার গোপনে রন্ধনশালায় প্রত্যাবর্তন করল।

নগরবাসীরা পঞ্চ গন্ধর্বের স্ত্রী দ্রৌপদীকে দর্শন করে পলায়ন করতে থাকল। ভীত হলেন মহারাজ বিরাট এবং মহারানী সুদেষ্ণাও।

তাঁদের দুজনকে অভয় দান করে দ্রৌপদী বলল, অশোভন দৃষ্টিতে তার দিকে যদি কেউ না তাকায় তবে তার স্বামীরা আর কারোরই ক্ষতি করবেন না। মহারানী নিশ্চিত থাকুন। আপনার ওপরে আমার স্বামীরা যথেষ্ট তুষ্ট। আর কিছুদিন পরেই আমি এখান থেকে চলে যাব। অবশ্য দ্রৌপদী জানে যে, স্বইচ্ছায় সে না গেলে কেউই আর তাকে যেতে বাধ্য করতে পারবে না। গন্ধর্বদের ভয়ে সবাই আতঙ্কিত।

যুধিষ্ঠির সবার অলক্ষ্যে ভীমকে সাধুবাদ জানিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন।

কীচকের মৃত্যু পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকে নির্বিঘ্ন করে তুললেও তা মৎস্য দেশের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর হল। কীচকের মৃত্যুসংবাদ ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা এবং ধার্তরাষ্ট্রদেরও উৎসাহিত করে তুলল।

কীচকহীন দুর্বল মৎস্য দেশকে গ্রাস করার জন্যে একটি পরিকল্পনা রচনা করা হল। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা প্রথমে দক্ষিণ মৎস্য আক্রমণ করবে। তাকে প্রতিহত করার জন্যে মৎসবাহিনী সেদিকে যাত্রা করলেই উত্তর অংশ অরক্ষিত হয়ে যাবে। সেই সুযোগে কৌরব-বাহিনী উত্তর মৎস্যের সব গোধন অপহরণ করে নিয়ে যাবে।

বিরাটের গোধন এক বিশাল সম্পদ হিসেবেই গণ্য হত এবং পার্শ্ববর্তী সকল দেশেরই তার ওপর লোভ ছিল।

সুশর্মার আক্রমণে উদ্বিগ্ন বিরাট যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করলেন। যুধিষ্ঠির মৎস্যের এই সংকটের জন্যে নিজেকে দায়ী করলেন। কীচক জীবিত থাকলে সুশর্মা এই দুঃসাহস প্রকাশ করত না। তাই বিরাটের বিপদের দিনে তাঁকে সাহায্য করা উচিত জ্ঞান করলেন। তিনি বিরাটকে বোঝালেন, আমি, বল্লব, গ্রন্থিক আর তন্ত্রিপাল যুদ্ধের ব্যাপারে মোটামুটি অভিজ্ঞ। আপনার বিপদের দিনে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আনন্দিত হব।

বিরাট যুধিষ্ঠিরের বদান্যতায় খুশি হলেন। নবাগতদের মধ্যে যে কিছু পরিমাণে ক্ষাত্রিয়সুলভ ভাব রয়েছে তা তিনি প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি চার ভ্রাতাকেই অনুগমন করার অনুমতি দিলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুন রয়ে গেল অন্তঃপুরে।

অজ্ঞাতবাসের সময় তখনও উত্তীর্ণ হয় নি। সেইজন্য যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের বললেন, প্রয়োজন না হলে আমরা কেউই বীরত্ব প্রকাশ করতে যাব না। আমরা নীরব দর্শক হয়েই যুদ্ধের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করব। অপরিহার্য হলে তবেই আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থত্যাগ করে বিরাটকে সাহায্য করব।

কীচক আর উপকীচকহীন মৎস্যবাহিনী সত্যিই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধে বিরাট বন্দী হয়ে পড়লেন। মৎস্যবাহিনীতে ভাঙন দেখা দিল। যুধিষ্ঠির প্রমাদ গুনলেন। তিনি ভীমকে

বললেন, বৃকোদর আর নিশ্চুপ দর্শক হয়ে অবস্থান করা যায় না। এবার আমাদের সত্যিই কিছু করা দরকার। ভীম, তুমি এগিয়ে গিয়ে বিরাটকে মুক্ত করার চেষ্টা কর। আমি, নকুল আর সহদেব তোমার অনুগামী হচ্ছি।

ভীম বিনয়ের সঙ্গে বলল, হে অগ্রজ, আমি থাকতে আপনি কেন কষ্ট স্বীকার করবেন? আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি বিরাটকে এখনই মুক্ত করে আনছি।

কৃতান্তের মতোই ভীম একা ত্রিগর্তবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুশর্মার বাহিনীকে ছত্রাকার করে দিয়ে সুশর্মাকেই বন্দী করে নিয়ে এল।

—মাননীয় কঙ্ক, এই নিন আপনার শত্রু।

বিরাট সুশর্মাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছিলেন। যুধিষ্ঠির বাধা দিয়ে বললেন, না মহারাজ, অযথা প্রাণদণ্ডের কী প্রয়োজন? সুশর্মা জেনে গেল যে কীচকের অবর্তমানেও মৎস্যবাহিনী এখনও শক্তিশালী। এই শিক্ষাই ওর পক্ষে যথেষ্ট। ক্ষমা করুন ওকে।

ধর্মপ্রাণ কঙ্ককে শ্রদ্ধা করতেন বিরাট। তিনি কঙ্কের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। কঙ্ক না বললে তিনি বল্লবকে নিয়ে আসার কথা চিন্তাই করতেন না এবং বল্লব যদি না আসত, তবে এই যুদ্ধের কী পরিণতি হত—তা ভাবতেও তার ভয় হচ্ছে।

বিজয়ী মৎস্যবাহিনী সগর্বে নগরে ফিরে চলল।

কিন্তু রাজধানীতে প্রবেশ করা মাত্রেই দুঃসংবাদটি সমস্ত আনন্দ উল্লাস নষ্ট করে দিল। কৌরববাহিনী উত্তর-গোগৃহ থেকে সমস্ত গোধন অপহরণ করেছে। সুশর্মার আক্রমণ যে কৌরবদের আক্রমণেরই একটি অংশ তা উপলব্ধি করতে কারও দেরি হল না।

আক্রমণের কথায় যতটা না হোক—একা বৃহন্নলাকে সারথি

করে উত্তর যে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-কৃপ সম্বলিত কৌরববাহিনীকে প্রতিহত করতে গেছে এই সংবাদটিই মহারাজ বিরাটের চেতনা প্রায় গ্রাস করল। —একে উত্তর বালকমাত্র তায় সারথি নপুংসক বৃহন্নলা!

যুধিষ্ঠির বিরাটকে আশ্বস্ত করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি বললেন, মহারাজ, কেন অযথা চিন্তা করছেন? আমরা বৃহন্নলার শক্তি সামর্থের কথা জানি। বৃহন্নলা যখন উত্তরের সারথি তখন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। শুভ সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করুন।

কঙ্কের কথায় বিরাট সত্যিই আশ্বস্ত হলেন কিছুটা। ত্রিগর্ত-রাজের সঙ্গে যুদ্ধে কঙ্কের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়েছে বহু গুণ।

অচিরেই প্রত্যাশিত শুভ সংবাদ নিয়ে দূত ছুটে এল। সে নিবেদন করল, কৌরববাহিনীকে পরাস্ত করে উত্তর সব গোধন উদ্ধার করেছেন।

মহারাজ বিরাট ভীষণ খুশি হয়ে উত্তর আর বৃহন্নলাকে অভ্যর্থনা জানাবার আদেশ দিলেন।

যুধিষ্ঠির সঠিকভাবেই অনুমান করলেন যে, যুদ্ধজয় করেছে অর্জুন। আর নিশ্চয় অজ্ঞাতবাসের কালও সমাপ্ত হয়েছে। ফলে, তিনি ভীষণ খুশি হয়ে উঠে মহারাজকে বললেন, আমার কথা সত্যি কি না দেখলেন তো, মহারাজ! বৃহন্নলা যার সারথি—সে অপরাজেয়। কে তাকে পরাজিত করবে?

সৈরিন্ধ্রীও উপস্থিত ছিল সভায়। বিরাট আদেশ করলেন, পাশার সরঞ্জাম প্রস্তুত কর সৈরিন্ধ্রী। উত্তেজনা আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে। উত্তরের আগমন পর্যন্ত আমি দ্যূতক্রীড়ায় আত্মমগ্ন হয়ে থাকতে চাই।

অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনুসন্ধান করে যুধিষ্ঠিরও স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি

ভাবলেন, আর দ্যূতক্রীড়ার প্রয়োজন কী? দ্যূত থেকে উপার্জিত অর্থে তো তাঁকে আর জীবন ধারণ করতে হবে না। তাছাড়া এই উত্তেজক মুহূর্তে দ্যূতের প্রতি ভীষণ অনীহা বোধ করলেন। তিনি মহারাজকে বললেন, হে মহারাজ! এই আনন্দের সময় অক্ষ ক্রীড়া আর উচিত নয়। পাশা এমনিতেই সর্বনাশা বস্তু। পাণ্ডবদের কথা তো জ্ঞাত হয়েছেন। আসুন আমরা উত্তর আর বৃহন্নলাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে প্রস্তুত হই।

যুধিষ্ঠিরের কথা অগ্রাহ্য করে বিরাট বললেন, আমি আর কোন শত্রুকে ভয় করব? যার মহাবীর পুত্র একক রথে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-কৃপকে জয় করতে পারে তার আর কিসের চিন্তা? কিসের ভয়? আর কে আক্রমণ করতে সাহসী হবে এই দেশ?

মহারাজ বিরাটের মূর্খতা অসহ্য বোধ হল যুধিষ্ঠিরের। তিনি ভেবে অবাক হলেন, কেমন করে বিরাটের মতো এক প্রবীণ রাজা বিশ্বাস করছেন যে, তাঁর বালকপুত্র এককভাবে কৌরববাহিনীকে পরাজিত করেছে? যুধিষ্ঠির তাই বিরাটকে আহত না করেও তাঁর চৈতন্য উৎপাদনের জন্যে বললেন, খুব সত্যি কথা মহারাজ। যাঁর বৃহন্নলা রয়েছে তাঁর কিসের চিন্তা—ভয়?

পুত্রগর্বে আত্মবিস্মৃত বিরাট যুধিষ্ঠিরকে বারবার উত্তরের ভূমিকাকে ছোট করে বৃহন্নলাকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করতে দেখে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বললেন, একজন নপুংসককে তুমি বারবার প্রশংসা করছ—অথচ আমার পুত্রের বীরত্বটা তোমার চোখে পড়ছে না। ক্রোধভরে বিরাট তার হাতে ধরা পাশাগুলিকে সজোরে যুধিষ্ঠিরের দিকে ছুড়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর নাসিকায় আঘাত পেলেন।

নাসিকা থেকে রক্তপাত হতেই যুধিষ্ঠির তা নিজের হাতের তালুতে ধরে ফেলে বিস্মিত সৈরিন্ধ্রীকে ইঙ্গিতে বললেন, একটা পাত্র নিয়ে এস। সৈরিন্ধ্রী সঙ্গে সঙ্গে একটি সোনার পাত্র বাড়িয়ে

দিল যুধিষ্ঠিরের দিকে। যুধিষ্ঠির তাঁর রক্ত ভূমিতে পড়তে না দিয়ে সেই পাত্রে ধরলেন। ভূমিতে সেই রক্ত পতনের অর্থ হত বিরাটের মহা সর্বনাশ। যুধিষ্ঠির তা কামনা করেন না।

এই বিমূঢ় অবস্থার মধ্যেই দূত এসে রাজকুমার উত্তর আর বৃহন্নলার আগমন সংবাদ জানাল।

প্রমাদ গুনলেন যুধিষ্ঠির। অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরের রক্ত প্রত্যক্ষ করে তবে আজই সম্ভবত বিরাটের জীবনের শেষ দিন উপস্থিত হবে। দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের সঙ্কট অনুভব করল। দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির নীরব ইঙ্গিতে আবার বললেন, দেখ, দ্বারী যাতে বৃহন্নলাকে ভিতরে আসতে নিষেধ করে।

দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দ্বারীকে বলল, বৃহন্নলাকে বলবে যে—কঙ্ক তাকে ভিতরে আসতে নিষেধ করেছে।

ফলে উত্তর একাই সভাগৃহে প্রবেশ করল। পিতাকে প্রণাম করে সবিস্ময়ে সে কঙ্কের দিকে দৃষ্টিপাত করল।—পিতা, কঙ্ককে কে আহত করল? উত্তরের স্বরে শঙ্কা প্রকাশ পেল।

ক্রুদ্ধ বিরাট বললেন, কঙ্ক বারবার তোমার বীরত্বকে ছোট করে বৃহন্নলার প্রশংসা করছিল। তাই আমি পাশা নিক্ষেপ করে ওঁকে আহত করেছি।

শিহরিত হল উত্তর। বৃহন্নলার প্রতি কঙ্কের নির্দেশ মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করে আতঙ্কিত স্বরে সে বলল, হে পিতা, একি ব্যবহার করলেন! সামান্য ব্রাহ্মণ জ্ঞানে আপনি কঙ্ককে অপমান করলেন? জানেন, ইন্দ্রাদি দেবতারা ক্রুদ্ধ হলেও জীবনের আশা আছে। কিন্তু কঙ্ক ক্রুদ্ধ হলে মৎস্য দেশের ধ্বংস অনিবার্য। বৃহন্নলা যদি কঙ্কের এই রক্তপাত দর্শন করত তাহলে মহা অনর্থ উপস্থিত হত। আপনি মহামতি কঙ্ককে শান্ত করুন।

বিজয়ী পুত্রের মুখে আতঙ্কের ভাব দর্শন করে বিরাট ভীত হয়ে উঠলেন। কঙ্ককে তাঁর কখনই এক অক্ষপ্রেমী ব্রাহ্মণ বলে

বোধ হয় নি। কঙ্ক সব সময়ে এক রহস্যময় ব্যক্তিত্বে আবরিত। কঙ্কের ওপর বল্লব, বৃহন্নলা, গ্রন্থিক, তন্ত্রিপাল আর সৈরিন্ধ্রীর শ্রদ্ধা-ভক্তি তাঁকে বিস্মিত করত। ফলে পুত্রের ভৎর্সনায় তিনি সতর্ক হয়ে উঠে বিনীত ভাবে কঙ্ককে শান্ত করলেন।

বিরাট রাজের ভীতি দর্শন করে যুধিষ্ঠির তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, হে মহারাজ! ভীত হবেন না। আমি বহু পূর্বেই আপনাকে ক্ষমা করেছি। নচেৎ আমার শোণিত যদি ভূমিতে পতিত হত বা বৃহন্নলা তা দর্শন করত তবে নিশ্চয় আপনাকে সবংশে যমলোকে গমন করতে হত। মহা অমঙ্গল গ্রাস করত মৎস্য দেশকে। কিন্তু কোনও এক কারণে আমি আপনার ওপর কৃতজ্ঞ। তাই এ ব্যাপার নিয়ে আর অযথা চিন্তা করবেন না।

বিরাট আশ্বস্ত হওয়ার পর পুত্রকে যুদ্ধবর্ণনা করতে বললেন।

উত্তর সত্য গোপন না করে অর্জুনের নির্দেশ মতো বলল, হে পিতা! কুরুসৈন্য আমি জয় করি নি। আমি ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছি দেখে এক দেবপুরুষ আবির্ভূত হয়ে একক রথে কৌরবদের পরাজিত করে আমার গোধন উদ্ধার করে দেন।

—কোথায় সেই দেবপুত্র? তাঁকে তোমার সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতাম।

রহস্যময় স্বরে উত্তর বলল, দু' একদিনের মধ্যেই তিনি সভায় আগমন করে সকলকে দর্শন দেবেন। তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

সমস্ত ঘটনাটিই বিরাটের কাছে রহস্যময় বলে বোধ হল।

সেদিন রাত্রে পাণ্ডবেরা একত্রে মিলিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ মতো সহদেব গণনা করে বলল, অগ্রজ অর্জুনের আত্মপ্রকাশ যথাসময়েই হয়েছে। অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

আনন্দিত হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, তবে আমাদের আত্মপ্রকাশের দিন স্থির কর।

গণনা করে সহদেব বলল, তিনদিন পর আষাঢ়-পূর্ণিমা। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে আত্মপ্রকাশ করাই শুভ হবে।

পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী সেই তিনটি দিন ত্রয়োদশ বর্ষের বেদনা নিয়ে অতিবাহিত করলেন।

সেদিন সকালে মহারাজ বিরাট সভাগৃহে প্রবেশ করে যুগপৎ আশ্চর্য এবং ভীষণ ক্রোধান্বিত হলেন। তাঁরই সিংহাসনে বসে রয়েছে কঙ্ক। পার্শ্বে সৈরিন্ধ্রী। দক্ষিণে দণ্ড এবং ছত্র ধারণ করেছে বল্লব। সামনে করজোড়ে বৃহন্নলা। গ্রন্থিক আর তন্ত্রিপাল চামর পরিবেশনে ব্যস্ত।

রাগত স্বরে বিরাট বললেন, কঙ্ক, এবার তোমার প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হল। তুমি অতি লোভী—নিচ। আমার কর্মচারী হয়েও তুমি আমার সিংহাসন অধিকার করার ষড়যন্ত্র করেছ। বল্লব, বৃহন্নলা, গ্রন্থিক আর তন্ত্রিপালের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারছি না। কিন্তু ধিক সৈরিন্ধ্রীকে! সে তার পঞ্চ স্বামীকে বিস্মৃত হয়ে কঙ্কের পার্শ্বে উপবেশন করতে সামান্যতম লজ্জাও বোধ করছে না! এই সৈরিন্ধ্রীই কীচককে লুব্ধ করিয়ে হত্যা করিয়েছিল আমাকে হীনবল করার জন্য। এখন তোমরা সুযোগ লাভ করে আমার রাজ্যসম্পদ অধিকার করার মনস্থ করেছ। ধিক তোমাদের! দূর হয়ে যাও।

পিতাকে নীরব হবার ইঙ্গিত করেও ব্যর্থ হল উত্তর। বরং উত্তরের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে বিরাট বললেন, আমার বীরপুত্র হয়ে তোমার একি ব্যবহার! শঠ কঙ্ককে তুমি জোড়হস্তে স্তুতি করছ! ছিঃ! কঙ্কের মতো সামান্য একজন অক্ষক্রীড়ক আমার সিংহাসনের যোগ্য নয়।

বৃকোদর রাগত স্বরে কিছু বলার উপক্রম করতেই যুধিষ্ঠির তাকে নীরব থাকার ইঙ্গিত করলেন।

তখন হাস্য মুখে অর্জুন বলল, মহারাজের বক্তব্য সঠিক। সম্রাট যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এই সিংহাসন উপযুক্ত নয়!

মহারাজ বিরাট বৃহন্নলার কথা শ্রবণ করে হতচকিত হলেন।— ইনিই যদি সম্রাট যুধিষ্ঠির হবেন তবে তাঁর চার ভ্রাতা আর পাঞ্চাল-নন্দিনী দ্রৌপদী কোথায়?

বৃহন্নলা বলল, মহারাজ, আপনার সূপকার বল্লবই হচ্ছেন মধ্যম পাণ্ডব ভীম, আমি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। গ্রন্থিক হচ্ছে চতুর্থ পাণ্ডব নকুল আর তন্ত্রিপাল হচ্ছে কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব। আর সৈরিন্ধ্রীই হচ্ছে যাজ্ঞসেনী-পাঞ্চালী।

বিস্মিত বিরাটের কাছে তখনও সবকিছু যেন অবিশ্বাস্য বলে বোধ হচ্ছিল। পিতার সংশয় দেখে উত্তর বলল, হে পিতা! এই বৃহন্নলাই সেই দেবপুরুষ। ইনিই এককরথে কৌরবদের জয় করেন। বল্লববেশী ভীমই হত্যা করেন কীচক এবং উপকীচকদের এবং আপনাকে সুশর্মার হাত থেকে মুক্ত করেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরই সুশর্মাকে প্রাণভিক্ষা দেন। আমরা ভাগ্যবান যে পাণ্ডবেরা এই হীন অবস্থায় আমাদের আশ্রয়ে তাঁদের অজ্ঞাতবাসের বর্ষটি অতিবাহিত করেছেন।

এবার বিরাট ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে বললেন, হে ধর্মরাজ! আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজ্যহীন সম্রাট যুধিষ্ঠির বিরাটকে অভয় দান করলেন, হে রাজা! ক্ষমা প্রার্থনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমরাই বরং কৃতজ্ঞ। দীর্ঘ একটি বৎসর আপনার আশ্রয়ে অতিবাহিত করেছি। আপনার সমকক্ষ বন্ধু আমাদের আর কে আছে?

মহারাজ বিরাট তবু যেন ঠিক স্বস্তি লাভ করতে পারছিলেন না। তিনি হয়তো অজ্ঞাতে পাণ্ডবদের ওপর অনেক অত্যাচার— অপমানই করেছেন। যদি যুধিষ্ঠির অন্তরে ক্রোধকে লালন করেন? তারপর হঠাৎই তাঁর কন্যা উত্তরার কথা স্মরণ হল। অর্জুন

রাজান্তঃপুরে একটি বৎসর বসবাস করেছেন। অতএব যদি কন্যার কলঙ্ক রটিত হয়? অপরদিকে যদি তিনি অর্জুনের মাধ্যমে পাণ্ডবদের সঙ্গে একটি বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন তাহলে সর্বদিক রক্ষা হয়। কীচকহীন মৎস্যভূমিতে তিনি নিরুপদ্রবে রাজত্ব করতে পারবেন। তাই তিনি বিনীত স্বরে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে ধর্মরাজ! যদি ক্ষমার প্রশ্নই না ওঠে তবে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করুন। অর্জুন উত্তরাকে বিবাহ করুক। নচেৎ কন্যার অপযশ ঘোষিত হতে পারে।

সকলেই বিরাটের সঙ্কটটি উপলব্ধি করলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কোনও মন্তব্য করার পূর্বেই অর্জুন বলে উঠল, এ অসম্ভব! আমি কন্যাজ্ঞানে উত্তরাকে শিক্ষা দান করেছি। শিষ্যা—কন্যাসম। তবে মহারাজ বিরাটের আশঙ্কা দূর করার জন্যে আমি প্রস্তাব করছি, উত্তরার বিবাহ আমার পুত্র এবং কৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যুর সঙ্গে দেওয়া হোক।

মহারাজ বিরাট যেন স্বহস্তে স্বর্গলাভ করলেন। একই সঙ্গে পাণ্ডব আর যাদবদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন!—হে ধর্মরাজ! এ প্রস্তাবে আমি ধন্য। এই মুহূর্তে দ্বারকায় আমন্ত্রণ লিপি পাঠানো হোক—এই আমার প্রার্থনা।

যুধিষ্ঠির বললেন, ধন্য আমরা। উত্তরার মতো একটি নারী-রত্ন আপনি পাণ্ডবকুলে দান করছেন—এতেই আমরা ধন্য।

বিরাট সলজ্জভাবে বললেন, হে ধর্মরাজ! আপনি মহানুভব। তাই এ কথা বলতে পারলেন। অধিক বাক্যব্যয়ে আমায় লজ্জা দান করবেন না। একটু বিরত থেকে বিরাট আবার বললেন, আমার একটি প্রস্তাব রয়েছে। একত্রে এখানে বসবাস না করে আপনারা আমাদের উপপলব্য নগরে গমন করুন। সেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্ব করণীয় কর্মের অনুষ্ঠান করুন। আমার রাজকোষ, কর্মচারিগণ এবং সেনাবাহিনী আপনাদের সেবার জন্যে

প্রস্তুত রইল।

যুধিষ্ঠির বিরাটের সুবিবেচনার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

পাণ্ডবেরা উপপলব্য নগরে গমন করলেন। দেশ-দেশান্তরে নিমন্ত্রণ পত্রসহ প্রেরিত হল দূত। দ্বারকার পথে গেল বিশেষ দূত—কৃষ্ণ-অভিমন্যুসহ অন্যান্য যাদবদের সাদরে উপপলব্য নগরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার জন্যে।

একদা ইন্দ্রপ্রস্থের মতোই উপপলব্য নগর অতিথি সমাগমে পূর্ণ হয়ে উঠল।

যুদ্ধ মন্ত্রণা

উৎসবক্লান্ত মৎস্যের উপপলব্য নগরী।

দেশ-দেশান্তর থেকে অতিথি-অভ্যাগতেরা এসেছেন। সকলের মধ্যমণি হয়ে বিচরণ করছেন কৃষ্ণ। তিনিই এখানকার প্রধান ব্যক্তিত্ব।

অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু আর বিরাট-দুহিতা উত্তরার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। বিশাল প্রাসাদ এখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। শুধুমাত্র জাগ্রত রয়েছেন যুধিষ্ঠির এবং প্রাসাদ-প্রহরিগণ।

দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষের পর সম্ভবত আজই দ্রৌপদী রমণ সুখে আচ্ছন্ন হয়ে সুসুপ্তির আশ্রয় নিয়েছে। তার মাথার কেশ মুক্ত। বেশবাস অবিন্যস্ত।

কক্ষে রত্নদীপের ক্ষীয়মান শিখার সঙ্গে বাতায়ন পথে আসা চন্দ্রালোকের মিতালী। যুধিষ্ঠির ঘুমন্ত দ্রৌপদীকে পরম তৃপ্তির সঙ্গে দর্শন করে চিন্তা করলেন, তার পার্শ্বেই তো শায়িত রয়েছে সর্ব সুখের আকর—পাঞ্চালী। তবু তিনি আজ বিষণ্ণ কেন? আজ তাঁর আনন্দের দিন। পাণ্ডবদের সঙ্গে নতুন শক্তি হিসাবে যোগ দিয়েছে মৎস্য। কৃষ্ণের উপদেশ মতো আগামীকাল প্রভাতেই তিনি

হিতৈষীদের সঙ্গে মিলিত হবেন সভাকক্ষে। সকলে পরামর্শক্রমে স্থির করবেন তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। যাদব-পাঞ্চাল-মৎস্য এবং পান্ডবদের মিলিত শক্তি কি দুর্যোধনের ভীতির উদ্রেক করবে না? নিশ্চয় করবে।

ভবিষ্যৎ যতই উজ্জ্বল হোক না কেন—তবু তা ত্রয়োদশ বর্ষের দুঃখ-কষ্ট-দৈন্যে আচ্ছন্ন যুধিষ্ঠিরের মনকে সঠিক ভাবে আলোকিত করতে পারছিল না। অভিমন্যুর বিবাহে অনেকে আগমন করেছেন ঠিকই—কিন্তু যাদের আগমন ছিল একান্ত প্রয়োজনীয় সেই ধার্তরাষ্ট্রেরাই অনুপস্থিত। অবশ্য গোধন অপহরণের ঘটনার পর মৎস্য দেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আগমন করাটা তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক। ঠিকই। তাই এত আনন্দের মধ্যেও যুধিষ্ঠির শঙ্কিত। শান্তিতে কি তিনি লাভ করতে পারবেন ইন্দ্রপ্রস্থ? না কি যুদ্ধই অবশ্যম্ভাবী? কিন্তু কার সঙ্গে যুদ্ধ? আশৈশব যাদের সঙ্গে লালিত হয়েছেন—একই গুরুর কাছে অধ্যয়ন করেছেন—অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছেন—সেইসব মানুষদের সঙ্গেই যুদ্ধ! তাও শুধুমাত্র কিছু ভূমিখণ্ডের লালসায়?

বিচলিত যুধিষ্ঠির ঘুমন্ত কৃষ্ণার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কৃষ্ণার মুখমণ্ডলে—সর্ব অবয়বে পরিতৃপ্তির ছবি। যুধিষ্ঠির ভাবলেন, কৃষ্ণার অরণ্যের মতো কেশদামে মুখ গোপন করে, আতপ্ত দেহের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কি অতিবাহিত করা যায় না? না। নিশ্চয়ই নয়। কারণ কৃষ্ণার মুক্ত কেশই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তা সম্ভব নয়। ওই কেশ আকর্ষণ করেছিল দুঃশাসনের কলুষ হস্ত। তিনি সেই দুর্ঘটনার কথা বিস্মৃত হবার চেষ্টা করলেও কৃষ্ণা বিস্মৃত হবে না—ভ্রাতারাও না। একমাত্র উপায়—দুর্যোধনের চৈতন্যোদয়। তাইবা সম্ভব কি? শকুনি-কর্ণ জীবিত থাকতে শান্তির পথে—ধর্মের পথে দুর্যোধন কি কখনও পদচারণা করতে সক্ষম হবে?

তৃতীয় প্রহরের শিবাদলের ডাক বিলীন হল। যুধিষ্ঠির ভাবলেন, তাঁর নিদ্রার প্রয়োজন। শুভই তিনি কামনা করবেন।

[মহাভারতের যুদ্ধের উদ্যোগ এখান থেকেই শুরু। ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে যে সম্ভাবনাটুকু মানুষের চিন্তার মধ্যে ছিল—উপপলব্য নগরের এই মন্ত্রণাসভায় তা বাস্তব রূপ ধারণ করল। এর জন্যে আমাদের প্রয়োজন হয়েছে, পটভূমি হিসাবে রাজসূয় যজ্ঞ, দ্যূতক্রীড়া, পাণ্ডবদের বনবাস, বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাস ইত্যাদি পশ্চাদপট বর্ণনা করার। মহাভারতের প্রকৃত নায়ক যুধিষ্ঠির তথা পাণ্ডবেরা। তাদের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কৃষ্ণ—দ্রৌপদীর বিবাহের সময় থেকে। কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যুধিষ্ঠিরের মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই আমাদের প্রয়োজন হয়েছিল বনবাস ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ।

যথা কৃষ্ণ—তথা ধর্ম--তথা জয়। এহেন কৃষ্ণ যাঁদের সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল—তাঁরা কতটা ধর্মপরায়ণ, কতটা শক্তিশালী, কতটা সহিষ্ণু তা পর্যালোচনা করে দেখার প্রয়োজন ছিল। তাই বিস্তৃত আলোচনা। পর্যালোচনা। ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখেছি যে ধর্মের বিচারে যুধিষ্ঠির সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কোথাও তাঁর পতন ঘটে নি। তিনি কৃষ্ণের উপযুক্ত সহচর বা যথার্থ অনুগামী।

উদ্যোগ পর্বে আমরা দেখব, চিন্তার দিক দিয়ে কৃষ্ণ আর যুধিষ্ঠির মূলত এক ও অভিন্ন।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের—চালিকাশক্তি ক্ষমা এবং বল প্রয়োগের সামঞ্জস্য বিধানের তত্ত্ব। কোন তত্ত্বটি শ্রেয়, প্রেয় এবং কোন পরিস্থিতিতে—তাই প্রকাশিত হয়েছে এই পর্বে।

আমাদের মধ্যেকার প্রচলিত একটি মিথ্যা বিশ্বাসকে খণ্ডন

করেছে এই পর্ব। কৃষ্ণ তথা যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধবিরোধী রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে এই পর্বে। আমরা অনেকে বিশ্বাস করি যে, মহাভারতের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রধান হোতা কৃষ্ণ স্বয়ং। এই উদ্যোগ পর্ব আমাদের কাছে প্রমাণ করবে যে, কৃষ্ণ যুদ্ধ সম্পর্কে কী ভীষণ নির্লিপ্ত ছিলেন! আমরা কৃষ্ণকে কূটকৌশলী ইত্যাদি কী ভীষণ সব বিশেষণে ভূষিত করে এসেছি বা আসি। ভারত ইতিহাসের মহানতম ব্যক্তিত্বটিকে আমরা কী ভীষণ নির্লজ্জতার সঙ্গে কলঙ্কিত করে এসেছি!

আসুন, আমরা উপপলব্য নগরের সেই মহতী সভার দৃশ্যটি কল্পনা করি।]

সভার কলগুঞ্জন অতিক্রম করে কৃষ্ণের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হল। —হে পাণ্ডবহিতৈষী সভাসদগণ, উপস্থিত আপনারা জানেন, সত্যবদ্ধ পাণ্ডবেরা শর্তমতো দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং একটি বর্ষ অজ্ঞাতবাসের কাল সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা ধর্মপথ থেকেও কিন্তু বিচ্যুত হন নি। ধর্ম অনুযায়ী তাঁদের হৃত রাজ্যসম্পদ পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু কৌরব পক্ষের মধ্যে এ যাবৎকাল সেরকম কোনও উদ্যোগই দেখা যায় নি। তাই এখন কৌরব-পাণ্ডবদের পক্ষে যা হিতকর, ধর্ম-সাপেক্ষ, যশস্কর এবং উপযুক্ত তাই-ই আপনারা চিন্তা করুন। বলুন, এ সঙ্কটের সমাধান কেমন করে সম্ভব?

[এখানে কৃষ্ণের বক্তব্য লক্ষণীয়। কৃষ্ণ এমন কথা বললেন না যে, যাতে রাজ্য পুনরুদ্ধার হয়—তার চেষ্টা করুন। কেননা হিত, ধর্ম, যশ থেকে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য তা তিনি কারও প্রার্থিত বলে বোধ করেন না। পরে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মনোগত ইচ্ছা আরও প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মের পথে

স্বর্গের সাম্রাজ্যও কামনা করেন না। কিন্তু যদি ধর্মসম্মত উপায়ে তিনি একটি মাত্র গ্রামও লাভ করেন, তাতেই তিনি আনন্দিত। এইখানেই কৃষ্ণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের মানসিক ঐক্য।]

কৃষ্ণ আসন গ্রহণ করলে মহারাজ বিরাট উঠে বক্তব্য রাখলেন। —হে পাণ্ডবশুভাকাঙ্ক্ষী সভাসদগণ! আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে। বাসুদেব-নন্দন আমাদের এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে অনুরোধ করেছেন। সত্যনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা সত্য পালনের জন্যে দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ ভীষণ দুঃখ-কষ্ট এবং হীনতার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন—তবু ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হন নি। এতদিনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রত্যাবর্তনের আমন্ত্রণ আসা উচিত ছিল—কিন্তু তা আসে নি। অভিমন্যু-উত্তরার শুভ বিবাহেও তাঁরা যোগদান করেন নি। তাঁদের আচরণ রহস্যজনক এবং উদ্বিগ্নজনকও বটে। তাই পাণ্ডব-হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আমাদের বিচার করা কর্তব্য—কেমন করে পাণ্ডবেরা আবার ইন্দ্রপ্রস্থে অধিষ্ঠিত হবেন। সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত তাঁদের প্রয়োজন মতো সাহায্য করা। এখানে বষীর্য়ান্ রাজা দ্রুপদ উপস্থিত রয়েছেন—আমরা সর্বাগ্রে তাঁর অভিমত জানতে ইচ্ছুক হব।

মহারাজ দ্রুপদ গাত্রোত্থান করলেন। উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে তিনি সম্বোধন করে বললেন, হে শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ! আমরা অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিরাটরাজকন্যা উত্তরার শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত হয়ে এখানে এসেছিলাম। সেই শুভকার্য নির্বিঘ্নে সমাধা হয়েছে। এখন আমরা আনন্দিত হৃদয়ে যে যার রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। কিন্তু তাহলে আরও একটি শুভ-কর্মের অনুষ্ঠান অসমাপ্ত রয়ে যাবে। পাণ্ডবদের হিতৈষী হিসাবে —বন্ধু হিসাবে—আত্মীয় হিসাবে আমাদের উচিত হবে ধর্মরাজ

যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা অথবা যুধিষ্ঠির কেমন করে পুনরায় ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন সে সম্পর্কে যথাযথ উপদেশ দান করা। সাহায্য করা।

ধর্মাশ্রয়ী পৃথানন্দনেরা দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে এবং একটি বৎসর অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত করেছেন। এখন হস্তিনাপুরের উচিত সত্য পালন করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে, এ পর্যন্ত কৌরব পক্ষ থেকে সেরকম কোনও সৎ প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখা যায়নি। তাই আমার বোধ হয়, দুরাত্মা দুর্যোধন পাণ্ডবদের বঞ্চিত করতে চায়। বিনা যুদ্ধে হয়তো পাণ্ডবেরা তাঁদের হৃত রাজ্যসম্পদ উদ্ধার করতে পারবেন না। তবে তাই যদি হয় তবে আমরা নিশ্চয়ই পাণ্ডবদের সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করব। এখানে যাদব, পাঞ্চাল, মৎস্য, মগধ, চেদি ইত্যাদি নানা রাজ্যের বীরগণ উপস্থিত রয়েছেন। তাঁরা সবাই ধর্মাশ্রয়ী। তাই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পাণ্ডবদের সাহায্য করতে কেউই কুণ্ঠিত হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু তা হল চরমপন্থা। শাস্ত্রে বলে, চরমপন্থা গ্রহণ করার পূর্বে শান্তিতে আলোচনা করা উচিত। শান্তিউদ্যোগ ব্যর্থ হলেই চরমপন্থার দ্বার খুলে যায়। যুধিষ্ঠিরকে আমি উপদেশ দেব, তিনি যেন সর্বপ্রথমে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এমন একজন মিষ্টভাষী—বিনয়ী দূতকে প্রেরণ করেন, যিনি কুরুরাজকে ধর্মাধর্ম অবহিত করতে পারবেন। শুধুমাত্র ধৃতরাষ্ট্রকেই নয়, গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ-কৃপ এবং অঙ্গরাজ কর্ণকেও অবহিত করতে হবে। যদি শান্তির এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়—তবে আমরা একতাবদ্ধ হয়ে কৌরবদের উচিত শিক্ষা দেব!

বর্ষীয়ান্ রাজা দ্রুপদের পরামর্শ সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হল।

পাঞ্চালবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার কথা মনোযোগ সহকারেই অনুধাবন করছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত পিতার পরামর্শ তার কাছে

গ্রহণযোগ্য হল না। সে প্রতিবাদ করে বলল, আমায় ক্ষমা করবেন। পিতার বক্তব্য আমি গ্রহণযোগ্য বলে বোধ করছি না! কারণ, এ সবই মিথ্যা পরিশ্রম। দুর্যোধন কখনই স্বইচ্ছায় পাণ্ডবদের রাজ্যসম্পদ প্রত্যর্পণ করবে না। বিনা রক্তপাতে যে সম্পদ সে অধিকার করেছে—তা কি প্রত্যর্পণ করার জন্যে? কৌরবেরা যুদ্ধের ভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা বোঝে না। তাছাড়া সেই কপট দ্যূতক্রীড়া, আমার ভগিনীর লাঞ্ছনা আমি কি করে বিস্মৃত হব? পাণ্ডবেরা যদি সব কথা বিস্মৃত হয়ে নরাধমদের ক্ষমা করে—তবে তা ক্ষাত্র ধর্ম হবে না। হে সম্রাট যুধিষ্ঠির! আমার ইচ্ছা—আজই আমরা হস্তিনাপুর আক্রমণ করি। দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষের প্রতীক্ষা প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি? বল প্রয়োগে আমরা যদি সম্মত না হই—তাহলে ওরা চিন্তা করবে যে, পাণ্ডবেরা দুর্বল—হীন। অপর দিকে শান্তি-দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হবে আরও লজ্জা—আরও অপমান। হে ধর্মরাজ! আপনি পরম জ্ঞানী, আপনি জানেন যে অধিকার ভিক্ষার বস্তু নয়। অধিকার বল প্রয়োগে অর্জন করার বস্তু।

ধৃষ্টদ্যুম্ন যেন ভীমের মনোগত ইচ্ছাই প্রকাশ করল। তাই ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমর্থন করে বলল, হে পাঞ্চালবীর! আপনি যথার্থই বলেছেন যে, মিষ্ট কথায় দুর্যোধন কখনও আমাদের রাজ্যসম্পদ প্রত্যর্পণ করবে না। দ্যূতসভার কথা স্মরণে রেখে ক্ষত্রিয় হিসাবে আমরা কখনই তাদের ক্ষমা করতে পারি না। আজ রাত্রেই যদি আমি হস্তিনাপুর অগ্নিদগ্ধ করে শ্মশানে পরিণত করতে পারি—তবেই আমার শান্তি। হে ধর্মরাজ! ক্ষমা করবেন। আপনার মহত্ত্বের জন্যেই আজ আমাদের এই অপমান-লাঞ্ছনা-দুঃখ-কষ্ট। আপনার কল্যাণেই সেই পাষণ্ড দুর্যোধন এখনও জীবিত রয়েছে। আপনার কৌরবপ্রীতির কারণ আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আজ্ঞা করুন, আজই আমরা হস্তিনাপুর আক্রমণ করে

ধার্তরাষ্ট্রদের নিপাত করি। নিবৃত্ত হোক প্রতিহিংসার জ্বালা।

ভীমের বক্তব্য সমর্থন করল অর্জুন, নকুল, সহদেব প্রমুখ বীরেরা। তারাও যুদ্ধের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করল। —হে মহারাজ! অনুমতি দিন, আজই আমরা হস্তিনাপুর আক্রমণ করি। প্রতিশোধের অপেক্ষায় আমরা অধীর হয়ে উঠেছি। দীর্ঘ কাল আমরা এমনই একটি দিনের স্বপ্ন দর্শন করে এসেছি। আমাদের নিরাশ করবেন না।

সভায় গুঞ্জন উঠল। অনেককেই বলতে শোনা গেল—সত্যিই তো, ওরা যুদ্ধের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। অনুনয়-বিনয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজনই বা কী? ন্যায্য দাবী—হয় প্রত্যর্পণ কর না, হয় মৃত্যু বরণ কর। ওরা এখনও অপ্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। এটাও একটি সুবর্ণ সুযোগ। আসুন, আমরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করি।

বিচলিত হলেন যুধিষ্ঠির। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম প্রভৃতি বীরের ভাষণ সভাকে প্রভাবিত করতে চলেছে। যুদ্ধের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করাটাই সমীচীন। তিনি এঁদের রুষ্ট করতেও পারলেন না। কারণ এদের সম্মিলিত শক্তিই হচ্ছে পাণ্ডবশক্তি। এদের উৎসাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেওয়ার অর্থ হবে—এদের যুদ্ধোৎসাহে প্রতিবন্ধকতা করা—যা ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। এই যুদ্ধে পাঞ্চালবীরেরাই বেশি উৎসাহী। কারণ, দ্রৌপদী—পাঞ্চালকন্যা। তার অপমান স্বামী হিসাবে পাণ্ডবেরা বিস্মৃত হলেও পাঞ্চালেরা বিস্মৃত হবে না। তারপর রয়েছে আচার্য দ্রোণের সঙ্গে মহারাজ যজ্ঞসেনের পুরাতন হিসাব-নিকাশ। সেই হিসাব-নিকাশ আবার হস্তিনাপুরের সঙ্গেও জড়িত হয়ে গেছে। মৎস্যবীরেরাও সমান আগ্রাসী। গোধন অপহরণের অপমান তারাও সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে শান্তি-আলোচনার ফলাফল কী হবে তা তিনিও জানেন। একবস্ত্রা রজস্বলা পাঞ্চালীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের

জন্যে ক্ষত্রিয় হিসাবে তাঁরও করণীয় কিছু রয়েছে। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম উপেক্ষা করতে পারেন না। তবু…… !

সব ধর্মের ওপরে যে ধর্ম—যে ধর্মকে কৃষ্ণও বিশ্বাস করেন—ক্ষমার সেই শাশ্বত ধর্মকে তিনি বিশ্বাস করেন। তবু যুধিষ্ঠির ভাবলেন, আজকের পরিস্থিতি পাণ্ডবদের পক্ষে অবশ্যই সুবর্ণ সুযোগ। একদিকে অপ্রস্তুত হস্তিনাপুর। অপরদিকে পাশুপত প্রভৃতি দৈবাস্ত্রে সজ্জিত অর্জুন। কৃষ্ণার দিকে অসহায় ভাবে দৃষ্টিপাত করে তিনি চিন্তা করলেন, কিন্তু এ বিজয় কিসের বিনিময়ে ? অযুত নিরপরাধ জীবনের বিনিময়ে ! সামান্য রাজ্যখণ্ডের জন্যে শত সহস্র প্রাণের আহুতি। কৃষ্ণও কি সমর্থন করবেন তা ? আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধনের—স্নেহ-মায়া-মমতা-প্রীতির পবিত্র বন্ধনের বিনিময়ে ইন্দ্রপ্রস্থ ! কী সুখ লাভ করবেন সেই বিজয়ে ? কৃষ্ণের কাছেও কি তাঁর লোলুপতা প্রকাশ হয়ে পড়বে না ? ধর্মসংকটে অস্থির হয়ে উঠলেন যুধিষ্ঠির। একদিকে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের যুদ্ধলালসা—অন্যদিকে মানবধর্মের পবিত্রতা —যুদ্ধ না শান্তি, ক্ষমা না জিঘাংসা, ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন যুধিষ্ঠির।

এই সংকট থেকে তাঁকে কে উদ্ধার করতে পারে ? কৃষ্ণের মুখের ওপর স্থির হল যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ যিনি অনুভব করতে পারেন যুধিষ্ঠিরকে। কারণ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণেরই ছায়া মাত্র। এই মহৎ মানুষটিই তাঁর সর্বকর্মের পরিচালক—উৎসাহদাতা। এই একটি মানুষ যাঁর কথাই—এই সভাগৃহে শেষ কথা বলে বিবেচিত হবে।

কৃষ্ণ নীরবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ধর্মরাজের সংকট তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন সঠিক ভাবেই। তাই অযথা কালহরণ করে সভার উত্তেজনা বৃদ্ধি করা তিনি আর সমীচীন বলে বোধ করলেন না। আসন ত্যাগ করে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, হে সম্মানীয় সভাসদগণ ! আপনারা

বীর। বীরেরা বীরের উপযুক্ত কথাই বলেছেন। ক্ষাত্রধর্ম বলে—অনুনয়-বিনয়ের পথ ত্যাগ করে বাহুবলেই কার্য উদ্ধার করা প্রকৃত ধর্ম। ক্ষত্রিয় হিসাবে আমি বলব—নিঃসন্দেহে এই পথটিই শ্রেয়। কিন্তু আমরা—পাণ্ডব-শুভকাঙ্ক্ষীরা, যেহেতু প্রকৃত ধর্মকেই মর্যাদা দান করি, তাই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে শ্রেয় আর প্রেয়র মধ্যে একটি ব্যবধান রয়েছে। শ্রেয় হচ্ছে তাই—যা ধৃষ্টদ্যুম্ন—প্রমুখেরা বললেন। আর প্রেয় হচ্ছে মহারাজ দ্রুপদ যা বললেন। ধর্মজ্ঞ বষীয়ান্ মহারাজ দ্রুপদ উচিত কথাই বলেছেন যে, শাস্ত্রমতে প্রথমে প্রীতির সঙ্গে শান্তি-আলোচনার প্রয়োজন। যদি তা ব্যর্থ হয়—ধরে নেওয়া যাক, তা ব্যর্থ হবেই—তাতেও আমাদের ধর্মশক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর ধর্মই হচ্ছে প্রকৃত শক্তি—বাহুবল বা অস্ত্রবল নয়। প্রকারান্তরে আমরা যদি শান্তি-আলোচনায় ব্যর্থ হই—তাহলে অযুত জীবনের মৃত্যুর দায়িত্ব আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। তার ভারবাহী হবে দুর্যোধন প্রমুখ ধার্তরাষ্ট্রেরা। কৌরবদের অনুগামীদের মধ্যেও ধর্মজ্ঞের অভাব নেই। তাঁরা দুর্যোধনকে তিরস্কার করে নিশ্চয় আমাদের পক্ষে যোগদান করতে চাইবেন। আমরা কৌরব শিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারব। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য হচ্ছে, যা ঘটবার তা স্বাভাবিক ভাবে ঘটুক। শাস্ত্রসম্মত পথ লঙ্ঘন করে আমরা কেন সেই ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করতে যাব? দীর্ঘকাল আমরা অপেক্ষা করেছি—আর না হয় মাত্র কটি দিন···আমরা কি ধর্মরক্ষার জন্যে এই সামান্য ত্যাগটুকুও স্বীকার করতে অপারগ হব! আসুন, আমরা আরও কটি দিন শান্তভাবে ধৈর্য ধারণ করি।

সভায় আবার গুঞ্জন উঠল। কৃষ্ণের বক্তব্য সবাইকে প্রভাবিত করল। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখেরা মনঃক্ষুণ্ণ হলেও কৃষ্ণের আবেদন উপেক্ষা করতে পারল না।

যুধিষ্ঠির নীরবে কৃষ্ণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন,—ধর্মজ্ঞ

অথচ প্রিয়ভাষী—এমন একজন দূতের ভূমিকায় আমি পাঞ্চাল-পুরোহিতের নামই প্রস্তাব করব। আপনারা বিবেচনা করুন।

সকলেই একবাক্যে যুধিষ্ঠিরের নির্বাচনকে সমর্থন করলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির দ্রুপদের পুরোহিতকে সম্বোধন করে বললেন, হে ধর্মজ্ঞ! আপনি এখনই হস্তিনাপুরে গমন করুন। সেখানে পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃব্য বিদুর, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, মাতা কুন্তী ও জ্যেষ্ঠামাতা গান্ধারীকে দর্শন করে আমাদের কুশল সংবাদ নিবেদন করবেন। তারপর জ্যেষ্ঠতাতকে বলবেন, তাঁরই অনুগ্রহে আমরা পঞ্চভ্রাতা জীবন ধারণ করে রয়েছি। তাঁরই আজ্ঞায় আমরা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করেছি। পাণ্ডবেরা সত্য পালন করেছে। এবার কৌরবেরাও যেন তাই করে। তিনি যেন পাণ্ডবদের রাজ্যসম্পদ প্রত্যর্পণ করেন - পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, তাঁরা শুভ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে পাণ্ডবদের বঞ্চিত করার প্রয়াস করছেন, তবে পাণ্ডবেরা ধার্তরাষ্ট্রদের ধ্বংস করে নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য হবে। দ্যূতসভায় পাণ্ডবেরা যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছিল— তা সবই তাদের হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। প্রতিটি প্রতিজ্ঞাই তারা পালন করবে।

সভা ভঙ্গ হল। কৃষ্ণ আর যুধিষ্ঠির ব্যতীত আর সবাই গাত্রোত্থান করলেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, হে কেশব, তুমি বিষণ্ন কেন?

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে কৃষ্ণ বললেন, হে অগ্রজ! যুদ্ধের সম্ভাবনায় আমি চিন্তিত। আমার বিশ্বাস—যুদ্ধ অনিবার্য। সৌবল শকুনি এবং রাধেয় কর্ণের কূট পরামর্শে দুর্যোধন আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে। শান্তির উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার অর্থই হবে যুদ্ধ। আবার যে যুদ্ধে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, আচার্য কৃপ, অঙ্গরাজ কর্ণ থাকবে সে যুদ্ধও কোনো সাধারণ যুদ্ধ হবে না। ভারতভূমির

সব রাজন্যরাই এক একটি পক্ষ অবলম্বন করবেন। গঙ্গাপুত্রের ব্যক্তিগত প্রভাবে অধিকাংশই যে কৌরবপক্ষে যোগদান করবে—এতে কোনও সন্দেহ নেই। কৌরবদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ার আরও একটি কারণ হবে—ও পক্ষের জয়ের সম্ভাবনা। যেহেতু সাধারণ মানুষের ধারণা, বিজয় আসে ব্যক্তিগত যুদ্ধনৈপুণ্য, সৈন্যশক্তি আর অস্ত্রশক্তির জন্যে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। যুদ্ধ বিজয়ের প্রথম শক্তি—ধর্মশক্তি। প্রাথমিক বিপর্যয় ঘটলেও পরিণামে ধর্মেরই জয় হয়। ফলে অন্তিম বিজয় আপনারই করায়ত্ত হবে ধর্মরাজ—ধ্রুব নিশ্চিত। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে। সে প্রাণ আবার অন্য কারও নয়—আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের! হে অগ্রজ, আমি জানি, আপনি যুদ্ধ কামনা করেন না—আমিও না। বিশেষ করে এই যুদ্ধে যখন—উভয় পক্ষই আমাদের নিকট আত্মীয়। তাই যাদবদের সমস্যা আরও কঠিন। পাঞ্চাল এবং মৎস্যের যুদ্ধ করার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু যাদবদের? যাদবরা কেন এই আত্মীয়-যুদ্ধে উৎসাহ বোধ করবে? আমাদের যাদবসংঘ একাধিক কুলে বিভক্ত। তাই একক ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়াও আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক। আমি কৃষ্ণ—ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু অগ্রজ বলরাম—দুর্যোধনের প্রতি—একথা তো আপনার অজ্ঞাত নয়। ফলে যুদ্ধে যোগদান করার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃ-বিরোধ ঘটাও আশ্চর্যের নয়। তাই, মহারাজ! আমিও ভীষণ সংকটে। আপনি ধার্মিক। সত্যব্রত। ন্যায়-নীতিজ্ঞ। আপনি আমার চিন্তারই অনুগামী। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার বিজয়ই কামনা করি—আপনার সাফল্য কামনা করি। ধর্মের বিজয় আমার আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু হে মহারাজ! আমি যাদবসংঘকে উপেক্ষা করে আপনার পক্ষে যোগদান করার অধিকারী নই।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বক্তব্যে হতাশ হলেন না। বললেন, হে কেশব! তোমার সংকট—তোমার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমি উপলব্ধি না করলে কে আর করবে? তুমি আমাকে অনুভব করতে পার—আমি তোমাকে। তুমি মুক্ত মনে দ্বারকায় প্রত্যাগমন কর। সঙ্ঘের সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করব। তবে কৃষ্ণ, একটি কথা—তুমিই ধর্ম। তাই আমার বিশ্বাস, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, যুদ্ধ যদি অনিবার্য হয়—তবে তুমি নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না। কারণ ভারতভূমিতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা তোমার স্বপ্ন। তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। তুমি অস্ত্র—আমি যোদ্ধা। আমি ছাড়া তুমি সম্পূর্ণ নও—তুমি ছাড়া আমি। তোমার শুভেচ্ছা যে আমাদের ঘিরে থাকবে তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। সেই আমাদের পরম লাভ।

কৃষ্ণ মৃদু হাসলেন। বললেন, হে অগ্রজ! আপনি দূরদর্শী, বুদ্ধিমান। তবে দ্বারকায় ফিরে যাবার আগে আরও একটি কথা বলে যাই, যদি ধর্ম ও দ্রুপদ-পুরোহিত ব্যর্থ হয়, তা হবে দুর্ভাগ্য। ধার্তরাষ্ট্রদের আমি যেটুকু জানি তাতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। শান্তিদৌত্য ব্যর্থ হলে বিভিন্ন রাজ্যে দূত প্রেরণ করবেন—কারণ কৌরবেরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না। যেহেতু, আপনাদের দু'পক্ষের দাবীই প্রবল—সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজন্যেরা অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করার জন্যে, অগ্রে যে গমন করবে তাকেই সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দান করবেন। আর এরূপ ক্ষেত্রে দ্বারকায় সর্বাগ্রে দূত প্রেরণ করবেন।

এক সময় কৃষ্ণ-বলরাম-সাত্যকি প্রমুখ যাদববীরেরা দ্বারকার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। শূন্য হয়ে গেল উপপলব্য নগর।

যে মানুষ নিজে সৎ—অপরের অসততা বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে

একটু কষ্টকর হয়। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের চরিত্র জানেন। তবুও তাঁর মনে একটি ক্ষীণ আশা ছিল, দুর্যোধন হয়তো শেষপর্যন্ত মূর্খতার পরিচয় দেবে না। কিন্তু ম্লান মুখে তিনি দ্রুপদ-পুরোহিতকে রাজসভায় প্রবেশ করতে দেখে মর্মাহত হলেন। দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী যে প্রশ্নটি মনে বারবার আবর্তিত হচ্ছিল—তা যুদ্ধ না শান্তি? যুধিষ্ঠির নিজে শান্তিই কামনা করেছিলেন। শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি দুর্যোধনের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয়ের সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু দ্রুপদ-পুরোহিতের বিষণ্ণ মুখ তাঁকে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি উপস্থিত করে দিল।

ধার্তরাষ্ট্রদের মূর্খতায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যুধিষ্ঠির। কৌরবেরা যুদ্ধকে ইচ্ছাকৃত আহ্বান করছে। মহাবল বৃকোদর, অর্জুন, আর সহদেবের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হতেই তিনি শিহরিত হলেন।

[উদ্যোগ পর্বে আমরা দেখলাম, কৃষ্ণ যুদ্ধের স্বপক্ষে নন। তিনি জানেন, যুদ্ধ অবধারিত। তিনি যুধিষ্ঠিরকে অর্ধরাজ্য পরিত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা দেখলাম যে, তিনি পক্ষপাত শূন্য। কৃষ্ণের পক্ষপাত শূন্যতার এবং শুভ বুদ্ধির পরিচয় আমরা পরে আরও দেখতে পাব। তবে একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না—কৃষ্ণই ধর্ম। সুতরাং যেখানে বা যখন ধর্ম আর অধর্মের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে—কৃষ্ণ তখন স্বভাবতই আক্ষরিক অর্থে নির্লিপ্ত থাকতে পারেন নি। পারাটা তাঁর পক্ষে উচিতও হত না!]

এদিকে দুপক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগে দ্রুত চলাচল শুরু হয়ে গেল। সেনা সংগ্রহ করা আরম্ভ হল। যুধিষ্ঠির স্বয়ং অর্জুনকে দ্বারকায় পাঠালেন। সংবাদ পেয়ে দুর্যোধনও স্বয়ং দ্বারকা যাত্রা

করল। দুজনেই একই দিনে একই সময় দ্বারকায় গিয়ে উপস্থিত হল।

কৃষ্ণ তখন আপন গৃহে নিদ্রাভিভূত ছিলেন। কৃষ্ণই যাদব-সঙ্ঘের শেষ কথা। তাই অর্জুন আর দুর্যোধন কৃষ্ণের কক্ষে গিয়ে তাঁর নিদ্রাভঙ্গের জন্যে প্রতীক্ষা করা মনস্থ করল। দুর্যোধন কৃষ্ণের মস্তকের গোড়ায় একটি সুদৃশ্য আসনে উপবেশন করল। অর্জুন বিনীত এবং কৃতাঞ্জলী হয়ে কৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপবেশন করল। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হলে তিনি স্বাভাবিক ভাবে আগে অর্জুনকে এবং পরে দুর্যোধনকে দেখলেন। স্বাগত জানিয়ে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন—যদিও তিনি জানতেন, তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য।

দুর্যোধন সহাস্য বদনে বলল, হে কৃষ্ণ! আসন্ন যুদ্ধের জন্যে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আমরা এসেছি। আমি জানি যে কৌরব-পাণ্ডব উভয়ের সঙ্গেই আপনার সমান সম্পর্ক। তথাপি যেহেতু আমি আগে এসেছি—তাই আপনাকে আমাদেরই সাহায্য করতে হবে। আগে যে আসে—তাকেই সাহায্য করা ক্ষত্রিয় প্রথা। আপনি নীতিজ্ঞ, সদাচারী—সুতরাং উচিত বিবেচনা করুন।

কৃষ্ণ বললেন, হে কুরুবীর, আপনি যে আগে এসেছেন—এতে আমার কোনও সংশয় নেই। কিন্তু আমি পৃথানন্দনকে আগে দেখেছি, এই জন্যে অর্জুনকেই আমার বরণ করা উচিত। আমি দুজনকেই সাহায্য করব। সাধুজনেরা এও বলেন যে কনিষ্ঠের দাবী সর্বাগ্রে। তাই আমি অর্জুনকেই প্রথম সুযোগ দান করব। আমি স্থির করেছি, আমি স্বয়ং অস্ত্র-শস্ত্রহীন এবং অযুদ্ধমান অবস্থায় এক পক্ষে অবস্থান করব। অপর পক্ষকে দান করব এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা—যারা কৃষ্ণের মতোই যুদ্ধে নিপুণ। এখন অর্জুন বলুক, সে কী প্রার্থনা করে—সৈন্য না নিরস্ত্র-অযুদ্ধমান কৃষ্ণকে?

অর্জুন স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণকে বরণ করল। কারণ

যুধিষ্ঠিরের মতো সেও জানে যে কৃষ্ণই প্রকৃত পাণ্ডবশক্তি—তাঁর সেনা নয়। এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা তাঁর গাণ্ডীবের সামনে তৃণবৎ। মূল শক্তি হচ্ছে ধর্ম—এবং কৃষ্ণই সেই ধর্মের আধার স্বরূপ।

অপরদিকে—নিরস্ত্র-অযুদ্ধমান কৃষ্ণের পরিবর্তে এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনাই দুর্যোধনের কাছে মূল্যবান বলে বোধ হল। সে অর্জুনের মূর্খতায় উৎফুল্ল হয়ে কৃষ্ণের কাছে বিদায় নিয়ে বলরামের কাছে গেল।

[আমরা দেখলাম যে কৃষ্ণ প্রকৃতই পক্ষপাত শূন্য। কারণ দুর্যোধনও কৃষ্ণের কোনও কথার প্রতিবাদ করে নি। বরং সৈন্য লাভ ক'রে উৎফুল্লই হয়েছে। অপর দিকে কৃষ্ণ আত্মীয়-যুদ্ধে নিজেকে জড়িত করতে চান নি প্রত্যক্ষভাবে। তিনি ইচ্ছা করলে, স্বহস্তেই কৌরব পক্ষকে নিধন করে যুধিষ্ঠিরকে বিজয়ী রূপে ঘোষণা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করতে চান নি। তিনি ধর্মের প্রতিমূর্তি হিসাবে ধর্মপক্ষে অবস্থান করার কামনা করেছেন। এমন কি তাঁর মতো মহাবলের কাছে সারথ্য হীন বৃত্তি হলেও তিনি তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। কৃষ্ণের অহঙ্কার শূন্যতার এই এক প্রমাণ।

মহাবীর ভীষ্মের সঙ্গেও তাঁর এইখানে পার্থক্য। যুদ্ধ ভীষ্মও কামনা করে নি। কিন্তু যুদ্ধ যখন অনিবার্য হল তখন ভীষ্ম অযুদ্ধমান থাকার প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করতে পারেন নি।

সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় হচ্ছে, অনেকে এই কৃষ্ণকেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোক্তা বলে চিহ্নিত করেন এবং তাঁকে এক হীন কুচক্রী ষড়যন্ত্রকারী বলে চিত্রিত করেন।

যা হোক, বলরাম ধর্মাধর্ম নিয়ে কৃষ্ণের মতো তত বেশি চিন্তিত হন নি। দুর্যোধনের প্রতি তাঁর দুর্বলতা কখনও গোপনও করেন নি। উপপলব্য নগরের সভায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য

নিন্দা করেন—কিন্তু কৌরবপক্ষের শঠতার কথা উল্লেখ করেন নি। বলরামের ভাষণে সাত্যকি কি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করে এবং সেই সভায় যুদ্ধের স্বপক্ষে তার অভিমত জ্ঞাপন করে।

তবে একথা সত্য যে বলরামও এই আত্মীয়-যুদ্ধ কামনা করেন নি। ধর্মের জন্যে কৃষ্ণকে ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করতে হলেও বলরামের সে দায়দায়িত্ব ছিল না। তাই তিনি যুদ্ধে কোনও পক্ষেই যোগদান করতে অস্বীকার করলেন। দুর্যোধন বলরামের পরিবর্তে লাভ করলেন কৃতবর্মাকে। কৃষ্ণ, সাত্যকি এবং কৃতবর্মা ছাড়া আর কোনও যাদবই এই দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধে নিজেদের জড়িত করতে চাইলেন না।]

যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও যা অবশ্যম্ভাবী—তা স্বীকার করে নিতেই হবে।

দ্রুপদের পুরোহিত বিষাদময় স্বরে বললেন, হে ধর্মরাজ! আপনার বক্তব্য আমি যথাযথ ভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লিক, সোমদত্ত প্রমুখ সকলকে নিবেদন করেছি। তাঁরা সমস্যার গভীরতার কথা চিন্তা করে দুর্যোধনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, ভৎর্সনাও করেছেন প্রচুর। তাঁরা শান্তি স্থাপনের উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়। ধন আর শক্তির মদমত্ততায় এবং শকুনি ও কর্ণের প্ররোচনায় কারও সৎ উপদেশ সে গ্রহণ করে নি। বরং অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে বলেছেন, বিনা যুদ্ধে অধিকৃত ভূমি প্রত্যর্পণ করা ক্ষাত্রধর্ম নয়। ফলে সে যুদ্ধ কামনা করে।

স্বগতোক্তি করলেন যুধিষ্ঠির—কী ভীষণ মূর্খ দুর্যোধন। যুদ্ধের দ্বারা অধিকৃত ভূমি বিনা যুদ্ধে প্রত্যর্পণ করা ক্ষাত্রধর্ম না হতে পারে। কিন্তু কপট দ্যূতের দ্বারা অধিকৃত ভূমি ত্যাগ করার মধ্যে অধর্ম কোথায়? বিশেষ করে সে যখন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কী ভীষণ অসহায় বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত! পুত্রকে তিনি স্নেহ করেন ঠিক—কিন্তু পুত্রকে ধর্মপথে পরিচালিত করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কুলক্ষয়ের পাপ তিনি ধারণ করতে প্রস্তুত—কিন্তু পুত্রকে শাসন করতে অপারগ।

হঠাৎ সভায় সঞ্জয় প্রবেশ করতেই সবাই বিস্মিত হল। তবে কি সঞ্জয় কোনো শুভ বার্তা বহন করে এনেছে? মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি তাহলে বিবেক-দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব বিবেচনা করেছেন?

উৎকণ্ঠাবশত যুধিষ্ঠির আসল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেন, হে সঞ্জয়! আসন গ্রহণ কর। পিতামহ, জ্যেষ্ঠতাত, পিতৃব্য সবাই কুশলে তো?

সঞ্জয় আসন গ্রহণ করলে যুধিষ্ঠির আর তাঁর কৌতূহল প্রকাশ না করে পারলেন না।—হে সঞ্জয়! জ্যেষ্ঠতাত কি তবে পিতামহ, পিতৃব্য এবং আচার্যদের সৎ পরামর্শ গ্রহণ করেছেন? কৌরবেরা কি তবে শান্তিতে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে? দুর্যোধন কি আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রত্যর্পণ করা স্থির করেছে?

যুধিষ্ঠিরের এই আকুলতা সবাইকে আশ্চর্য করল।

স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করল সঞ্জয়। স্পষ্ট ভাষায় সে তার বক্তব্য প্রকাশ না করে ভূমিকার আশ্রয় নিল।—হে ধর্মরাজ! কৌরবসভায় সকলে মহামতি দ্রুপদ-পুরোহিতের বক্তব্যকে সমর্থন করলেও দুর্যোধন তা অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু আপনাদের কুশল সংবাদে প্রজাসাধারণ এবং শ্রদ্ধেয় জনেরা আনন্দিত হয়েছেন। দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর তাঁরা মৃতপ্রায় হয়েছিলেন।

ক্রমশ সঞ্জয় তার বক্তব্যে ফিরে গেল।—দুর্যোধনের বিশ্বাস, কৌরবপক্ষের মহাবীরেরা মুহূর্তের মধ্যে পাণ্ডবদের জয় করবে। রাধেয় আত্মগর্ব প্রকাশ করে বলেছে যে, তার সমকক্ষ যোদ্ধা পাণ্ডবপক্ষে কেউ নেই। যুদ্ধের শুরুতেই সে অর্জুনকে বধ করে

যুদ্ধ শেষ করবে। অর্জুনহীন পাণ্ডবেরা শক্তিহীন। মহারাজ দুর্যোধন অতি সহজেই নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্য ভোগ করতে পারবেন। কৌরবদের বিজয় যখন শুধুমাত্র সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তখন সন্ধির প্রয়োজন কী? শুধু তাই নয়—সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়ে তাঁরা মিত্র রাজাদের কাছে দূত পাঠানোও শুরু করে দিয়েছেন।

অধৈর্য হয়ে উঠলেন যুধিষ্ঠির। তিনি বললেন, হে সঞ্জয়! এ সব তথ্যই আমাদের জানা। তুমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কোনও বার্তা বহন করে এনেছ কি না তাই বল।

সঞ্জয় একটু নিষ্প্রভ হয়ে উঠে বলল, হে ধর্মরাজ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলে পাঠিয়েছেন—যুদ্ধ গুরুতর অধর্ম। তোমরাও সেই অধর্মে প্রবৃত্ত হতে চলেছ। ধর্মত যা করণীয় আপনি তাই-ই করুন।

অস্বাভাবিক হলেও যুধিষ্ঠিরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি বললেন, হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণের প্রার্থনীয় যে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি রয়েছে বা স্বর্গ বা ব্রহ্মলোকও আমি অধর্মত লাভ করার কামনা করি না। এই সভায় কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন। কৃষ্ণ কৌরব-পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতাকাঙ্ক্ষী। এখন কৃষ্ণই বলুক আমার কী কর্তব্য—সন্ধির পথ ত্যাগ করে নিন্দনীয় হব, না যুদ্ধ ত্যাগ করে আত্মধর্মে পতিত হব? অরাতিদমন কৃষ্ণই পাণ্ডবদের বুদ্ধি, বল এবং ভরসাস্থল। কৃষ্ণকে অনুসরণকারী সকল রাজন্যই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে থাকেন। সেই মহাত্মা কেশবই আমাদের পথ নির্দেশ করুক। আমিও সর্বান্তঃকরণে তা অনুসরণ করব।

কৃষ্ণ তখন বললেন, হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের হিত, অবিনাশিতা ও সমৃদ্ধি এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় কামনা করে থাকি। আমি কামনা করি—কৌরব-পাণ্ডবেরা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হোক। এ ছাড়া আমার অন্য কোনও কামনা নেই। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সর্বদাই সন্ধি কামনা করেন। কিন্তু

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রেরা ভীষণ অর্থলোভী। সুতরাং সন্ধি স্থাপন হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। হে সঞ্জয়, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং আমি কখনও ধর্মপথ থেকে বিচলিত হই না। এসব জানা সত্ত্বেও তুমি কি করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অধার্মিক বলে নির্দেশ করলে ?

এরপর কৃষ্ণ ধর্মের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করে বললেন, শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হয়ে বেদ অধ্যয়নে রত থেকে জীবন যাপন করবে—এটাই শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ। তবু ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, কর্মের মাধ্যমে বা কেউ কেউ মনে করেন যে, কর্ম ত্যাগ করে শুধুমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ সম্ভব। কিন্তু আহার না করলে যেমন আহারের তৃপ্তি লাভ হয় না, সেরকম কর্ম না করে শুধুমাত্র বেদজ্ঞানের সাহায্যে মোক্ষ লাভ করা যায় না। পিপাসার্ত ব্যক্তির জলপানেই পিপাসার শান্তি লাভ হয়—তাই ইহকালে যে সব কর্মের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়—তারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। কর্মই সর্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করে থাকে—তার সমস্ত কর্মই নিষ্ফল। দেবগণ কর্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হয়েছেন। সমীরণ কর্মবলে সতত সঞ্চরণশীল। এই প্রকার, অমিত বলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করার জন্যে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ভগবান বৃহস্পতি ইন্দ্রিয়-নিরোধ দ্বারা ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এইজন্যে তিনি দেবগণের আচার্য পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্ববসু ও নক্ষত্রগণ কর্মপ্রভাবেই বিরাজিত রয়েছেন।

কৃষ্ণই ধর্মের সঞ্চার পরিবর্তন করে তাকে কর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যা অনুষ্ঠেয়, যা কর্তব্য—তাই কর্ম—তাই ধর্ম।

এরপর কৃষ্ণ তীক্ষ্ন ভাষায় সঞ্জয়কে আক্রমণ করলেন।—হে সঞ্জয়! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি সকলের ধর্ম পরিজ্ঞাত

হয়েও তুমি কৌরবদের মঙ্গল করার বাসনায় পাণ্ডবদের নিন্দা করছ কোন উদ্দেশ্যে? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং রথচালনে নিপুণ। এখন যদি পাণ্ডবেরা কৌরবদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষী না হয়ে—ভীমসেনকে শান্ত করে রাজ্য লাভের কোনও উপায় নির্ধারণ করতে সমর্থ হন তাহলেই ধর্মরক্ষা ও পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। কিংবা এঁরা যদি ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে গিয়ে মৃত্যুকেও বরণ করেন—তবে তাও হবে বাঞ্ছনীয়। এখন তুমিই বল, ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ না করলে ধর্মরক্ষা করা হয়—নাকি যুদ্ধ করলে? যা তুমি উত্তম বলে বিবেচনা করবে, আমি ধর্মরাজকে সেই পথই গ্রহণ করতে বলব।

সঞ্জয়ের মুখে ধর্মের কথা শুনে বিরক্ত হয়ে স্পষ্টবক্তা কৃষ্ণ তাকে আরও তিরস্কার করলেন। তিনি বললেন, তুমি এখন ধর্ম-রাজকে ধর্মাধর্মের জ্ঞান দান করতে চাইছ! কিন্তু যখন দুঃশাসন সভার মধ্যে দ্রৌপদীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করে তখন তো দুঃশাসনকে ধর্মাধর্ম জ্ঞান দান কর নি। এখন যুদ্ধ সম্পর্কে ধর্মাধর্ম জ্ঞান দান করে লাভ কী? যাহোক, তবে আমি অযুদ্ধমান থাকলেও আমি কখনই কামনা করব না যে, অসংখ্য জীবনক্ষয় ঘটুক। তাই আমি উভয়পক্ষের হিত সাধন করার জন্যে স্বয়ং হস্তিনা নগরে গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করব। চেষ্টা করব, যাতে পাণ্ডবদেরও কোনও ক্ষতি না হয়, অথচ কৌরবরাও সম্মত হয়। এটা যদি করতে পারি তবেই সত্যিকারের উভয়পক্ষের হিত সাধন করা হবে এবং কৌরবেরাও মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হতে পারবে। নচেৎ ক্রুদ্ধ ভীমসেন আর অর্জুনকে প্রতিরোধ করে এমন শক্তি ত্রিজগতে নেই।

[এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তথাকথিত কুচক্রী কৃষ্ণ অসংখ্য মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্যে এবং কৌরবদেরও রক্ষা করার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শান্তিদূতের ভূমিকা গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ

করলেন—যদিও তিনি জানতেন যে, শান্তি সম্ভব নয়। ব্যর্থতার গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করবে। তবু তিনি শুভ কার্য করার জন্যে কোনও সম্ভাব্য অপমান গ্রাহ্য করলেন না।]

কৃষ্ণের শান্তি দৌত্য

কৃষ্ণ হস্তিনায় যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। সংশয়ে দীর্ণ যুধিষ্ঠির সেদিন কৃষ্ণের কাছে একান্তে এসে উপবেশন করলেন। যুধিষ্ঠিরের শুষ্ক মুখ দেখে কৃষ্ণ সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, হে অগ্রজ, কোন সংশয়ে আপনি দীর্ণ হচ্ছেন ?

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কেশব ! আমি শান্তিপ্রার্থী। কুরুকুল বিনাশের উত্তর দায়িত্ব আমি নিজে বহন করতে প্রস্তুত নই। কিন্তু তোমার মতো আমিও জানি যে, তোমার এই দৌত্যকার্য ব্যর্থ হবে। অসংখ্য জীবনক্ষয়ের লগ্ন আসন্ন। যেহেতু ধর্মরূপী তুমি আমাদের পক্ষে, তাই সর্বশেষ বিজয়ও আমরা লাভ করব ঠিকই—কিন্তু কিসের বিনিময়ে কেশব ? তাছাড়া তুমিও অপমানিত হবে। অসংখ্য জীবনও ধ্বংস হবে। এতে কী লাভ কৃষ্ণ ? এর থেকে বনবাসই কি আমাদের পক্ষে শ্রেয় নয় ?

কৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ ! আপনি যা আশংকা করছেন—তা হয়তো সত্যি। কিন্তু এ ছাড়া পথও তো কিছু নেই। আমাদের সান্ত্বনা থাকবে যে শান্তির জন্যে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। আর বনবাসের কথা বলছেন ? তা উচিত নয় মহারাজ। ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ভিক্ষা-আচরণ নিষিদ্ধ। দীনতা প্রকাশ করাও নিন্দনীয়। নিজের প্রাপ্য ভূখণ্ডের অংশ পরিত্যাগ করাও এক্ষেত্রে শাস্ত্রসম্মত নয়। এ ক্ষত্রিয়ধর্ম নয়। আপনি ধর্মজ্ঞ। আপনাকে ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করতেই হবে। অতএব শত্রুদের

বিনাশ করে স্বীয় ধর্ম পালন করার জন্যে আপনি প্রস্তুত হন। যদি কৌরবপক্ষের সত্যই শুভ বুদ্ধির উদয় হয়—সে তো উত্তম কথা।

একটি কথা সবসময়ে স্মরণে রাখা প্রয়োজন—ভূমি কর্ষণ করে বীজ বপন করাই যথেষ্ট নয়। বর্ষারও প্রয়োজন। তবেই ফসল লাভ করা সম্ভব। সেইরকম দৈবের সঙ্গে পুরুষকার যদি যুক্ত না হয় তবে ফললাভ সম্ভব হয় না। এ যুদ্ধ আপনার যুদ্ধ। আপনাকেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। আপনি প্রস্তুত হন মহারাজ। সামান্যতম শর্তেও যদি আমরা যুদ্ধ পরিহার করতে পারি তবে নিশ্চয় তা করব। সমগ্র ভূখণ্ডের পরিবর্তে সামান্য পঞ্চগ্রামও দান করতে যদি দুর্যোধন সম্মত হয়—তবে তাকেই আমরা স্বাগত জানাব।

কৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমনের প্রস্তুতি পাণ্ডব শিবিরে নিরুৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধোন্মাদ ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারা ধর্মপাশে বদ্ধ। পিতাসম যুধিষ্ঠির এবং যদুনন্দন কৃষ্ণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু অন্তর্দাহে দাহিত হচ্ছিল চারুলোচনা দ্রৌপদী। শান্তির উদ্যোগ তার মধ্যে যেন জ্বালার সৃষ্টি করছিল। সে কৃষ্ণকে আক্রমণ করে বসল। পাঞ্চালী বলল, হে সখা, তুমি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, ধর্মজ্ঞ। তবু তোমাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করলেও একই পাপ হয়। ধার্তরাষ্ট্রেরা বধযোগ্য। সুতরাং তাদের বধ করাই ধর্ম।

কৃষ্ণনয়না দ্রুপদনন্দিনী এ কথা শ্রবণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন ভাবে কৃষ্ণকে আবার বলল, হে জনার্দন, দুরাত্মা দুঃশাসন আমার কেশ আকর্ষণ করেছিল। তুমি যখন সন্ধির কথা উচ্চারণ করবে তখন আমার এই মুক্ত কেশের কথা স্মরণ করবে। মধ্যম ও তৃতীয় পাণ্ডব আমার অপমান বিস্মৃত হয়ে শান্তির স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত

করেছে—যাক তাতে আমার কোনও ক্ষতি নেই। কারণ, আমার বৃদ্ধ পিতা—তাঁর মহারথ পুত্রদের নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। আমার পঞ্চ পরাক্রান্ত পুত্র—পুত্র অভিমন্যুর নেতৃত্বে সংগ্রাম করবে এবং শত্রুদের বধ করবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের কৃষ্ণ-বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপাতিত এবং তাকে নিহত অবস্থায় না দর্শন করলে আমার শান্তি কোথায়? আমি আজ দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরেরও অধিক কাল হৃদয়ে জ্বালা ধারণ করে প্রতীক্ষায় রয়েছি। তবুও এখনও সেই জ্বালা উপশমের কোনও উপায় দেখছি না। আজ আবার ধর্মপথাবলম্বী মধ্যম পাণ্ডবের শান্তিবাক্যে আমার সেই হৃদয়জ্বালা সহস্র গুণ বর্ধিত হয়েছে। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।

নিবিড় নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা একথা বলে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কম্পিত কলেবরে ক্রন্দন করতে থাকল। অশ্রুজলে তার স্তন-যুগল অভিষিক্ত হতে থাকল। তখন মহাবাহু কৃষ্ণ তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, হে পাঞ্চালী! তুমি শীঘ্রই কুরুমহিলাদেরও রোদন করতে দেখবে। তুমি যেমন ক্রন্দন করছ, কৌরবনারীরাও তাদের স্বামী-জ্ঞাতি-বান্ধবগণ নিহত হলে ওইরকমই ক্রন্দন করবে। ধার্তরাষ্ট্রগণ কালপ্রেরিতের মতো আমার কথার অনাদর করলে অতি শীঘ্রই তাদের মৃতদেহ রণক্ষেত্রে শ্বাপদদের ভক্ষ্যে পরিণত হবে। যদি হিমবাহ গতিশীল হয়ে ওঠে, মেদিনী বিদীর্ণ হয়, আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসহ পতিত হয়—তবুও আমার ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা হবে না। হে পাঞ্চালী, তুমি শান্ত হও। ধৈর্য ধারণ কর। অচিরকালমধ্যেই তুমি তোমার স্বামীদের পূর্ণরাজ্য লাভ করতে দেখবে।

[কৃষ্ণকে ভুল বোঝার সুযোগ বোধহয় এখানেই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বিচার করে দেখলেই দেখা যাবে যে, এই উক্তি কোনও রক্ত পিপাসু ব্যক্তির নয় বা কোনও ক্রুদ্ধ ব্যক্তিরও নয়। এ এক

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার উক্তি মাত্র। সন্ধি স্থাপন হবে না জেনেও তিনি সন্ধি স্থাপন করবার জন্যে কৌরবসভায় গমন করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। কারণ তিনি কর্মে বিশ্বাসী। যা অনুষ্ঠেয় কর্ম—ফলাফলের আশা না করেই তিনি তা করতে বদ্ধপরিকর। সিদ্ধি-অসিদ্ধি তিনি তুল্য জ্ঞান করেন।]

কৃষ্ণের যাত্রাকালেও তাঁর মধ্যে দেবসুলভ কোনও আচরণ দেখা যায় না। তিনি যে এক পরিপূর্ণ মানুষ—তা তাঁর যাত্রার কালেই লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতে বলা হয়েছে, কার্তিক মাসের রেবতী নক্ষত্রে মৈত্র মুহূর্তে কৌরব সভায় গমন করার বাসনায় তিনি তাঁর বিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে বসনভূষণ ধারণ করলেন। সূর্য আর বহ্নির উপাসনা করলেন। বৃষলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও শুভ বস্তুসকল সন্দর্শন করে যাত্রা করলেন। কালের রীতিনীতিকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য সম্মান তিনি সব সময়েই দান করতেন।

কৃষ্ণ কিছুদূর গমন করার পর পথের উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কয়েকজন মহর্ষিকে দর্শন করলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে ভীষণ ব্যাগ্রতা সহকারে রথ থেকে অবতরণ করে অভিবাদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহর্ষিগণ! সকলের কুশল তো? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তো? আপনারা কোথায় গমন করছেন? আমি আপনাদের কি সেবা করতে পারি?

তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দেবর্ষি, কেউ কেউ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেউ কেউ রাজর্ষি এবং কেউ কেউ তপস্বী। আমরা অনেকবার দেবাসুরের সমাগম দর্শন করেছি। এখন সব ক্ষত্রিয়, সভাসদ, ভূপতি এবং আপনাকে দেখার বাসনায় গমন করছি।

আমরা কৌরবসভামধ্যে আপনার বাণী শ্রবণ করার অভিলাষী হয়েছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, প্রমুখ মহাত্মাগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য ব্যক্ত করবেন—আমরা সেইসব বাক্য শ্রবণ করার জন্যে অতিমাত্রায় কৌতূহলী হয়েছি। এখন আপনি সত্বর কুরুরাজ্যে গমন করুন। সেখানে আমরা আপনাকে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখে পুনরায় বাক্যালাপ করব।

হস্তিনা বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ সাধারণ প্রজার কাছেও পূজ্য ছিলেন। মহাভারতের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই—দেবকীনন্দন সর্বশস্য পরিপূর্ণ, রম্যভবন পূর্ণ জনপদ ও রাজ্য অতিক্রম করলেন। পুরবাসীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করার ইচ্ছায় পথিমধ্যে অপেক্ষা করতে থাকল। বাসুদেব যথাকালে উপস্থিত হলে তারা বিধান অনুযায়ী তাঁর পূজো করতে থাকল।

ক্রমে সূর্য অস্তাচলে গেলে কৃষ্ণ বৃকস্থলে রথ থেকে অবতরণ করে পটমণ্ডপ স্থাপন করতে বললেন। রাত্রে তিনি বৃকস্থলেই অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্রামের অভিজাত ব্রাহ্মণেরা আগমন করে কৃষ্ণকে পূজো এবং আশীর্বাদ করে—নিজের নিজের গৃহে কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানালেন। সৌজন্যবশত কৃষ্ণ তাঁদের আমন্ত্রণ রক্ষা করলেন এবং রাত্রিকালে আপন পটমণ্ডপে প্রত্যাগমন করে রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

[এখানে কৃষ্ণ দেবতা হিসাবে পূজো লাভ করেন নি। পূজো লাভ করেছেন আদর্শ মানব হিসাবে এবং তিনি সকলের সঙ্গেই আদর্শ সৌজন্যমূলক ব্যবহারও করেছেন।]

কৃষ্ণ আসছেন শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে উদ্দেশ্য-মূলক ভাবে বড় বেশি আয়োজন করলেন। নানান রত্নখচিত

সভাগৃহ নির্মাণ করালেন। উপহার-উপঢৌকন দেবার জন্যে রথ, অশ্ব. দাস, দাসী, মেষ, মণিমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করলেন।

স্পষ্টবক্তা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, উপহার দানে কৃষ্ণকে প্রলোভিত করতে পারবেন না, মহারাজ। তিনি যে কার্যের জন্যে আগমন করছেন—একমাত্র তা সম্পাদিত হলেই তিনি প্রীত হবেন।

দুর্যোধন ধূর্ত এবং সরলও বটে। সে বলল, কৃষ্ণকে অত সমাদর করে সত্যিই কী লাভ ? লোকে বলবে, আমরা কৃষ্ণের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর তোষামোদ করছি। তার চেয়ে বরং কৃষ্ণকে বন্দী করে রাখাটাই যথার্থ কর্ম হবে। কৃষ্ণহীন পাণ্ডবেরা অসহায় এবং দুর্বল।

দুর্যোধনের পরিকল্পনার কথা শ্রবণ করে ধৃতরাষ্ট্র তাকে তিরস্কার করতে বাধ্য হলেন। বললেন, কৃষ্ণ—দূত। কৃষ্ণপ্রেমী ভীষ্মও দুর্যোধনকে কটূক্তি করলেন। ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

অতঃপর কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসার জন্যে দুর্যোধন ব্যতীত অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং অন্যান্য বহুতর পুরবাসীর সঙ্গে নানাবিধ যানে আরোহণ করে বা পদাতিক রূপে অগ্রসর হলেন। পথে কৃষ্ণ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে হস্তিনা নগরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন।

কৃষ্ণের সম্মানের জন্যে হস্তিনা নগরকে এবং রাজপথগুলিকেও নানাবিধ রত্নে সুশোভিত করা হয়েছিল। কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে দেখার জন্যে আবালবৃদ্ধবনিতা গৃহ ত্যাগ করে পথে এসে সারবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিলারা বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে তিলমাত্র স্থান ছিল না। এক সময়ে কৃষ্ণ পাণ্ডুর বর্ণ অট্টালিকায় পরিশোভিত ধৃতরাষ্ট্র-ভবনে গমন করলেন।

ভীষ্ম এবং দ্রোণের সঙ্গে কৃষ্ণকে আসতে দেখে ধৃতরাষ্ট্র আসন

ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। দেখাদেখি কৃপ, সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লিকও কৃষ্ণকে সম্মান দেখাবার জন্যে গাত্রোত্থান করলেন।

ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ প্রীতি সম্ভাষণ জানালেন। তারপর তিনি ধর্মানুসারে তাঁদের পূজা করে বয়স অনুযায়ী অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। উজ্জ্বল ও পরিমার্জিত একটি আসন কৃষ্ণের জন্যে সেখানে রক্ষিত হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে সেই আসনটি গ্রহণ করার অনুরোধ জানালেন।

সৎকারপর্ব শেষ হলে কৃষ্ণ কৌরবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে কিছু সময় সম্বন্ধানুরূপ আলাপ পরিহাসে ব্যয় করলেন। তারপর এক সময় ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে বিদুর-ভবনে গমন করলেন।

বিদুর সর্বপ্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করে কৃষ্ণকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর তিনি পাণ্ডবদের মঙ্গল প্রশ্ন করলেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবপ্রিয় ধর্মাত্মা বিদুরকে বিস্তারিত বিবরণ দান করলেন।

বিদুরের সঙ্গে কিছু সময় ব্যয় করার পর কৃষ্ণ পিতৃষ্বসা কুন্তীর কাছে উপস্থিত হলেন। কুন্তী কৃষ্ণকে বহুকাল পর দর্শন করলেন। অতঃপর পুত্রদের কথা স্মরণ হতে কৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করে অশ্রু বিসর্জন করা শুরু করলেন।

কৃষ্ণ উপবেশন করলে কুন্তী এক এক করে পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপদীর সংবাদ জানাবার জন্যে কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন। পাণ্ডবদের দ্যুতসভার লাঞ্ছনা, অপমান, বনবাসের দুঃখকষ্ট এবং চতুর্দশ বৎসরের অদর্শনের জন্যে অশ্রুপাত করে কুন্তী বললেন, হে মাধব! আজ চতুর্দশ বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলল। আমি আমার প্রিয় পুত্রদের এবং কল্যাণী দ্রৌপদীকে দর্শন করি নি, তাই আমার এই দুঃখবোধ। মানুষ মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করে। বাস্তবিকপক্ষে তারা আমার কাছে মৃত—আমিও তাদের কাছে। তুমি ধর্মরাজ

যুধিষ্ঠিরকে বলবে যে, গুরুতরভাবে ধর্ম নাশ হচ্ছে। সে যেন স্বধর্মভ্রষ্ট না হয়।

যে নারী পরের আশ্রয়ে থেকে জীবন ধারণ করে—তাকে আমি ধিক্কার দিই। কারণ অনুনয়লব্ধ জীবিকা বা জীবন না থাকাই ভাল। তুমি অর্জুন এবং সবসময়ে উৎসাহী ভীমসেনকে বলবে যে, ক্ষত্রিয় রমণী যে জন্যে পুত্র প্রসব করেন সেই সময় আগতপ্রায়।

তুমি আমার পুত্রদের বলবে যে, তারা যদি রাজ্যলাভের জন্যে অনুনয় বিনয় করে তাহলে আমি চিরকালের জন্যে তাদের ত্যাগ করব। কারণ বিক্রমের দ্বারা লব্ধবস্তু সকল ক্ষত্রিয় ধর্মাবলম্বী লোকের মনকে সর্বদাই আনন্দিত করে।

কুন্তী আবার বললেন, কৃষ্ণ, তুমি অর্জুনকে বলবে যে, সে যেন দ্রৌপদীর প্রদর্শিত পথেই গমন করে!

পুত্রগণের রাজ্য হরণ, দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয়, কিংবা নির্বাসনও আমার কাছে তত দুঃখজনক নয়। কিন্তু সহনীয় চরিত্রা ও উত্তমাঙ্গনা দ্রৌপদী একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান রত অবস্থায় সভায় আনীত হয়ে—নিষ্ঠুর সব বাক্য শ্রবণ করেছিল। এর থেকে অধিক দুঃখ আর আমার কী হতে পারে? বরারোহা, রজস্বলা ও সর্বদা ক্ষত্রিয় ধর্ম নিরতা দ্রৌপদী তখন সহায়শালিনী হয়েও কোনও সহায় প্রাপ্ত হল না। হে মধুসূদন, পুত্রগণের সঙ্গে তুমি, বলরাম এবং মহারথ প্রদ্যুম্ন আমার সহায় রয়েছ—দুর্ধর্ষ ভীম আর অর্জুনও জীবিত, তবু আমি দুঃখ ভোগ করছি।

কৃষ্ণ তখন কুন্তীকে সান্ত্বনা দান করে বললেন, হে পিতৃষ্বসা, আপনার দুঃখ অনুভব করার কিছু নেই। আপনি বীরসন্তান-প্রসবিনী। পাণ্ডবেরা নিদ্রা ও তন্দ্রা, ক্রোধ ও হর্ষ, ক্ষুধা ও পিপাসা এবং হিম ও আতপ জয় করে বীরের সুখে নিরত আছেন। দ্রৌপদীর সঙ্গে আপনার পুত্রেরাও আপনাকে প্রণাম

নিবেদন করে আপনার কুশল প্রশ্ন করেছেন। আপনি সত্বরই পাণ্ডবদের নীরোগ, সর্ব বিষয়ে কৃতকার্য, হত শত্রু, রাজলক্ষ্মীবৃত এবং সমস্ত জগতের অধীশ্বর রূপে দেখতে পাবেন।

কৃষ্ণের কথায় কুন্তী আশ্বস্ত হয়ে বললেন, হে প্রিয় কৃষ্ণ, পাণ্ডবদের পক্ষে যা হিতকর হবে—যা তুমি মঙ্গলকর বলে মনে করবে, ধর্মের হানি বা ছল না করে তুমি তাই করবে। হে কেশব, তোমার সত্যপরায়ণতা এবং বংশমর্যাদা আমার অবিদিত নয়। কার্যের ব্যবস্থা, মিত্রের কার্য, বুদ্ধি ও বিক্রমের বিষয়ে তোমার প্রভাব আমি জানি। তোমার উপাসনাই আমাদের বংশের ধর্ম, তুমিই সত্য এবং মহাতপস্যা। সুতরাং তুমি যা বলবে তাই সত্য হবে।

অতঃপর কৃষ্ণ কুন্তীর অনুমতি নিয়ে দুর্যোধনের গৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

দুর্যোধন নিজ ভবনে দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, অজস্র রাজগণ এবং অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অবস্থান করছিল। কৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁর সম্মানের জন্যে সে স-অমাত্য গাত্রোত্থান করল। দুর্যোধন এবং অন্যান্য মন্ত্রী ও রাজগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণ তাঁরই জন্যে রক্ষিত একটি স্বর্ণময়-সুদৃশ্য আসনে উপবেশন করলেন।

এক সময়ে দুর্যোধন কৃষ্ণকে ভোজন করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু অপ্রভাবিত কৃষ্ণ তা অস্বীকার করলেন।

বিস্মিত দুর্যোধন কৃষ্ণকে বলল, আপনার জন্যে খাদ্য, পেয়, বস্ত্র এবং শয্যা—সবকিছুরই আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু আপনি কেন অস্বীকার করলেন? আপনি তো উভয় পক্ষের আত্মীয়—উভয় পক্ষের হিতের জন্যই হস্তিনায় আগমন করেছেন। তবে?

আপন কর্ম সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহাবাহু কৃষ্ণ জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, হে দুর্যোধন! দূতেরা কৃতকার্য হবার পরই ভোজন বা পূজা গ্রহণ করে। সুতরাং আমার কর্মে কৃতকার্য হওয়ার পরই আপনি অমাত্যদের সঙ্গে আমাকে ভোজনে আহ্বান করবেন—তার পূর্বে নয়।

দুর্যোধন কুটিল স্বরে বলল, হে অরাতিদমন কৃষ্ণ! আপনি কৃতকার্য হোন বা না হোন, আমরা আপনাকে পূজা করার চেষ্টা করছি—অথচ আপনি আমাদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন। আপনার সঙ্গে আমাদের তো কোনো শত্রুতা বা কলহ নেই। তবে কেন আমাদের নিরাশ করছেন?

অতঃপর কৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, লোভবশত আমি কখনও ধর্ম পরিত্যাগ করি না। শাস্ত্রে বলে, সম্প্রীতি থাকলে তবেই অপরের অন্ন গ্রহণ করবে। আর বিপদকালেও অপরের অন্ন গ্রহণ করতে পার। কিন্তু রাজা, আপনি আমাদের উপর সম্প্রীত নন কিংবা আমি বিপদাপন্নও নই। শত্রুর অন্ন গ্রহণ করবে না বা তাকে ভোজনও করাবে না। আমি এখন পাণ্ডবপক্ষ—আপনার শত্রুপক্ষ। পাণ্ডবেরা আমার প্রাণস্বরূপ। সুতরাং আপনি উপযুক্ত কারণ ব্যাতিরেকেই পাণ্ডবদের ওপর বিদ্বেষ পোষণ করেছেন। অথচ তাঁরা জন্মাবধি ধর্মপথেই রয়েছেন। যে ব্যক্তি পাণ্ডবদের শত্রু—সে আমারও শত্রু। আমাকে ধর্মাচারী পাণ্ডবদের সঙ্গে অভিন্ন জ্ঞান করবেন। যে ব্যক্তি মোহ বা লোভ অনুসারে শুভ গুণসম্পন্ন জ্ঞাতিদেরও বিদ্বেষ করে সেই অসংযতচিত্ত ও অতি ক্রোধসম্পন্ন ব্যক্তি দীর্ঘকাল লক্ষ্মীশ্রী যুক্ত থাকে না। যা হোক, আপনার এই অন্ন উদ্দেশ্যমূলক। তা আমি গ্রহণ করতে অপারগ। এখন আমাকে অনুমতি দান করুন—আমি বিদুর-ভবনে গমন করব।

কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহ থেকে নির্গত হয়ে বিদুর-ভবনে উপস্থিত

হলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাল্হিক ও অন্যান্য কৌরবেরা বিদুর-ভবনে কৃষ্ণের কাছে আগমন করলেন। তাঁরাও সেই একই কথা বললেন —হে বৃষ্ণিনন্দন আপনার অবস্থানের জন্যে আমরা রত্নখচিত বহু গৃহের আয়োজন করেছি। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন।

কৃষ্ণ বিনীতভাবে সেই কৌরবপ্রধানদের বললেন, হে শ্রদ্ধেয়গণ! আপনাদের আগমনেই আমার পূজা—অভ্যর্থনা যথাযথভাবে সাঙ্গ হয়েছে। আমি বিদুর-ভবনেই অবস্থান করার কামনা করি।

কৌরবপ্রধানেরা নিরাশ চিত্তে প্রত্যাগমন করলে বিদুর যথাবিধি কৃষ্ণের সৎকার করলেন। কৃষ্ণ প্রীত হয়ে তাঁর অনুচরবর্গের সঙ্গে বিদুর-ভবনেই আহার্য গ্রহণ করলেন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

রাত্রে বিশ্রামের সময় বিদুর কৃষ্ণকে বললেন, হে জনার্দন! আপনার হস্তিনা নগরে আগমন করাটা উচিত হয় নি। কারণ দুর্যোধন ক্ষুদ্রচেতা, ক্রোধী এবং ধর্মলঙ্ঘনকারী। আপনি তাকে সৎ উপদেশ প্রদান করলেও সে তা গ্রহণ করবে না। আসলে সে চিন্তা করে, যে পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ অবস্থান করছে সে পক্ষের বিজয় নিশ্চিত। সুতরাং সন্ধির প্রয়োজনটা কোথায়? ধার্তরাষ্ট্রেরা প্রতিজ্ঞাই করেছে যে, ভ্রাতৃ-সৌহার্দকামী ও শান্তির জন্যে বিশেষ যত্নশীল কৃষ্ণকে অগ্রাহ্য করেই তারা পাণ্ডবদের বিমুখ করবে। তাই আপনার সমস্ত উপদেশই নিষ্ফল হবে।

পাপাত্মা ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে আপনার উপস্থিতি আমার অভিপ্রেত নয়।

কৃষ্ণ বললেন, শক্তি অনুসারে ধর্মকার্য করার চেষ্টা করেও যদি কেউ ব্যর্থ হয় তবু সে পুণ্য লাভ করে। আমি অকপটে কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ তথা পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করব। যদি তারা শান্তি স্বীকার না করে তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আমি শান্তির স্বপক্ষে সর্বপ্রকারে প্রযত্ন করব। নচেৎ, অধার্মিক ও মূর্খ

শত্রুরা বলবে যে কৃষ্ণ সমর্থ হয়েও পরস্পর ক্রুদ্ধ কৌরব ও পাণ্ডবগণকে নিবারণ করল না। আমি শত্রুদের সেই সুযোগদানে ইচ্ছুক নই।

মনোগ্রাহী আলোচনায় কৃষ্ণ আর বিদুর ব্যয়িত করলেন রাত। সকালে নিত্যকর্ম সমাধান করে কৌরবসভাগৃহে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

দুর্যোধন ও সুবলনন্দন শকুনি এসে উপস্থিত হল। তারা কৃষ্ণকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখেরা সভায় গমন করেছেন এবং আপনার আগমন প্রতীক্ষা করছেন।

দারুক যথাসময়ে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামধারী চতুরশ্ব সম্বলিত গরুড়ধ্বজ রথ আনয়ন করলে কৃষ্ণ তাতে আরোহণ করলেন। বিদুর অন্য একটি রথে আরোহণ করে কৃষ্ণের পশ্চাদগামী হলেন। অন্য আরও একটি রথে পশ্চাতে অবস্থান করল দুর্যোধন ও শকুনি। তাদের সকলের পশ্চাতে গমন করতে থাকল সাত্যকি, কৃতবর্মা ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দের রথ এবং অশ্ব।

নগরবাসীরা কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্যে পথে দণ্ডায়মান হল।

সভাদ্বারে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করে সাত্যকি এবং বিদুরের হস্ত ধারণ করে সভাগৃহে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো প্রবিষ্ট হলেন। দুর্যোধন ও কর্ণ কৃষ্ণের সম্মুখে এবং কৃতবর্মা ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা কৃষ্ণের পশ্চাতে রইলেন।

কৃষ্ণকে আগমন করতে দেখে প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ সকলেই গাত্রোত্থান করে কৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। কৃষ্ণ তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট একটি উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করে ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য রাজগণকে বয়স অনুযায়ী সম্ভাষণ করলেন।

নারদ, জামদগ্ন্য প্রমুখ ঋষিরাও সভায় উপস্থিত হলেন। সেই ঋষিরা তাঁদের উপযুক্ত আসন গ্রহণ করলে অন্যান্য সকলে উপবেশন

করলেন।

সভাগৃহে নীল অতসী পুষ্পের মতো নীলবর্ণ কৃষ্ণ পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে স্বর্ণের ওপর সংস্থাপিত ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় শোভা পেতে থাকলেন।

সভায় সূচীভেদ্য নীরবতা বিরাজ করছিল। একসময় সেই নীরবতা ভঙ্গ করে জলদগম্ভীর অথচ সুমিষ্ট স্বরে কৃষ্ণ বললেন, হে ভরতনন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! যাতে বীরগণের বিনাশ ব্যতীত কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়—তার জন্যেই আমার আগমন। শাস্ত্রজ্ঞাত, সদাচারযুক্ত ও সর্বগুণসম্পন্ন এই বংশই এখন সকল বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুঃস্থের প্রতি কৃপা, শরণাগতের প্রতি দয়া, শোকার্ত প্রভৃতির প্রতি করুণা, অনিষ্ঠুরতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য —এই গুণগুলিই কুরুবংশে রয়েছে। এইরকম একটি কুল বিদ্যমান থাকতে—বিশেষত আপনার উপস্থিতির জন্যে কোনও রকম অসঙ্গত কার্য হওয়া উচিত নয়।

হে কুরুনন্দন! অশিষ্ট, মর্যাদাশূন্য এবং লোভী দুর্যোধন প্রমুখ আপনার পুত্রেরা ধর্ম ও অর্থকে উপেক্ষা করে চলেছে। হে মহারাজ, কৌরবগণের মধ্যে থেকেই এই বিপদ উৎপন্ন হয়েছে। আপনি যদি তা উপেক্ষা করেন, তবে ওই বিপদ সমস্ত পৃথিবীকেই ধ্বংস করবে। অথচ আপনি ইচ্ছা করলেই তা নিবৃত্ত করতে পারেন। হে কুরুনন্দন, শান্তি স্থাপন করাটা আপনার আর আমার অধীন। আপনি কৌরবগণকে সৎ পথে পরিচালিত করুন—আমি পাণ্ডবদের। আপনি সন্ধি করলে—পাণ্ডবেরা আপনারই সেবায় অবস্থান করবে। পাণ্ডবেরা আপনার সহায় হলে দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে সমর্থ হবেন না। যে পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কলিঙ্গরাজ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব থাকবেন—সেই পক্ষের বিরুদ্ধে কোন

উন্মাদ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার সাহস করবে ? হে মহারাজ ! পূর্বের মতো আজও আপনি পাণ্ডবদের সম্মুখে রেখে সুখে সমগ্র পৃথিবী ভোগ করতে পারবেন।

অপরপক্ষে যুদ্ধ হচ্ছে মহামারী। তার মধ্যে সার্থকতা কোথায় ? যুদ্ধে পাণ্ডবেরা বা কৌরবেরা নিহত হলে আপনি কি কোনও সুখ লাভ করতে পারবেন ? পৃথিবীর সমস্ত রাজন্যেরা আজ যুদ্ধের জন্যে সমবেত হয়েছেন। আপনি এদের রক্ষা করুন।

পাণ্ডবেরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন, আপনার আদেশেই তাঁরা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বর্ষ অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত করেছেন। আপনি তাঁদের জ্যেষ্ঠতাত—পিতৃতুল্য। তাঁরা তাঁদের শপথ পালন করেছেন। আপনিও নিশ্চয় এখন আপনার শপথ পালন করবেন। পাণ্ডবেরা যদি বিপথগামী হয়—তাহলে পিতা হিসাবে তাদের সৎ পথে রক্ষা করা আপনারই কর্তব্য। তাছাড়া, এই সভাসদগণকেও লক্ষ্য করে তাঁরা বলেছেন, ধর্মজ্ঞ সভাসদগণের অসঙ্গত কার্য করা উচিত নয়। যে সভায় সভাসদগণের সমক্ষেই অধর্ম এবং মিথ্যা, সত্যকে বিনষ্ট করে—সেই সভার সভাসদেরাই বিনষ্ট হন। যে সভায় ধর্ম অধর্ম কর্তৃক আহত হয়, কিন্তু সভ্যেরা সে আঘাতের প্রতিবিধান করেন না—সেই সভার সভ্যেরাও অধর্মাহত হন।

পাণ্ডবেরা রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণের কথা সত্য, ধর্মসঙ্গত ও ন্যায়-সঙ্গত ভাবেই বলছেন। সভাসদগণও বলুন, আমি অসত্য—অধর্ম কখনও করেছি কি না ? হে মহারাজ ! এই ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন, শান্ত হন, লোভের বশীভূত হবেন না।

আপনি জতুগৃহে পাণ্ডবদের দগ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তবু তাঁরা পুনরায় আপনার আশ্রয়েই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পরে বনবাসে গমন করেছিলেন। এখন পুনরায় আপনার আশ্রয়ই কামনা করছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে অধিষ্ঠিত থেকে

সকল রাজাকে বশীভূত করে আপনারই অনুগত করেছিল—আপনাকে অতিক্রম করেন নি। অথচ শকুনি, তাঁর রাজ্য ও ধন হরণ করবার ইচ্ছায় দ্যূতক্রীড়ায় অত্যন্ত কপটতা করলেন। অসাধারণ যুধিষ্ঠির—ধৈর্যশীল যুধিষ্ঠির সেই অবস্থায় উপস্থিত হয়েও—দ্রৌপদীকে সভাগত দেখেও ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি।

হে ভরতনন্দন! আমি আপনার ও তাঁদের মঙ্গলই ইচ্ছা করি। অরিন্দম পাণ্ডবেরা আপনার সেবা করতে প্রস্তুত—আবার যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। সুতরাং যাতে বিশেষ হিত—তাই করুন।

কৃষ্ণ নীরব হলেন। কিন্তু সভাসদেরাও সকলে নীরব ও রোমাঞ্চিত দেহ হয়ে বসে রইলেন। তাঁরা কেউই কোনও উত্তরদানে সমর্থ হলেন না।

অতঃপর পরশুরাম নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, আমি পূর্বকালের দম্ভোদ্ভব নামে এক রাজার কাহিনী বলছি। সেই কাহিনী শোনার পর যদি ভাল মনে করেন তবে মঙ্গলময় পথ অবলম্বন করবেন।

পরশুরাম নর ও নারায়ণ ঋষির কাছে দম্ভোদ্ভব রাজার পরাজয়ের কাহিনী বিবৃত করার পর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, হে মহারাজ! যে পর্যন্ত ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডিবে অস্ত্র সংযুক্ত না হয়—তার পূর্বেই আপনি গর্ব ত্যাগ করে অর্জুনকে আশ্রয় করুন। কৃষ্ণ যার সখা—সেই অর্জুন যুদ্ধে সকলের পক্ষেই দুঃসহ। যুদ্ধে ত্রিভুবনে তার সমকক্ষ কেউ নেই। কোনও বীরই তাকে জয় করতে পারে না।

ক্রমে কণ্ব মুনি, নারদ সকলেই উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করে ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধির স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা বললেন, রাজা! অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগ কর। পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর!

শেষপর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অসহায়তার কথা ব্যক্ত করে বললেন,

হে কৃষ্ণ, তুমি স্বর্গোপযোগী, লৌকিক নিয়ম অনুসারী, ধর্মসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত কথাই আমাকে বলেছ। কিন্তু আমি স্বাধীন নই। পুত্রেরা যে কর্ম করতে উদ্যত তা আমার প্রিয়ও নয়। অথচ আমি নিষেধ করলেও দুরাত্মা পুত্রেরা তা গ্রাহ্য করবে না। অতএব কৃষ্ণ, তুমিই অনুনয় দ্বারা আমার মূর্খ পুত্রকে নিবৃত্ত করার চেষ্ট কর। আমার দুরাত্মা পুত্র গান্ধারী, ভীষ্ম, বিদুর প্রমুখ কোনও হিতৈষীর বাক্যই গ্রহণ করে না। তুমিই তাকে একটু উপদেশ দান করে ধর্মপথে পরিচালিত করার চেষ্টা কর এবং তা যদি করতে সক্ষম হও—তাহলে সেটাই হবে প্রকৃত সুহৃদের কাজ।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে কৃষ্ণ মধুর বচনে দুর্যোধনকে বললেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, বিচক্ষণ বীর, মহোৎসাহী! পাণ্ডবগণের সঙ্গে আপনি সন্ধি করুন। এতেই আপনার মঙ্গল হবে। আপনি পিতার শাসনকে স্বীকার করুন। আপনার পিতার অভিপ্রায়ই আপনারও অভিপ্রেত হোক।

কৃষ্ণ দীর্ঘসময় দুর্যোধনকে উপদেশ দান করে আবার বললেন, আপনি আশা করছেন, সত্য। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রমুখ কোনও বীরই অর্জুনকে জয় করতে সমর্থ নন। অযথা লোকক্ষয়েরই বা প্রয়োজন কিসের? আপনি এমন একটি পুরুষের সন্ধান করুন—যিনি জয় করলে আপনার জয় বলেই ঘোষিত হতে পারে।

খাণ্ডব দাহনের সময় যে অর্জুন গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, নাগ ও দেবতাদেরও জয় করেছিল—সেই অর্জুনের সঙ্গে কোন মানুষ যুদ্ধ করতে পারে? আর বিরাট রাজ্যে একের সঙ্গে বহুর সেই বিচিত্র যুদ্ধের কথা স্মরণ করুন; তা-ই আমার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ।

সন্ধি হলে মহারথ পাণ্ডবেরা আপনাকেই যুবরাজ পদে এবং আপনার পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকেই মহারাজ পদে স্থাপন করবেন। অতএব পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দান করে আপনি বিশাল রাজলক্ষ্মী

লাভ করুন।

কৃষ্ণের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রও দুর্যোধনের শুভ বুদ্ধির উন্মেষ ঘটাবার জন্যে বহুতর উপদেশ দান এবং ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর চিত্র তার সামনে উপস্থিত করলেন। কোনও উপদেশই দুর্যোধনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। বরং দুর্যোধন কৃষ্ণকে বলল, আপনি শুধু আমারই নিন্দাবাদ করলেন। শুধু আপনি কেন ? পিতা, পিতামহ, বিদুর সকলেই কেবল আমার অপরাধই দেখেন—পাণ্ডবদের নয়। যাহোক, আমি আমার কোনও অপরাধ দেখতে পাই না। ভয়বশত আমরা ক্ষাত্রধর্ম চ্যুত হয়ে স্বয়ং ইন্দ্রের কাছেও অবনত হব না। যদি নিজের ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে যুদ্ধে আমরা নিহতও হই—তবু আমাদের স্বর্গলাভ ঘটবে। যুদ্ধে শরশয্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান এবং কাম্য ধর্ম। পূর্বে আমার পিতৃদেব পাণ্ডবদের যে রাজ্যাংশ দিয়েছিলেন—আমি জীবিত থাকতে তা আর তারা কোনো দিনও লাভ করবে না। তীক্ষ্ন সূচির অগ্রভাগে ভূমির যতটুকু স্থান বিদ্ধ হয় তা-ও আমি পাণ্ডবদের দেব না।

দুর্যোধনের বক্তব্য শ্রবণে ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ প্রবল বেগে হাস্য করে ঘূর্ণিত লোচনে বললেন, তুমি বীরশয্যাই লাভ করবে।

তুমি বলছ যে তোমার কোনো দোষ নেই। অথচ পাণ্ডব-ঐশ্বর্য দর্শনে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তুমিই শকুনির সাহায্যে দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করেছিলে। নচেৎ সেই সজ্জনেরা অন্যায্য দ্যূতক্রীড়া করার জন্যে এখানে উপস্থিত হবে কেন ? দ্যূতক্রীড়ায় মানুষের বুদ্ধিভ্রষ্টতা ঘটে। তুমিই তোমার ভ্রাতৃজায়াকে সভায় আনয়ন করে নির্যাতন করেছিলে। পাণ্ডবরা তোমার সঙ্গে সঙ্গত আচরণই করতেন। অথচ বারণাবতে তুমি তাদের অগ্নিদগ্ধ করার চেষ্টা করেছিলে। বিষদান, সর্পদংশন প্রভৃতি সর্ব উপায়েই তুমি পাণ্ডবদের হত্যা করার চেষ্টা করেছিলে। তবু তুমি বলবে যে,

তোমার কোনও অপরাধ নেই ?

পাণ্ডবেরা এখন তাদের পৈতৃক অংশই প্রার্থনা করছেন। অথচ তুমি তা দিতে প্রস্তুত নও। কিন্তু পাপিষ্ঠ, তুমি যুদ্ধে নিপাতিত হয়ে সে সমস্ত কিছুই দান করতে বাধ্য হবে। তোমার মাতা, পিতা, ভীষ্ম, বিদুর বারংবার তোমাকে সৎ পরামর্শ দিচ্ছেন অথচ তুমি তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নও।

কৃষ্ণের কথায় দুঃশাসনও চিন্তিত হয়ে দুর্যোধনকে বলল, রাজা আপনি যদি স্ব-ইচ্ছায় পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি না করেন তবে কৌরবেরা আপনাকে বন্দী করে যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পণ করবেন।

দুর্যোধন দুঃশাসনের কাছ থেকেও এইরকম প্রতিবাদ লাভ করে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লিক প্রমুখ সকলকে অগ্রাহ্য করে সভা ত্যাগ করে প্রস্থান করল। তার অনুগামী হল ভ্রাতারা এবং কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদ্বেষী রাজন্যেরা।

দুর্যোধনকে সভা ত্যাগ করতে দর্শন করে ভীষ্ম বললেন, কৃষ্ণ ! দুর্যোধনের অনুগামী রাজন্যদের কাল পূর্ণ হয়েছে।

কুরু পিতামহ ভীষ্মের কথা শ্রবণ করার পর কৃষ্ণ সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কুরুবংশীয় বয়োবৃদ্ধরা একটি অন্যায় করছেন। তাঁরা একটি মূর্খকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছেন—কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন না। আপনারা দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনিকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের হস্তে সমর্পণ করুন। এতে উভয় পক্ষেরই হিত সাধন হবে। কিংবা, হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! আপনি কেবল দুর্যোধনকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করুন। আপনার জন্যেই যাতে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের প্রাণ বিনষ্ট না হয় তা দেখা আপনার কর্তব্য।

কৃষ্ণের বক্তব্য শ্রবণ করে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে সর্ব ধর্মজ্ঞ বিদুরকে বললেন, হে বিদুর ! তুমি গান্ধারীকে এখানে আহ্বান কর। তার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা দুর্যোধনকে অনুনয়

করব। তাতেও যদি কার্যসিদ্ধি না হয় তবে আমরা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য মতোই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আশা করি, দুর্যোধন গান্ধারীর কথা উপেক্ষা করতে পারবে না।

বিদুর গান্ধারীকে সভায় আনয়ন করলে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর পুত্রপ্রীতির জন্যে ভৎর্সনা করলেন। তারপর তাঁর আদেশে দুর্যোধনকে সভায় আহ্বান করা হল।

দুর্যোধন মাতার আদেশে পুনরায় সভায় আগমন করল।

গান্ধারী তীব্র ভাষায় দুর্যোধনকে ভৎর্সনা করে তাকে সন্ধি করতে বারংবার উপদেশ দান করলেন। তিনি বললেন, দৃঢ়ক্রোধী কর্ণ এবং তোমার ভ্রাতা দুঃশাসন—তোমরা পাণ্ডবদের রাজ্য আত্মসাৎ করতে সমর্থ হবে না। অপরদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অর্জুন, ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হলে উভয়পক্ষের সৈন্যই বিনষ্ট হবে। সুতরাং ক্রোধযুক্ত হয়ে সমগ্র কৌরবগণকে ধ্বংস কোরো না। তাছাড়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ তোমার স্বপক্ষে যুদ্ধ করলেও কখনই সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন না। কারণ ধার্মিক পাণ্ডবেরা তাঁদেরও প্রিয়। অতএব পুত্র, শান্ত হও। কৃষ্ণের স্মরণ নাও। এতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

কিন্তু দুরাচারী দুর্যোধন মাতৃ-উপদেশও উপেক্ষা করল। সে সভা ত্যাগ করে মন্ত্রণার জন্যে শকুনির কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন ও দুর্যোধন স্থির করল যে, তারা কৃষ্ণকেই বন্ধন করবে। কৃষ্ণহীন পাণ্ডবেরা হয়ে পড়বে অসহায়—শক্তিহীন।

কিন্তু দুর্যোধনের দুর্ভাগ্য, মহাবীর সাত্যকি তাদের উদ্দেশ্যের কথা অবগত হয়ে কৃতবর্মার সঙ্গে পরামর্শ করে যাদবসৈন্যকে ব্যূহবদ্ধ করার আদেশ দিল। তারপর সে সভায় প্রবেশ করে কৃষ্ণকে ষড়যন্ত্রের কথা নিবেদন করল এবং পরে বিদুরকেও তা নিবেদন করল।

স্পষ্টবক্তা ধর্মজ্ঞ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, রাজা! কম আপনার সব পুত্রকেই বেষ্টন করেছে। কারণ, আপনার পুত্রেরা অসাধ্য এবং নিন্দনীয় কার্য করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তারা কৃষ্ণকে বন্ধন করার উদ্যোগ নিচ্ছে।

কৃষ্ণ হাস্য সহকারে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, হে মহারাজ! আপনি অনুমতি করুন—হয় ওরা আমায় বন্ধন করুক—নয় আমি তাদের বন্ধন করব।

কৃষ্ণের বক্তব্যে ধৃতরাষ্ট্র উত্তেজিত হয়ে বিদুরকে আদেশ করলেন, ধৃষ্ট দুর্যোধনকে সভায় আহ্বান কর। দুর্যোধন সভায় প্রবেশ করলে তীব্রভাষায় তাকে আক্রমণ করলেন ধৃতরাষ্ট্র—নৃশংস! পাপিষ্ঠ! কতকগুলি ক্ষুদ্রকর্মা লোক তোর সহায় হয়েছে। নচেৎ এই পাপকার্যে কেন তোর মতি হবে! তুই পাপিষ্ঠ সহচরগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্ধর্ষ ও দুর্মদ কৃষ্ণকে বন্ধন করার প্রয়াস করছিস—দেবেরও যা অসাধ্য! ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ—ভয়ঙ্কর বিক্রমশালী ও অনিন্দিত কৃষ্ণকে কি তুই এখনও উপলব্ধি করিস নি! ওকে বন্ধন করতে গেলে অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের মতো মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে তোকেও ভষ্মীভূত হতে হবে।

ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বললেন, রে মূঢ়মতি দুর্যোধন! তুমি আমাকে বন্ধন করার দুঃসাহস প্রকাশ করছ! আমি একক তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অতঃপর কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ করে সাত্যকির সঙ্গে সভাগৃহ ত্যাগ করলেন। তিনি ব্যথিত—ক্ষুব্ধ। ধার্তরাষ্ট্রদের আসন্ন মৃত্যুদৃশ্য যেন তাঁর সম্মুখে নৃত্য করছিল। কৃষ্ণ প্রস্থান করলে সকলে তাঁকে অনুসরণ করে দ্বারে এসে উপস্থিত হল। বাইরে দারুক তাঁর কপিধ্বজ রথ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করছিল মহারথী কৃতবর্মা।

কৃষ্ণ রথে আরোহণ করলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র অনুতপ্ত ও বিষণ্ণ

স্বরে বললেন, হে শত্রুদমন কৃষ্ণ! পুত্রদের ওপর আমার কতটুকু প্রভুত্ব রয়েছে তাতো লক্ষ্য করলে। কিছুই তোমার অজ্ঞাত রইল না। আমি শান্তি কামনা করলেও আমি শান্তি স্থাপনের অধিকারী নই।

কৃষ্ণ অতঃপর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে বললেন, আজ কৌরব-সভায় যা সংঘটিত হল তা আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও স্বীকার করেছেন যে, তিনি পুত্রদের শাসন করতে অপারগ। সুতরাং আমি আপনাদের সকলের অনুমতি প্রার্থনা করছি—আমাকে প্রস্থান করার অনুমতি দিন। আমি সত্বর উপপলব্য নগরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হতে চাই।

সকলে অনুমতি দান করলে কৃষ্ণ বিদুর-ভবনের দিকে অগ্রসর হলেন।

বিদুর-ভবনে কুন্তী সন্ধি সংবাদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কৃষ্ণকে দর্শন করে তিনি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, শান্তি কি সংস্থাপিত হল?

কৃষ্ণ সমস্ত ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত করে বললেন, ঋষিরা ও আমি নানাবিধ আদরণীয় এবং যুক্তিযুক্ত কথা বললাম। ভৎর্সনা করলাম। কিন্তু মূঢ় দুর্যোধন কোনো কিছুই গ্রাহ্য করল না। অতএব দুর্যোধনের কাল পূর্ণ হয়েছে! আমি শীঘ্রই ধর্মরাজের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক। আপনার কোন বার্তা আমি বহন করে নিয়ে যাব—তা বলুন।

কুন্তী বললেন, কৃষ্ণ তুমি ধর্মরাজকে বলবে যে, তার ক্ষাত্র ধর্ম লঙ্ঘিত হতে বসেছে। ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়দের জন্যে যে ধর্ম সৃষ্টি করেছেন—সেই ধর্মের দিকে লক্ষ্য কর। বাহুবলই তোমার উপজীব্য হোক। তোমার পৈতৃক রাজ্যের অংশ শত্রু হস্তগত করেছে। তাই তুমি মান, দান, ভেদ, দণ্ড বা অন্য কোনও কৌশলে তা উদ্ধার কর। হে যুধিষ্ঠির তুমি রাজধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর। পিতৃপুরুষকে নরকে নিমগ্ন কোরো না।

হে কৃষ্ণ! পুত্রদের কাছে তুমি আমার মঙ্গলের কথা বোলো। তাদের রক্ষা কোরো। এখন তুমি নির্বিঘ্নে উপপলব্য নগরে প্রত্যাবর্তন কর।

অতঃপর কৃষ্ণ কুন্তীর কাছে বিদায় নিয়ে সিংহের গতিতে বিদুর-ভবন থেকে নির্গত হলেন।

[উদ্যোগপর্বের দুটি স্থান প্রক্ষিপ্ত বলে বোধ হয়।

এক, কৌরবসভায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন। মানবিক—আদর্শ পুরুষ কৃষ্ণের কৌরবসভায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন হাস্যকর বলেপ্রতীয়মান হয়। দুর্যোধনকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করানোর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কেননা কৃষ্ণ কেমন শক্তিধর এবং উপস্থিত যাদব নায়কেরাও যে কত বড় বীর তা-ও দুর্যোধনের অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং বিশ্বরূপ প্রদর্শনের কী প্রয়োজন ছিল? বিশ্বরূপ দর্শন করার মতো ভাগ্যবান কি সকলে?

ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের কটূক্তি ও ভৎসনার প্রতিবাদে দুর্যোধন কোনো প্রত্যুত্তর করেন নি বা কৃষ্ণকে বন্দী করার কোনো উদ্যোগ নিতেও তাকে দেখা যায় নি। এ হেন পরিস্থিতিতে কৃষ্ণ কৌরবদের ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে হঠাৎ বিশ্বরূপ প্রদর্শনের আশ্রয় নিলেন —একথা অযৌক্তিক এবং অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। কোনো এক সময়ে কৃষ্ণের ওপর দেবত্ব আরোপ করার জন্যেই মহাভারতে এই প্রক্ষিপ্ত অংশটি সংযোজিত করা হয়েছিল বলেই বিশ্বাস।

দুই—উপপলব্য নগরে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে কর্ণকে নিজের রথে আহ্বান করার বিষয়টিও অযৌক্তিক বলে বোধ হয়। কারণ আমরা দেখি যে, কৃষ্ণের হস্তিনাপুর আগমন থেকে প্রস্থান-সময় পর্যন্ত কর্ণ দুর্যোধনের সঙ্গে ছায়ার মতো অবস্থান করেছে। কৃষ্ণ স্বয়ং দুর্যোধনকে কম কটূক্তি এবং ভৎসনা করেন নি। এসব কটূক্তি এবং ভৎসনার লক্ষ্য নিশ্চয় কর্ণও ছিল। পরিশেষে তাঁকে

বন্ধন করার মন্ত্রণার সঙ্গে কর্ণও যে জড়িত ছিল একথাও নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং বিদায়বেলায় কর্ণকে তিনি কেন সাদরে তাঁর রথে আহ্বান করে সম্মানিত করবেন ? হস্তিনায় পদার্পণ করেই তা করেন নি কেন ?

আমরা দেখি, কর্ণকে তিনি রথে আহ্বান করেছেন। তাকে তার জন্ম পরিচয় জ্ঞাপন করে—পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করার পরামর্শ দান করছেন। উদ্দেশ্য কৌরবশিবিরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা। কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ যদি সত্য বলে স্বীকার করি তবে কৃষ্ণকে এক নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র-কারী বলে চিন্তা করতে হয় এবং তাঁর শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে হয়। প্রথমত, কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত কৃষ্ণের জানার কথা নয়। মহাভারতে কোথাও এমন কোনও ইঙ্গিত নেই—যার সাহায্যে আমরা বুঝব যে, কুন্তীর কুমারী অবস্থায় মাতৃত্ব অর্জন করা নিয়ে লোকমনে কৌতূহল ছিল। কিংবা কর্ণের মাতৃ-পিতৃ পরিচয় নিয়ে কেউ বিশেষ রকমের কৌতূহলী হয়ে তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিল।

কুন্তী বাস করতেন ভোজরাজ্যে। কৃষ্ণের জানার কথা নয়, সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কী ঘটে গেছে।

তদানীন্তন সময়ে কুমারী অবস্থায় মাতা হওয়াটা এমন কোনো কিছু অগৌরবের বিষয় ছিল না। ব্যাসের জন্মকথা সত্যবতী গোপন করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ব্যক্তিগত কারণে কিংবা কাহিনীর প্রয়োজনে কুন্তী হয়তো কর্ণের জন্মকাহিনী গোপন করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যেখানে শান্তি স্থাপনে উদগ্রীব—তখন তিনি তা জেনেও সেই সত্যকে ষড়যন্ত্রকারীর মতো ব্যবহার করলেন কেন ? যুধিষ্ঠিরকে এই সত্য জানালেন না কেন ? যুধিষ্ঠির জানলে নিঃসন্দেহে যুদ্ধ করতেন না। কর্ণ দলত্যাগে প্রস্তুত না হলে তিনি বনবাসই কামনা করতেন। যে ব্যক্তি রাজ্যের পরিবর্তে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করতে পারেন—বনবাস তাঁর কাছে কি ইতর-

বিশেষ হত? বরং অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত—এতে তিনি আনন্দিতই হতেন।

শান্তি প্রয়াসী কৃষ্ণ এ সত্য কর্ণের কাছে ব্যক্ত করলেন—অথচ যুধিষ্ঠিরের কাছে গোপন করে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করে তুললেন—এ রকম একটি চিন্তা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোনো কবি হয়তো কর্ণের চরিত্রকে মহিমময় করে তোলার জন্যে এই অংশটি সংযোজন করেছিলেন। এই অংশটি স্বীকার করলে কৃষ্ণচরিত্রের পতন ঘটে এবং এটি পূর্বাপর বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। তাই বিশ্বরূপ প্রদর্শন ও কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ—এই কাহিনী দুটি স্বীকার করে নিতে পারি না। এছাড়াও পরবর্তীকালে কর্ণ-কুন্তী সংবাদকেও যুক্তিগত দিক দিয়ে আমার প্রক্ষিপ্ত বলে বোধ হয়।

কারণ কর্ণ-কুন্তী সাক্ষাৎকার যেন তথাকথিত কর্ণ-কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারেরই ঘটনা। কর্ণ যেন কুন্তীর মুখেই প্রথম তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনের কোনো উল্লেখমাত্র নেই এই কাহিনীতে।

কুন্তী শান্তি দৌত্যে ব্যর্থ কৃষ্ণকে বারবার প্ররোচিত করেছেন যে, যুধিষ্ঠির যেন বাহুবলের সাহায্যে তাঁর সাম্রাজ্য-সম্পদ উদ্ধার করেন। অথচ তাঁর জানার কোনো অসুবিধাই ছিল না বা তিনি জানতেন যে, এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা কর্ণ—তাঁর পুত্র। কর্ণকে স্বপক্ষে টানার কোনো প্রয়াসই তিনি করেন নি এবং কোথাও তাকে নিজের পুত্র বলে পরিচয় দানও করেন নি। ঘটনার শুরু থেকে প্রয়াস করলে কত সহজেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারত। পরিত্যক্ত হলেও সন্তানের প্রতি মাতার আকর্ষণ থাকবে না—এ কথা চিন্তা করা যায় না। তিনি যখন জেনেছেন যে তাঁর প্রথম পুত্র—চতুর্থ পুত্র অর্জুনের রক্তপিপাসু—তখন তিনি সেই সংঘাত দূর করার কোনো চেষ্টাই করেন নি। যদিও তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে, কর্ণই এই ভ্রাতৃযুদ্ধের মূল হোতা। হয় অর্জুন আর না হয় কর্ণ,

অর্থাৎ পঞ্চ পাণ্ডব জীবিত থাকবে—কর্ণের এই কথায় তিনি দুঃখিত হলেও স্বীকার করে নিয়েছেন। এক পুত্রের রাজ্য লাভের বাসনায় অন্য এক পুত্রকে বলিদান করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। কুন্তীর মতো আদর্শ মাতার পক্ষে তা কি সম্ভব? যে কোনো স্বাভাবিক মাতাই বলতেন, অনেক হয়েছে। ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের প্রয়োজন নেই। তোমরা বরং বনবাসে যাও। তাই আমার মনে হয়,—হয় কুন্তী এক নিকৃষ্ট মাতা, আর নয়তো এই কাহিনীগুলিই প্রক্ষিপ্ত। কর্ণের পরিচয় তিনি প্রকৃতপক্ষে জানতেন না এবং জানেন তার মৃত্যুর পর—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়। কৃষ্ণের পক্ষেও একই কথা—তিনি জানতেন না। জানতেন অথচ প্রকাশ করেন নি—ধর্ম এবং দেবত্বের প্রতীক কৃষ্ণের পক্ষে তা চরিত্রহানিকর।

তাই কর্ণ-কুন্তী সংবাদ স্বীকার করতে হলে বলতে হয় যে, কুন্তী এক হৃদয়হীনা মাতা। কুরুকুল ধ্বংসের জন্যে তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে উত্তরদায়ী।

যাহোক, কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদের সময় এবং কুন্তী-কর্ণ সংবাদের সময় কর্ণের চরিত্রটি মহানতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষই কর্ণকে মহান বলে প্রচার করেন। কিন্তু যথার্থই কি তাই? কর্ণ এক আত্মম্ভরী, মর্যাদাহীন এক বীর, এক অসূয়াপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধে অগণিত মানুষের মৃত্যুর জন্যে সেই-ই দায়ী। তারই আত্মম্ভরিতায় প্রভাবিত হওয়ার জন্যে দুর্যোধন কখনই শান্তি বা সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। সে তার সমস্ত হিতাকাঙ্খীদের কথা অগ্রাহ্য করেছে।

কর্ণের বন্ধুপ্রীতি-বন্ধুবৎসলতার কথা চতুর্মুখে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত বন্ধু কে? যে বন্ধুকে অধর্ম থেকে যে কোনও মূল্যে প্রতিনিবৃত্ত করে বা করার চেষ্টা করে—না কি যে বন্ধুর পাপচিন্তা সর্বসময়ে সমর্থন করে? কর্ণ বারণাবতের হীন ষড়যন্ত্র সমর্থন করেছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীকে লুণ্ঠন

করার চেষ্টা করেছিল। কৃষ্ণের শান্তি দৌত্যের বিরোধিতা করেছিল, দ্যুতসভায় দ্রৌপদীর উপর অমানবিক—বর্বর আচরণের জন্যে দুর্যোধন এবং দুঃশাসনকে প্ররোচিত করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে সংশপ্তকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করার ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করে সে অভিমন্যু হত্যার প্রত্যক্ষ দায়ভাগী হয়েছিল।

কর্ণ কোনো যুদ্ধে অর্জুনের সমকক্ষ বলে নিজেকে প্রমাণিতও করতে পারে নি। সে বরাবর আত্মশ্লাঘা করে গেছে। যুদ্ধে একাধিকবার সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, যা অর্জুন চরিত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অর্জুনের কাছে সে বারবার পরাজিত হয়েছে।

কর্ণ চরিত্রের একটিই মহানতার কথা আমি স্মরণ করতে পারি। তা হচ্ছে হস্তিনাপুরের রাজকুমারদের অস্ত্র-পরীক্ষার দিন—অধিরথকে সর্বসমক্ষে পিতৃজ্ঞানে প্রণাম করা। এছাড়া তার চরিত্রে ঔদার্যতা আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

দান-ধ্যান সকলেই করতেন। যুধিষ্ঠিরও করতেন। ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল দান ইত্যাদি কাহিনীগুলি আষাঢ়ে কাহিনী বলেই প্রতীত হয়। যাহোক, কর্ণ সম্পর্কে আমরা বাকি বিষয়গুলি যথাস্থানে আলোচনা করব।]

মহাতেজা কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে প্রত্যাগত হয়ে উপপলব্য নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের ঘটনা আদ্যপ্রান্ত বর্ণনা করলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে কৃষ্ণকে পৃথক পৃথক ভাবে সকলের বক্তব্য এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলার জন্যে অনুরোধ করলেন।

কৃষ্ণ বললেন, আমি দুর্যোধনকে হিতকর সব উপদেশ দান করার পর মূর্খ দুর্যোধন তা অগ্রাহ্য করে হাস্য করলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তারপর তিনি তাঁকে বলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ

দুর্যোধন, আমি তোমাকে যা বলেছি তা শ্রবণ করে বংশের হিত-সাধন কর। তাতে তোমার কল্যাণই হবে।

অতঃপর ভীষ্ম বলেন যে, তিনি প্রতীপনন্দন শান্তনুর একমাত্র পুত্র ছিলেন। সত্যবতীকে দর্শন করে শান্তনুর দ্বিতীয় পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা হতে তিনি সত্যবতীকে আনয়ন করেন এবং স্বয়ং রাজা না হওয়ার এবং ব্রহ্মচারী হয়ে জীবনযাপন করার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেন। অনন্তর সত্যবতীর দুইটি পুত্র জন্মলাভ করে—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। ভীষ্ম তখন বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। পরবর্তীকালে রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে কাশীরাজের তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকাকে বিচিত্রবীর্যের জন্য হরণ করে আনেন। পরিশেষে অমিতাচারের জন্যে ক্ষয়রোগে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু ঘটে।

অম্বা শাল্বের প্রতি অনুরক্তা থাকায় তাকে মুক্তি দান করা হয় এবং অম্বার জন্যে ভীষ্মকে জামদগ্নি রামের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়। সে এক স্বতন্ত্র কথা।

বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলে—ভরতকুল সংকটে পতিত হয়। রাজ্যেও অমঙ্গল সূচিত হতে থাকে। তখন মাতা সত্যবতী এবং বহু শুভানুধ্যায়ী তাঁকে রাজত্ব গ্রহণ এবং বংশরক্ষা করার জন্যে বারংবার অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু তিনি সমস্ত অনুরোধ উপরোধ অস্বীকার করে তাঁদের বলেন যে, পিতার কাছে তিনি রাজা না হওয়ার এবং ব্রহ্মচারী হয়ে জীবন ব্যতীত করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। কোনও মূল্যেই তিনি সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারবেন না।

পরবর্তীকালে অনেক পরামর্শ এবং বিচার-বিমর্শ করার পর মাতা সত্যবতীর কানীন-পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে আহ্বান জানালেন ভ্রাতৃজায়াদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার জন্যে। কালক্রমে

জন্মগ্রহণ করল—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর এক দাসীর গর্ভে বিদুর।

ধৃতরাষ্ট্র তার অন্ধত্বের জন্যে জ্যেষ্ঠ হয়েও সিংহাসন লাভ করতে পারে নি। পাণ্ডু রাজা হন। দাসীর গর্ভজাত বলে সিংহাসনে বিদুরের অধিকার ছিল না।

পাণ্ডবেরা পাণ্ডুরই পুত্র। শাস্ত্র অনুসারে পাণ্ডবেরা পিতা পাণ্ডুর সমস্ত ধনসম্পত্তি লাভের অধিকারী। তবু তুমি যদি অর্ধাংশও দান কর—তাতেও মঙ্গল। এই একই অভিমত পোষণ করেন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুর।

দ্রোণও ভীষ্মকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, ভীষ্ম যে পক্ষে অবস্থান করবেন আমিও সেই পক্ষে অবস্থান করব। সুতরাং তুমি ভীষ্মের কথা মান্য কর।

এরপর বিদুর এবং গান্ধারীও দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে লোভ ত্যাগ করার জন্যে বংশের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন।

যযাতির পঞ্চ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন যদু এবং কনিষ্ঠ পুরু। সেই পুরুই কনিষ্ঠ হয়ে লাভ করেন পিতৃ সিংহাসন।

মহারাজ শান্তনুর পিতা ছিলেন প্রতীপ। তাঁর তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ দেবাপি, মধ্যম বাহ্লিক ও কনিষ্ঠ শান্তনু। দেবাপি চর্ম-রোগী হওয়ার জন্যে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হন। বাহ্লিক তাঁর মাতুল রাজ্য লাভ করেন। আর ভরতবংশের সিংহাসন লাভ করেন শান্তনু। কনিষ্ঠ হয়েও পাণ্ডুই লাভ করেছিল এই সিংহাসন। এর ওপর পাণ্ডুর পুত্রদেরই অধিকার। আমি রাজা নই। সুতরাং তুমি কেমন করে সিংহাসন কামনা কর? যুধিষ্ঠিরেরই একমাত্র অধিকার রয়েছে হস্তিনাপুরের ওপর। সুতরাং তুমি মোহ পরিত্যাগ করে অন্তত রাজ্যের অর্ধাংশ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যর্পণ কর। এতেই তোমার মঙ্গল।

কিন্তু মূঢ় দুর্যোধন তা অস্বীকার করেছে। অতএব মহারাজ,

আপনার যা উচিত বিবেচনা হয় সেই কর্তব্যই সম্পাদন করুন। দুর্যোধন সূচের অগ্রভাগের তুল্য ভূমি বিনা যুদ্ধে আপনাকে দান করবে না। অথচ আমি বলেছিলাম, সেইরকম হলে পাণ্ডবেরা পাঁচটি মাত্র গ্রাম লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকবেন। এখন শক্তি প্রয়োগ করা ব্যতীত আর কোনও উপায় লক্ষিত হয় না।

বক্তব্যশেষে কৃষ্ণ নীরব হলে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের বললেন, তোমরা বাসুদেবের বক্তব্য শ্রবণ করলে। এখন যুদ্ধ ব্যতীত কোনও পথ আর উন্মুক্ত নেই। সুতরাং আমাদের সাহায্যার্থী সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনাকে সজ্জিত করার আয়োজন কর। আমাদের মধ্যে সৈন্য পরিচালনে দক্ষ সাতজন নায়ক রয়েছেন। মহারাজ দ্রুপদ, মহারাজ বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান, ভীমসেন। এঁরা সকলেই ধর্মজ্ঞ, যুদ্ধবিশারদ, লজ্জাশীল এবং নীতিজ্ঞ। বাণযুদ্ধে এবং অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধেও সবিশেষ দক্ষ। হে সহদেব! তুমি এমন একজনকে নির্বাচন কর যিনি উক্ত সপ্ত নায়ককেও পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখেন। সৈন্য বিভাগ জানেন এবং জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ভীষ্মের বাণ সহ্য করতে সক্ষম। তুমি বল, কে আমাদের যোগ্য সেনাপতি?

সহদেব মহারাজ বিরাটের প্রশংসা করে বলল, মহারাজ বিরাটই সেনাপতি হবার যোগ্য।

সহদেবের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর নকুল বলল, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ দ্রুপদই আমাদের সেনাপতি হবার যোগ্য। পাঞ্চালরাজ এবং দ্রোণ উভয়কে সহ্য করতে পারবেন এবং দিব্যাস্ত্রেও সুশিক্ষিত।

অতঃপর অর্জুন বলল, মহারাজ বিরাট এবং পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দুজনেই সেনাপতি হবার যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্নের কথাও চিন্তা করতে হবে। অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ—মহাবাহু এই অলৌকিক পুরুষ পিতার তপস্যার প্রভাবে ও ঋষিগণের সন্তোষে উৎপন্ন হয়েছিলেন। যিনি অগ্নিকুণ্ড থেকে

সমুত্থিত হয়েই ধনু, কবচ ও তরবারি ধারণ পূর্বক দিব্যাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে সজ্জিত হয়েছিলেন। যে বীরের রথধ্বনি মহামেঘের ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, সিংহের ন্যায় দৃঢ় শরীর, সিংহের ন্যায় পরাক্রম, সিংহের ন্যায় তেজ, সিংহের ন্যায় বাহু, সিংহের ন্যায় বক্ষ, সিংহের ন্যায় গর্জন, সিংহের ন্যায় স্কন্ধ, যে বীরের বল ও কান্তি অসাধারণ, সুন্দর ভ্রূ, সুন্দর দন্ত,—সকল অঙ্গই সুন্দর, যিনি মদস্রাবী মত্ত হস্তীর ন্যায় সমস্ত অস্ত্রের অভেদ্য, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি দ্রোণবধের জন্যেই জন্মেছেন—সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকেই আমি উপযুক্ত সেনাপতি বলে মনে করি। কারণ, তিনিই ভীষ্মের বাণগুলি সহ্য করতে পারবেন। ভীষ্মের শায়কগুলি বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য সর্পের ন্যায় উজ্জ্বল মুখ, বেগে যমদূতের সমান এবং আঘাতে অগ্নির তুল্য! যুদ্ধে ভীষ্মের প্রচণ্ডতাকে সহ্য করতে পারবেন—এমন বীর আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতীত কাউকেই দেখি না।

[যজ্ঞ থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পাঞ্চালীর জন্মকাহিনীটি রূপক বলে বোধ হয়। হয়তো যজ্ঞ থেকে কোনো ঔষধি প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং সেই ঔষধি সেবনেই মহারানীর গর্ভে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়।]

সহদেব, নকুল আর অর্জুনের বক্তব্য শ্রবণ করার পর ভীম বলল, মহারাজ! সমাগত ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ বলেন যে ভীষ্মবধের জন্যে শিখণ্ডীর জন্ম হয়েছিল। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ও রথস্থিত সেই শিখণ্ডীকে যিনি যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করতে পারেন সেরকম কোনো বীর তো আমি দেখতে পাই না। শিখণ্ডী ব্যতীত কোনো বীরই দ্বৈরথ যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। তাই শিখণ্ডীই আমাদের সেনাপতি হোক।

চার ভ্রাতার ভিন্ন ভিন্ন মতামত শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, ধর্মাত্মা কৃষ্ণ জগতের সমস্ত বল ও অবল প্রভৃতি সব কিছুই জানেন। কৃষ্ণ যাঁর কথা বলবেন—তিনি অস্ত্রে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, বৃদ্ধ বা যুবা যাই হোক না কেন—তিনিই আমাদের সেনাপতি হবেন। হে কেশব! তুমিই পাণ্ডব সেনাপতি নির্বাচন কর। রাত্রি আগত। সুতরাং সেনাপতি নির্বাচন করার পর প্রভাতে অস্ত্রসমূহের অধিবাস ও মঙ্গল সম্পাদন পূর্বক তোমার বশবর্তী হয়ে আমরা সমরাঙ্গনে যাত্রা করব।

যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য শ্রবণ করে কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, হে ধর্মরাজ! যাঁদের কথা উল্লেখ করা হল, তাঁরা প্রত্যেকেই মহা বিক্রমশালী এবং আপনার সেনাপতিত্ব করার যোগ্য। সে যাহোক, আপনি উত্তমরূপে সৈন্য যোজনা করুন। কারণ আমার মতে এখন বধ করা ব্যতীত ধার্তরাষ্ট্রদের আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না। অর্জুন, ক্রুদ্ধ ভীমসেন, যমের তুল্য নকুল ও সহদেব, সাত্যকি, কোপন-স্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, বিরাট, দ্রুপদ ঘটোৎকচ এবং ভয়ঙ্কর বিক্রমশালী অক্ষৌহিণীপতি অন্যান্য রাজগণকে দর্শন করে ধার্তরাষ্ট্রেরা রণক্ষেত্রে স্থির থাকতে পারবে না। তবে সর্বদিক বিচার বিবেচনা করার পর আমার অভিমত ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদের সেনাপতি হোক।

কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করামাত্র পাণ্ডবেরা ভীষণ আনন্দিত হলেন। —যুদ্ধসজ্জা কর, যুদ্ধসজ্জা কর! চতুর্দিকে আনন্দের কোলাহল উঠল।

প্রভাতে সমস্ত মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করার পর সজ্জিত পাণ্ডবসেনা গঙ্গাস্রোতের ন্যায় কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সম্মুখে রইল ভীমসেন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, প্রভদ্রকগণ ও পাঞ্চালগণ। যুধিষ্ঠির রইলেন মধ্যস্থলে। দ্রৌপদী অন্যান্য স্ত্রীগণের সঙ্গে পাণ্ডব-

বাহিনীকে কিছুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করার পর উপপলব্য নগরে প্রত্যাবর্তন করল।

যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করে রাখলেন, কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা. ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজের পুত্র অভিভূ, শ্রেণিমান, বসুদাস. ও অপরাজিত শিখণ্ডী।

বিরাট, দ্রুপদ, সৌমকি, সুশর্মা, কুন্তীভোজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ—এঁরা সৈন্যদলের পশ্চাতে রইলেন।

অনাধৃষ্টি, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু ও সাত্যকি কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে বেষ্টন করে গমন করতে থাকল।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে শ্মশান, দেবালয়, মহর্ষিদের আশ্রম, তীর্থ ও সিদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে সুন্দর সুন্দর ক্ষারমৃত্তিকাশূন্য নির্মল ও পবিত্র স্থান নির্বাচিত করা হল।

কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী নামে একটি কঙ্কর ও কর্দমহীন নির্মল জলপূর্ণ নদীর নিকট কৃষ্ণ পরিখা খনন করিয়ে সেখানে সৈন্য সন্নিবেশিত করলেন। পাণ্ডবগণের জন্যে নির্মিত উৎকৃষ্ট শিবিরসমূহের মতো অনুগামী রাজন্যদেরও শিবির নির্মিত হল এবং সেগুলির ভিতরে প্রচুর কাষ্ঠ, ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন ও পানীয়ের আয়োজনও করা হল।

চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং শল্যবিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসকদের জন্যেও উৎকৃষ্ট সব শিবিরসমূহের আয়োজন করা হল।

প্রতি শিবিরেই রাশি রাশি ধনুকের গুণ, ধনু, বর্ম, অস্ত্র. মধু, ঘৃত ও ধূপেরেণু সংস্থাপিত হল।

অন্যদিকে পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার সংবাদে কৌরব পক্ষও আলস্য পরিত্যাগ করে কুরুক্ষেত্রের দিকে সৈন্য চালনা করল।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েও শান্তিকামী যুধিষ্ঠিরের চিত্তের সংশয় দূর হল না। তিনি কৃষ্ণকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে বাসুদেব! ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও দুর্যোধনের

বক্তব্য তুমি আমাদের বলেছ। তবু আরও একবার বিবেচনা করে বল আমাদের কী কর্তব্য ?

কৃষ্ণ তখন পুনরায় বললেন, হে ধর্মরাজ! আপনি যেসব ধর্মার্থযুক্ত ও হিতকর বাক্য বলেছিলেন তা দুর্যোধন গ্রাহ্য করে নি। ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ—সকলের উপদেশই সে অগ্রাহ্য করেছে। এই দুরাত্মা ধর্ম কামনা করে না—যশও কামনা করে না। শুধু মাত্র কর্ণকে অবলম্বন করে সে যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে বলেই মনে করে। এমনকি পাপিষ্ঠ আমাকে বন্ধন করারও ষড়যন্ত্র করেছিল।

যাহোক, বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে সর্বস্ব ত্যাগ করে ওদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা এখন অর্থহীন। যুদ্ধই আমাদের উচিত কর্তব্য।

কৃষ্ণের পরিষ্কার বক্তব্য শ্রবণ করার পর রাজন্যেরা যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত করে রইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁদের অভিপ্রায় অবগত হয়ে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে যুদ্ধের আয়োজন করারই আদেশ দান করলেন।

ব্যথিত যুধিষ্ঠির স্বজন-নিধনের আশঙ্কায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ভীম আর অর্জুনকে বললেন, হায়! কিভাবে গুরুজন আর বৃদ্ধদের বধ করে আমরা জয় লাভ করব ?

অর্জুন প্রত্যুত্তরে বললেন, হে রাজা! মাতা কুন্তী, বিদুর আর কৃষ্ণের ধর্মযুক্ত উপদেশগুলি স্মরণ করুন। তাঁরা নিশ্চয় অধর্মের কথা আপনাকে বলবেন না। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করে বিনা যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করাও শোভনীয় নয়।

অর্জুনের কথার সমর্থনে কৃষ্ণ বললেন, হে রাজা! কিসের সংশয় ? আমরা শান্তির জন্যে শেষপর্যন্ত চেষ্টা করেছিলাম। মাত্র পঞ্চগ্রামের প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্জন দুর্যোধন তাতেও সম্মত হয় নি। সুতরাং যুদ্ধের জন্যে আমাদের উত্তরদায়িত্ব নেই। আপনি নিঃসংকোচে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ! আর কোনো সংশয় বা দ্বিধা নয়। যুদ্ধের জন্যে আমি প্রস্তুত।

কৌরবপক্ষেরও সেনা বিভাগ করল দুর্যোধন। কৃপ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামা এই ক'জন নরশ্রেষ্ঠকে এবং মদ্ররাজ শল্য, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কৃতবর্মা, ভূরিশ্রবা, সুবলপুত্র শকুনি ও মহাবল বাহ্লিক এই আটজন রাজন্যের প্রত্যেককে এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের নায়ক করে যথা বিধানে দুর্যোধন তাঁদের অভিষিক্ত করাল!

অতঃপর দুর্যোধন অন্যান্য রাজন্যগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভীষ্ম সমীপে উপস্থিত হল। কৃতাঞ্জলিপুটে সে বলল, আপনি যুদ্ধ-নীতিতে শুক্রাচার্যের তুল্য সুনিপুণ। সর্বদাই আমার হিতৈষী এবং ধার্মিক বলে শত্রুরাও আপনাকে তাদের পক্ষে গ্রহণ করতে পারবে না। কার্তিক যেমন দেবসৈন্যগণের, অগ্নি যেমন বসুগণের, আপনি তেমন আমাদের সেনাপতি হন। আমরাও আপনা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে দেবগণেরও অজেয় হব।

ভীষ্ম দুর্যোধনের কথা শুনে বললেন, আমার নিকট পাণ্ডবেরা যেমন আদরের—তোমরাও তেমনই। তথাপি আমি তোমাদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করব। তবে রাজা, আমি তাদের সুখ্যাতিও করব। এই পৃথিবীতে কুন্তীপুত্র অর্জুন ব্যতীত কোনো যোদ্ধা আমার সমকক্ষ নয়। অর্জুন এবং আমি এই দু'জনে অস্ত্রবলে ক্ষণকালের মধ্যেই এই বিশাল সেনা ধ্বংস করতে সক্ষম। আমি প্রত্যহ শত্রুপক্ষের দশ সহস্র সেনা সংহার করব। এর পূর্বেই যদি পাণ্ডবেরা আমায় বধ না করে তবে আমি প্রতিদিন একই সংখ্যক সেনাকে সংহার করব। আরও একটি কথা—হয় কর্ণ প্রথমে যুদ্ধ করুক, নয় আমি। কারণ কর্ণ সব সময়ে আমার সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করে।

কর্ণ বলল, উত্তম কথা। কুরুপিতামহের মৃত্যুর পরই আমি সংগ্রাম করব।

দুর্যোধন ভীষ্মের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করল। তারপর শত্রুমর্দনকারী সেনাপতি ভীষ্মকে সঙ্গে নিয়ে প্রচুর গাভী এবং সুবর্ণ দান করে, মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম সাঙ্গ করে দুর্যোধন হস্তিনাপুর থেকে নির্গত হয়ে কুরুক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করল। অতঃপর যেস্থানে প্রচুর পরিমাণে তৃণ ও কাষ্ঠ পাওয়া যায়—মৃত্তিকা ক্ষারশূন্য সেইরূপ একটি স্থানে শিবির স্থাপন করল।

যুধিষ্ঠির যিনি বিপদের সময়েও ধর্ম ও অর্থ নির্বাচনে সুনিপুণ তিনি কৃষ্ণ এবং সকল ভ্রাতাকে আহ্বান করে বললেন, তোমরা সৈন্যবাহিনীকে পরিদর্শন কর, তাদের সুসজ্জিত কর এবং যথাযথ রূপে প্রস্তুত হয়ে অবস্থান কর। কারণ, প্রথম দিনেই মহাবল ভীষ্মের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। তাই আমাদের সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনার সপ্ত নায়ক নির্বাচন করা আশু কর্তব্য।

কৃষ্ণের সমর্থনে দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী এবং মগধাধিপতি জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে যুধিষ্ঠির যথা নিয়মে সপ্ত সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন এবং দ্রোণ-বিনাশের জন্যে যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সেই সিংহসদৃশ মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রধান সেনাপতি রূপে নিযুক্ত করলেন। অর্জুনকে স্থাপন করলেন সর্ব সেনাপতির ঊর্ধ্বে।

একসময় নীলবর্ণ পট্টবসনধারী, কৈলাস শৃঙ্গের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি এবং সিংহের ন্যায় স্বচ্ছন্দগতি—রক্তনয়ন বলরাম, অক্রূর, গদ, শাম্ব, উদ্ধব, প্রদ্যুম্ন, আহুক পুত্র এবং চারুদেষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির পটমণ্ডপে প্রবেশ করলেন।

বলরামকে দর্শন করে মহাতেজা কৃষ্ণ প্রমুখ এবং পাণ্ডবেরা গাত্রোত্থান করে বলরামকে স্বাগত জানালেন।

বলরাম কৃষ্ণের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করে সখেদে বললেন, এই যুদ্ধে ভীষণ লোকক্ষয় অনিবার্য। দৈবের তাই-ই ইচ্ছা।

আমি কৃষ্ণকে বারংবার অনুরোধ করেছিলাম—কৃষ্ণ, সম্পর্কযুক্ত লোকদের সঙ্গে সমান ব্যবহার কর। আমাদের কাছে কৌরব-পাণ্ডব সমান। কিন্তু কৃষ্ণ আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে আপনার পক্ষ অবলম্বন করেছে, ধর্মরাজ। কৃষ্ণই ধর্ম। সুতরাং আপনাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। দুর্যোধন ও ভীম উভয়েই আমার শিষ্য এবং প্রিয়। সুতরাং ধর্মার্থে হলেও আমি এই কুলক্ষয় প্রত্যক্ষ করতে পারব না। আমি তীর্থদর্শনে নির্গত হব।

অগত্যা সকলে বলরামকে বিষণ্ন চিত্তে তীর্থযাত্রায় গমনের জন্য অনুমতি দান করলেন। বলরামও বিমর্ষ চিত্তে যাদব মহানায়কদের নিয়ে প্রস্থান করলেন।

যুদ্ধের প্রাক্কালে ভীষ্মকে প্রসন্ন করার জন্যে দুর্যোধন পিতামহের শিবিরে এল। পিতামহের বীরত্বের প্রশংসা করে বলল, আপনি এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্রোণ আমার পক্ষ অবলম্বন করাতে আমি এখন অপরাজেয়। তবু পিতামহ, আমি স্বপক্ষ আর বিপক্ষের রথীসংখ্যা এবং অতিরথসংখ্যা জানতে ইচ্ছা করি। এ সমস্ত তথ্যই আপনার নখদর্পণে।

তখন ভীষ্ম বললেন, তোমার একশত ভ্রাতার সঙ্গে তুমিও একজন প্রধান রথী। তোমরা সকলেই অস্ত্রশিক্ষা করেছ, ছেদে, ভেদে বিশারদ হয়েছ। রথ ও হস্তী আরোহণে নিপুণ এবং গদা, প্রাস, অসি ও চর্মযুদ্ধে দক্ষতা লাভ করেছ। তোমরা সকলেই সৈন্য পরিচালনায় দক্ষ, অস্ত্রে সুশিক্ষিত। বাণাস্ত্রে দ্রোণ এবং কৃপের শিষ্য। সন্দেহ নেই যে যুদ্ধদুর্ধর্ষ ধার্তরাষ্ট্রেরা পাঞ্চালগণকে সংহার করবে। আর আমি তোমার সমগ্র সৈন্যের পরিচালক হয়ে যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে আকুল করে বিনাশ করব।

ভোজবংশীয় ও অস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ কৃতবর্মা একজন অতিরথ। ইনিও দানবের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্য সংহার করবেন।

মহাধনুর্ধর শল্য একজন অতিরথ। ইনি তোমার পক্ষে যোগদান করেছেন।

মহাধনুর্ধর ও অতিরথ ভূরিশ্রবা শত্রুপক্ষের গুরুতর বলক্ষয় করবেন।

আমার মতে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুইজন রথীর তুল্য। তিনিও তোমার পক্ষে থেকে যুদ্ধ করবেন।

কাম্বোজ দেশের রাজা সুদক্ষিণ একজন রথী। যুদ্ধে পাণ্ডবেরা এই রথীশ্রেষ্ঠের পরাক্রম দর্শন করবে।

মাহিষ্মতীপুরীবাসী নীলরাজা একজন রথী। ইনিও প্রবল যুদ্ধ করবেন। পূর্বে সহদেব এঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছে। সুতরাং ইনিও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রবল যুদ্ধ করবেন।

অবন্তীদেশীয় বিন্দ—অনুবিন্দকে আমি এক একজন রথী বলে বোধ করি। রণাঙ্গনে এঁরা যমের ন্যায় বিচরণ করবেন।

ত্রিগর্তদেশীয় পঞ্চভ্রাতাকে আমি প্রধান রথী বলে মনে করি। বিরাটরাজার সঙ্গে যুদ্ধে এঁরা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তার প্রতিশোধ এঁরা গ্রহণ করবেন।

তোমার এবং দুঃশাসনের পুত্রদ্বয়কে আমি রথি বলে মনে করি।

মহাতেজা দণ্ডধার, কোশলদেশীয় রাজা বৃহদ্বল, এঁরাও রথীশ্রেষ্ঠ। রয়েছেন দ্রোণ এবং কৃপ, তোমার মাতুল রথী শকুনি, মহারথ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা। মহারথ অশ্বত্থামা ইচ্ছা করলে ত্রিভুবন দগ্ধ করতে পারেন।

এঁরা ছাড়াও রয়েছেন মহারথ পৌরব, রথী সত্যশ্রবা, বৃহদ্বল, কর্ণের পুত্র বৃষসেন, জলসন্ধ, অতিরথ বাহ্লিক, মহারথ সত্যবান, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ, প্রাগজ্যোতিষ নগরের অধিপতি ভগদত্ত, রথী অচল ও বৃষক। আর রয়েছে নিচ কর্ণ যাকে আমি অর্ধরথী বলে মনে করি।

দ্রোণও ভীষ্মকে সমর্থন করে বললেন, গঙ্গাপুত্র যা বললেন তা সত্য। কর্ণ অহঙ্কারী, প্রত্যেক যুদ্ধেই একে পলায়ন করতে দেখা যায়। আমার মতেও কর্ণ অর্ধরথ।

ভীষ্মের মন্তব্য শ্রবণ করে কর্ণ ক্রুদ্ধ স্বরে ভীষ্মকে বলল, হে কুরুপিতামহ! আপনি সর্বদা আমাকে তাড়না এবং অপমান করে থাকেন। দুর্যোধনের জন্যেই আমি এসব সহ্য করি। আপনি আমাকে কাপুরুষ বলেই মনে করেন। এসব নিছক বিদ্বেষ। আপনি সর্বদাই কৌরবদের অহিত কামনা করেন এবং আমার ও দুর্যোধনের মধ্যে ভেদ ঘটাবার জন্যে সচেষ্ট। হে দুর্যোধন! তুমি ভীষ্মকে পরিত্যাগ কর। কারণ ভীষ্ম তোমার অনিষ্টকারী। আমিই পাণ্ডবদের প্রতিহত করব। কিন্তু রাজা, আমি একক যুদ্ধে পাণ্ডবদের সংহার করব আর যশোলাভ করবে এই বৃদ্ধ সেনাপতি। তাই ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না। ভীষ্ম নিহত হলে আমি পাণ্ডবপক্ষীয় সব মহারথের সঙ্গেই যুদ্ধ করব।

প্রত্যুত্তরে ক্রুদ্ধ ভীষ্ম নানান কথা বলার পর বললেন যে, তোর জন্যেই এই গুরুতর অনর্থ, কৌরবগণের ধ্বংসের সময় উপস্থিত হয়েছে। যদি পুরুষ হোস তবে তা নিবৃত্ত করার চেষ্টা কর। তুই সবসময়ে অর্জুনের প্রতিস্পর্ধা। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি তা দর্শন করব।

দুর্যোধন বাধা দিয়ে বলল, হে পিতামহ! এখন কেবলমাত্র আমার মঙ্গলের কথা চিন্তা করুন। আপনারা দু'জনেই আমার পরম সাহায্যকারী। এখন আপনি বিপক্ষের রথী, অতিরথের নামগুলি বলুন।

ভীষ্ম বললেল, যুধিষ্ঠির স্বয়ং একজন রথী। ভীম একাই আটজন রথীর তুল্য। এছাড়াও রয়েছে নকুল আর সহদেব। পাণ্ডবদের সকলের শরীরই সিংহের ন্যায় দৃঢ় আর সকলে মহাবল এবং পরম ধার্মিক। অর্জুনের মতো কোনো রথী ছিল না—হবেও

না। কেবলমাত্র আমি আর দ্রোণই অর্জুনের সম্মুখে গমন করতে সমর্থ। অপর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নেই। অর্জুন উদ্যোগী যুবা, নিপুণ। কৃষ্ণ তার সহায়।

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র মহারথ, বিরাট রাজার পুত্র উত্তর একজন প্রধান রথী। অভিমন্যু একজন অতিরথ। অতিরথ সাত্যকি। উত্তমৌজা ও যুধামন্যু প্রধান রথী। বিরাট ও দ্রুপদ মহারথ। শিখণ্ডী একজন প্রধান রথী। অতিরথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদিরাজ শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু একজন মহারথ। জয়ন্ত, অমিতৌজা ও সত্যজিৎ প্রত্যেকেই মহারথ। অজ ও ভোজ মহারথ। কেকয়-দেশীয় পঞ্চভ্রাতা সকলেই প্রধান রথী। কাশীরাজকুমার সূর্যদত্ত, রাজা নীল, শঙ্খ ও মদিরাশ্ব সকলেই প্রধান রথী। বার্দ্ধক্ষেমি একজন মহারথ। রাজা চিত্রায়ুধ একজন শ্রেষ্ঠ রথী। চেকিতান ও সত্যধৃতি মহারথ।

শ্রেণিমান ও বসুদাম রাজা অতিরথ। রোচমান একজন মহারথ। পাণ্ডবগণের মাতুল কুন্তিভোজদেশীয় মহাধনুর্ধর পুরুজিৎ একজন অতিরথ। ঘটোৎকচ একজন অতিরথ।

সুতরাং হে রাজা! পাণ্ডবগণও দুর্বল নয়। তাঁদের বীরেরাও রণাঙ্গনে কৃতান্তের মতো বিচরণ করবেন। তুমি জেনে রাখ, শিখণ্ডী এবং পাণ্ডবদের আমি বধ করব না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষের প্রধান প্রধান বীরগণের নাম আমি উল্লেখ করলাম। আমি যুদ্ধে জয় কিংবা মৃত্যু কামনা করে মায়াবিৎ ও জয়াভিলাষী সেই সকল ভয়ঙ্কর বীরদের সঙ্গে সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করব।

রথীশ্রেষ্ঠ চক্রধারী কৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন সন্ধ্যাকালে চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় মিলিত হয়ে রণক্ষেত্রে আগমন করবেন। আমার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত পতিত হবে—ততদূর পর্যন্ত অর্জুন ও কৃষ্ণকে এবং পাণ্ডবপক্ষের বীরদের নিবারণ করব। আমি আবার বলছি,

যুদ্ধে যে সমস্ত রাজন্যকে পাব—তাঁদের সকলকে বধ করব—কিন্তু পাণ্ডবদের নয়। আর বধ করব না শিখণ্ডীকে। সে স্ত্রী যোনী থেকে পুরুষ যোনী প্রাপ্ত হয়েছে। নারীর ওপর আমি অস্ত্রাঘাত করি না। অতঃপর দুর্যোধনের অনুরোধে ভীষ্ম শিখণ্ডীর জন্ম সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী ব্যক্ত করলেন। বললেন, শিখণ্ডীই পূর্ব জন্মের অম্বা। প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত সে দ্রুপদগৃহে জন্ম লাভ করেছে। অম্বার জন্যেই আমাকে আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু জামদগ্নি রামের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়।

সমস্ত কিছু প্রশ্ন করার পর দুর্যোধন ভীষ্মকে আরও একটি বিচিত্র প্রশ্ন করল।—হে পিতামহ! পাণ্ডবদের সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা—যাদের অর্জুন-ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ মহাবলেরা রক্ষা করবেন বলে কৃতসংকল্প, সেই সেনারাশিকে আপনারা কে কত সময়ের মধ্যে নিঃশেষ করতে সক্ষম?

ভীষ্ম বললেন, তোমার এই কৌতূহল স্বাভাবিক। তবে শোন, শাস্ত্র বলে সরল লোকের সঙ্গে সরল ভাবেই যুদ্ধ করবে—কূট যোদ্ধার সঙ্গে কূট ভাবে। আমি আমার নিজের ভাগ কল্পনা করে নিয়ে—প্রতিদিন সেই ভাগকে সংহার করব। অর্থাৎ আমি প্রতিদিন দশ সহস্র যোদ্ধাকে ও এক সহস্র রথীকে বধ করব। এই নিয়মেই আমি পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয় করব। এইভাবে যদি আমি যুদ্ধ করি তবে এক মাসের মধ্যেই আমি পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করতে সক্ষম হব!

ভীষ্মের ক্ষমতা শ্রবণ করার পর দুর্যোধন আচার্য দ্রোণকে প্রশ্ন করল, হে আচার্য! আপনি কতদিনে?

দ্রোণ মৃদু হাস্য করে বললেন, হে রাজা! আমি বৃদ্ধ হয়েছি। তবে আমিও গঙ্গাপুত্রের মতো এক মাসের মধ্যেই এই সেনা নিঃশেষ করতে সক্ষম।

অতঃপর আচার্য কৃপ বললেন, তিনি দুই মাসে। অশ্বত্থামা বলল, আমি দশদিনে পাণ্ডব সৈন্য ক্ষয় করতে সক্ষম। কর্ণ

বলল—পাঁচ দিনে।

কর্ণের বাক্য শ্রবণ করে ভীষ্ম অট্টহাস্য করে বললেন, কর্ণ তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত বাণ-শঙ্খ-ধনুর্ধারী কৃষ্ণসহচর এবং রথারোহণপূর্বক আগত অর্জুনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হচ্ছ—ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এমন আত্মশ্লাঘা প্রচার করতে পার। বাস্তবে যে অন্যরূপ ঘটবে তাতে আমি স্থির নিশ্চয়।

দুর্যোধনের সঙ্গে ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখদের এই সব কথোপকথন গুপ্তচর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের কাছে নীত হল। যুধিষ্ঠির কৌতূহলী হয়ে অর্জুনকে সব ব্যক্ত করে প্রশ্ন করলেন, হে পার্থ! তুমি কত দিনে কৌরবদের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংস করতে সক্ষম?

অর্জুন কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল, হে মহারাজ! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখেরা সকলেই মহাত্মা এবং অস্ত্রে সুনিপুণ। তাতে তাঁরা যে সময়সীমার কথা বলেছেন তা সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। তবে আপনাকেও আমি উদ্বিগ্ন অবস্থায় অপেক্ষা করাতে ইচ্ছুক নই। তাই আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আমি বলতে পারি, কৃষ্ণকে সারথি করে আমি একক রথে কৌরবসেনাকে নিমেষমাত্র সময়ে ধ্বংস করতে সক্ষম। কিরাতরূপী মহাদেব—আমাকে পাশুপাত নামে যে ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রদান করেছিলেন, তা আমার কাছে বর্তমান। এ তথ্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ কেউই অবগত নন। তবে যুদ্ধে দিব্যাস্ত্র দ্বারা সাধারণ যোদ্ধাকে বধ করা উচিত নয়। আমরা সরলভাবে যুদ্ধ করেই বিজয় লাভ করব। আপনার স্বপক্ষে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ অবস্থান করছেন। এঁরা সকলেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। এঁরা সকলেই বেদ অধ্যয়নের পর যজ্ঞান্তে স্নান করেছেন এবং কোনও যুদ্ধে পরাজিত হন নি। এঁরা দেবসৈন্য সংহার করতেও সমর্থ।

শিখণ্ডী, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, যুধামন্যু,

উত্তমৌজা, যুদ্ধে ভীষ্ম ও দ্রোণের তুল্য বিরাট ও দ্রুপদ, মহাবাহু শঙ্খ, মহাবল ঘটোৎকচ, তার পুত্র অঞ্জনপর্বা এবং মহাবাহু-যুদ্ধ নিপুণ সাত্যকি আপনার সহায়। এছাড়াও রয়েছে অভিমন্যু এবং পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র।

সকলকে পরিত্যাগও যদি করি—তবে আপনি একাকীই সকলকে ধ্বংস করতে সমর্থ। কারণ আপনার ক্রোধদীপ্ত নয়ন যার ওপর পতিত হবে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করে মহাতেজা কৃষ্ণ বললেন, হে ধর্মরাজ! আপনি মিথ্যাই উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। বিস্মৃত হবেন না যে, আপনার পক্ষে সর্বোত্তম শক্তি হচ্ছে ধর্ম। পাণ্ডবগণ ধর্ম কর্তৃক রক্ষিত। বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

নগরসমূহ সব শূন্য। কেবল বালক, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোকেরাই রয়ে গিয়েছিল। সমর্থ সব পুরুষ হয় পাণ্ডবসৈন্যদলে আর নয় কৌরবদলে।

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম অংশে সন্নিবেশিত হয়েছিল পাণ্ডব-পটমণ্ডপ। আর পূর্বদিকে কৌরব। যুদ্ধের পূর্বে যুদ্ধের নিয়মাবলী প্রস্তুত করার জন্যে কৌরব, পাণ্ডব এবং সোমকেরা মিলিত হলেন। নানান বিচার বিমর্শের পর স্থির হল -- যুদ্ধ শেষে আবার প্রীতিময় সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। কেউ একে অন্যকে ছলনা করবে না।

বাক্য যুদ্ধ উপস্থিত হলে বাক্য দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ হবে। যারা সৈন্যদল ত্যাগ করবে তাদের হত্যা করা হবে না। রথী—রথীর সঙ্গে, গজারোহী—গজারোহীর সঙ্গে, অশ্বারোহী—অশ্বারোহীর সঙ্গে এবং পদাতিক—পদাতিকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

যোগ্যতা, ইচ্ছা, উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে বিপক্ষকে সংহার করা হবে। কিন্তু বিহ্বল লোককে বধ করা যাবে না।

অন্যের সঙ্গে যুদ্ধমগ্ন, শরণাগত, পরাঙ্মুখ, ক্ষীণশস্ত্র ও কর্মহীন লোককে কখনও আঘাত করা হবে না।

স্তুতিপাঠক, ভারবাহী, অস্ত্রদাতা এবং ভেরী ও শঙ্খ প্রভৃতির বাদ্য-বাদকগণের ওপরে কোনও আঘাত করা যাবে না।

যুদ্ধকাল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। নিশীথে যুদ্ধ হবে না।

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস পাণ্ডব এবং কৌরবসৈন্য পরিদর্শন করে এসে ভীত, ত্রস্ত, শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, পুত্র! তোমার পুত্রগণ ও অন্যান্য রাজগণের কাল নিকটবর্তী হয়েছে। এর জন্যে তুমি শোক কোরো না। তুমি যদি এই যুদ্ধ দর্শন করার ইচ্ছে করে থাক তবে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করব। আর জ্ঞাতিবধ দেখার ইচ্ছা যদি না কর তবে সঞ্জয়ের কাছে যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরো। সঞ্জয় সব কিছু দর্শন করতে পারবে এবং কোনও কিছুই তার অগোচরে থাকবে না। সঞ্জয় তোমাকে যুদ্ধ বিবরণ দান করবে।

এই যুদ্ধ দৈবের ঘটনা। যে পক্ষে ধর্ম—সেই পক্ষেরই বিজয়। এই যুদ্ধে গুরুতর ক্ষয় ক্ষতি ঘটবে। চতুর্দিকে তারই দুর্লক্ষণ।

অতঃপর বেদব্যাস জ্যোতিষ লক্ষণসমূহ বর্ণনা করে বললেন, পৃথিবীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে। বিষণ্ণ বেদব্যাস নীরব হয়ে ধ্যানস্থ হলেন।

কিছুকাল ধ্যানস্থ থাকার পর বেদব্যাস বললেন, কাল জগৎ সংহার করে আবার কালই জগৎ সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে কোনো বস্তুই চিরস্থায়ী নয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এরপর ধৃতরাষ্ট্রকে প্রচুর জ্ঞান দান করে বিমর্ষ চিত্তে বিদায় নিলেন।

শ্রীমদ্ভগবত গীতা

প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ ধর্মস্থান কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় সমবেত হয়ে যুদ্ধ বিষয়ে প্রথমে কী করেছিলেন ?

সঞ্জয় বললেন, রাজা দুর্যোধন তখন পাণ্ডবগণের সৈন্যাদিগকে ব্যূহরূপে সন্নিবেশিত দেখে দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়ে বললেন, আচার্য! আপনি পাণ্ডবগণের এই মহাসেনার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দ্রুপদ রাজার পুত্র এবং আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সেনাকে ব্যূহরূপে সন্নিবেশিত করেছেন।

যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের তুল্য অনেক মহাধনুর্ধর বীর এই সৈন্য মধ্যে রয়েছেন। যথা—মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবান কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্যবান উত্তমৌজা, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং ঘটোৎকচ প্রভৃতি। এঁরা সকলেই মহারথ।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমাদের পক্ষে যে সকল শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আছেন, আপনি তাঁদের নাম শ্রবণ করুন। আর আমার সৈন্যের যাঁরা পরিচালক হয়েছেন আপনার জ্ঞাতার্থে তাঁদের নামও আমি প্রকাশ করছি।

যুদ্ধবিজয়ী স্বয়ং আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথই হচ্ছেন বিশিষ্টতম।

শল্য ও কৃতবর্মা প্রভৃতি আরও বহু বীর আমার জন্যে জীবন ত্যাগে উদ্যত হয়েছেন এবং তাঁরা সকলেই নানাবিধ অস্ত্রধারী ও যুদ্ধে সুনিপুণ।

আমাদের এই সৈন্য সংখ্যায় অধিক, বিশেষত ভীষ্ম এই

বাহিনীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করছেন ! আর পাণ্ডবদের এই সৈন্য সংখ্যায় অল্প এবং ভীম তাদের রক্ষা করছেন।

আপনারা সকলেই আমাদের ব্যূহের সকল পথে আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হয়ে ভীষ্মকে সকল দিক থেকে রক্ষা করতে থাকুন।

কুরুকুল বৃদ্ধ প্রতাপশালী ভীষ্ম তখন দুর্যোধনের মনে আনন্দ সৃষ্টি করে উচ্চৈস্বরে সিংহনাদ করে শঙ্খ ধ্বনি করলেন।

তারপরে বাদ্যবাদকেরা শঙ্খ, ভেরি, পণব, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি করল।

অতঃপর কৃষ্ণ ও অর্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত উত্তম রথে আরোহিত হয়ে তাঁদের উত্তম শঙ্খের ধ্বনি করলেন।

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য এবং অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খের ধ্বনি করেছিল। ক্রমে ভীমকর্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক শঙ্খের, যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খের, নকুল সুঘোষ শঙ্খের এবং সহদেব মণিপুষ্প নামক শঙ্খের ধ্বনি করলেন।

মহারাজ ! তারপর মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এবং মহাবাহু অভিমন্যু এঁরাও নানাদিক থেকে পৃথক পৃথক ভাবে শঙ্খ ধ্বনি করলেন।

সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করতে থেকে ধার্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় যেন বিদীর্ণ করল।

তারপর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ধার্তরাষ্ট্রগণকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত দর্শন করে—ধনু উত্তোলন করলেন এবং অস্ত্রক্ষেপ শুরু করার পূর্বে কৃষ্ণকে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ ! আমার রথটিকে উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থানে রক্ষা কর !

যুদ্ধ করার ইচ্ছায় প্রস্তুত এই যোদ্ধাদের আমি যে পর্যন্ত না উত্তমরূপে অবলোকন করে নিই—সেই পর্যন্ত তুমি রথটিকে মধ্যবর্তী

স্থানে রাখ।

যাঁরা দুর্বুদ্ধি-দুর্যোধনের প্রিয় কার্য করবার ইচ্ছায় এই যুদ্ধে এসেছে—সেই যুদ্ধার্থীদের আমি একবার উত্তম রূপে দর্শন করে নিতে ইচ্ছুক।

সঞ্জয় বললেন, ভরতনন্দন! অর্জুন এমন বললে, কৃষ্ণ উভয় সৈন্যদলের মধ্যবর্তী স্থানে ভীষ্ম, দ্রোণ, এবং অন্য সকল রাজার সম্মুখে উত্তম রথটিকে রক্ষা করে অর্জুনকে বললেন, সমবেত কৌরবগণকে দর্শন কর, অর্জুন।

অর্জুন দেখলেন, পিতৃপর্যায়, পিতামহ পর্যায়, আচার্য, মাতুল স্থানীয়, ভ্রাতা-পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদগণের স্থানীয় যোদ্ধারা উভয় সৈন্যদলের মধ্যে অবস্থান করছেন।

অর্জুন উভয় সৈন্যদলের মধ্যে উপস্থিত সেইসব ব্যক্তি সকলকে দর্শন করে অত্যন্ত দয়াবিষ্ট ও বিষণ্ন হয়ে বললেন, হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করার ইচ্ছায় সমাগত এই বন্ধুবর্গকে দর্শন করে আমার অঙ্গসকল অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে—মুখ শুষ্ক হয়ে আসছে। আমার শরীরেও রোমাঞ্চ হচ্ছে। গাণ্ডীব হস্তচ্যুত হচ্ছে—হস্তচর্মে যেন প্রদাহ উপস্থিত হচ্ছে। কৃষ্ণ! আমি যেন আর দণ্ডায়মান থাকতে পারছি না। আমার হৃদয় প্লাবিত হচ্ছে এবং সমস্ত লক্ষণসমূহ যেন প্রতিকূল বলে বোধ হচ্ছে। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে বধ করার মধ্যে আমি কোনও মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি না। আমি জয় চাই না। রাজ্য চাই না। সুখ চাই না। হে গোবিন্দ! আত্মীয় স্বজনকে বধ করে রাজ্য ভোগ করে কী সুখ আমরা লাভ করব? আমরা যাদের জন্যে রাজ্য, ভোগ ও সুখ কামনা করি, এই সেই আচার্যগণ, পিতৃস্থানীয়, পুত্রস্থানীয়, পিতামহস্থানীয়, মাতুলস্থানীয়, শ্বশুরস্থানীয়, পৌত্রস্থানীয়, শ্যালকস্থানীয় ও অন্যান্য সম্বন্ধিগণ প্রাণ ও ধনের আশা ত্যাগ করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত রয়েছেন! হে মধুসূদন! এঁরা যদি

আমাদের বধও করেন—তবু আমি কেবল পৃথিবীর রাজ্যের জন্যে কেন—সমগ্র ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্যেও এঁদের বধ করার কামনা করি না। হে জনার্দন! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করে আমাদের কী আনন্দ হবে? বরং এই আততায়ীগণকে বধ করলে আমাদের পাপই হবে। অতএব কৃষ্ণ! আমরা বান্ধবগণের সঙ্গে ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ করতে পারি না। কারণ আত্মীয় স্বজনকে বধ করে আমরা কেমন করে সুখী হব?

হে জনার্দন! লোভে ধার্তরাষ্ট্রগণের বিবেক লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং ওরা বংশনাশের পাপ ও মিত্রদ্রোহের পাপ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আমরা তা উপলব্ধি করতে পারছি। সুতরাং এই পাপ থেকে উদ্ধার পাবার প্রচেষ্টা কি আমরা করব না? কুলক্ষয় হলে পরম্পরাযুক্ত কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং কুলধর্ম নষ্ট হয়ে গেলে পাপ এসে কুলের অবশিষ্ট সকল বালককে আক্রমণ করে।

হে বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ! পাপ এসে আক্রমণ করলে কুলবধূরা অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ে এবং দূষিত কুলবধূ থেকে বর্ণসংকরের জন্ম হয়। সেই বর্ণসংকরেরা বংশনাশক ব্যাভিচারী পুরুষগণের এবং বংশের পূর্ব পুরুষগণের নরক ভোগের জন্যেই জন্মে থাকে। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ প্রভৃতি কার্য লুপ্ত হওয়ায় এই বর্ণসঙ্করগণের পূর্ব পুরুষেরা নরকে পতিত হন। কুলনাশক ব্যাভিচারী পুরুষগণের বর্ণসঙ্করকারক এই সকল দোষে চিরন্তন জাতিধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমাদি নষ্ট হয়ে যায়। হে কৃষ্ণ! কুল ধর্ম প্রভৃতি নষ্ট হলে নিশ্চয় মানুষের নরকবাস হয়। হায়! কি আশ্চর্য! আমরা গুরুতর পাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি—রাজ্য সুখের লোভে আত্মীয় স্বজনকে বধ করতে উদ্যত হয়েছি। আমি অস্ত্র ধারণ করব না। কিংবা বিপক্ষেরা অস্ত্রাঘাত করলেও তাতে বাধা দেব না। এই অবস্থায় অস্ত্রধারী ধার্তরাষ্ট্রেরা যুদ্ধে যদি আমাকে বধ করে তাও আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

সঞ্জয় বললেন, অর্জুন শোকে অস্থির চিত্ত হয়ে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করে রথের ওপর উপবেশন করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্জুনের হৃদয়ে দয়ার প্লাবন উপস্থিত হল। অশ্রুজল তাঁর নয়ন যুগলকে ব্যপ্ত ও আকুল করে তুলল। ক্রমে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তখন কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—হে অর্জুন! এই সঙ্কট সময়ে তোমার এই মোহ উপস্থিত হল কেন? এটি ক্ষত্রিয় ধর্ম নয়। স্বর্গজনক বা কীর্তিজনকও নয়।

হে পৃথানন্দন! তুমি কাতর হোয়ো না। এই কাতরতা তোমার সঙ্গত নয়। অতএব হে শত্রুতাপন! তুমি তোমার হৃদয়ের এই ঘৃণিত দুর্বলতা পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হও।

অর্জুন বললেন, হে মধসূদন! আমি যুদ্ধে কেমন করে পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণকে বাণ দ্বারা প্রতিপ্রহার করব? মহানুভব গুরুজনগণকে বধ না করে ইহলোকে ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করাও শ্রেয়। অর্থকামী গুরুজনগণকে বধ করে ইহলোকে তাঁদের শোণিতলিপ্ত সম্পদই আমায় ভোগ করতে হবে!

আমরা ধার্তরাষ্ট্রগণকে জয় করব কিংবা ওরা আমাদের জয় করবে। কিন্তু কোনটি যে উত্তম হবে তা বোধগম্য হচ্ছে না। যাদের বধ করে জীবিত থাকার ইচ্ছা করি না সেই ধার্তরাষ্ট্ররাই সম্মুখে রয়েছে!

কৃষ্ণ, মনের দুর্বলতা আমার স্বাভাবিক তেজস্বিতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মন ধর্ম নিরূপণ করতে সমর্থ হচ্ছে না। সুতরাং আমার পক্ষে যা নিশ্চিত মঙ্গলজনক তা আমাকে বল। আমি তোমার শিষ্য এবং শরণাগত। অতএব তুমি আমাকে উপদেশ দান কর।

যুদ্ধ জয় করে নিষ্কণ্টক ও সমৃদ্ধশালী পৃথিবীর রাজত্ব এমনকি স্বর্গের রাজত্ব লাভ করলেও আমার ইন্দ্রিয় শোক নষ্ট করতে পারে এমন কোনো উপায়ই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, শত্রুসন্ত্রাস অর্জুন গোবিন্দকে এরূপ বলার পর, আমি যুদ্ধ করব না—এই অভিমত ব্যক্ত করে নীরব রইলেন।

অতঃপর কৃষ্ণ একটু হাস্য করে উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থানে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে এই কথাগুলি বললেন।

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! তুমি রণক্ষেত্রে আগমন করার পরেও শোকের অযোগ্য ব্যক্তিগণের জন্যে শোক করছ। আবার জ্ঞানের কথাও বলছ। দেখ—জ্ঞানীরা মৃত বা জীবিত ব্যক্তিগণের জন্যে শোক করেন না।

আমি পূর্বে কখনও ছিলাম না—এমন নয়। তুমিও পূর্বে ছিলে না তাও নয়। এই রাজাগণ পূর্বে ছিলেন না—তাও নয়। আবার আমরা সকলে এর পরে থাকব না—তাও নয়। বীরের এই স্থূল দেহে যেমন ক্রমশ বাল্য, যৌবন, ও বার্ধক্য উপস্থিত হয় তেমন অন্য স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জ্ঞানী লোক তাতে শোক করেন না। হে কুন্তীনন্দন! বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কই শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ উৎপাদন করে। সেই বিষয়—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধের উৎপত্তি যেমন আছে—বিনাশও আছে। সুতরাং, তা অনিত্য। অতএব তার দুঃখ তুমি সহ্য কর।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাঁর নিকট সুখ ও দুঃখ সমান এবং যাঁর জ্ঞানোদয় হয়েছে—সেই যে পুরুষ যাকে বিজয়, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ চঞ্চল করে তোলে না, সেই পুরুষই মোক্ষ লাভের যোগ্য।

অসৎ পদার্থের সব সময়ে অস্তিত্ব থাকে না আবার সৎ পদার্থেরও ধ্বংস হয় না। তত্ত্বদর্শীরা এই দ্বিবিধ পদার্থের স্বরূপ দেখেছেন।

হে অর্জুন! যিনি এই সমগ্র শরীর ব্যপ্ত করে রয়েছেন, সেই জীবাত্মাকে অবিনাশী বলে জেনো! কারণ, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে ভেদ না থাকায় কোনও পদার্থই এই জীবাত্মার বিনাশ করতে পারে না।

জ্ঞানীরা বলেছেন, সর্বদা একরূপ, অবিনাশী ও অপরিমেয় জীবাত্মার এই দেহগুলিই বিনশ্বর। অতএব তুমি স্বধর্ম রক্ষার জন্যে যুদ্ধ কর।

যিনি এই জীবাত্মাকে হন্তা বলে জানেন কিংবা যিনি জীবাত্মাকে হত বলে মনে করেন—তাঁরা দুজনেই আসল বিষয়টি জানেন না। কারণ এই জীবাত্মা অন্যকে বধ করে না, অন্য কর্তৃক হতও হয় না।

আত্মা কখনও জন্মে না—মৃতুও বরণ করে না। কিংবা জন্ম নিয়েও আবার থাকে না। এই আত্মা জন্মহীন, চিরকাল একরূপ, এবং সর্বদা সমান থাকে ও নিকটে থাকে। অতএব স্থূল দেহের বিনাশ ঘটলেও আত্মাকে বিনাশ করা যায় না।

হে অর্জুন! যে লোক এই আত্মাকে অবিনাশী – চিরকাল একরূপ, জন্মহীন ও ক্ষয়হীন বলে জানে, সেই ব্যক্তি কোনো প্রকারে আত্মাকে বধ করাতে পারে বা বধ করতে পারে?

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও তেমন জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে।

অস্ত্র আত্মাকে ছেদন করতে পারে না। অগ্নি একে দগ্ধ করতে পারে না। জল একে আর্দ্র করতে পারে না বা বায়ু আত্মাকে শুষ্ক করতে পারে না। এই আত্মা চিরকাল একরূপ, সর্বব্যাপী, স্থির, নিষ্ক্রিয় এবং উৎপত্তি-বিনাশহীন।

বেদ ও জ্ঞানীরা বলেন—আত্মা অস্ফুট, অচিন্তনীয় এবং যাকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করা যায় না। অতএব অর্জুন! তুমি আত্মার এই অবস্থা জেনে ভীষ্ম প্রভৃতির আত্মার জন্যে শোক করতে

পার না।

মহাবাহু অর্জুন! তুমি যদি এরূপও মনে কর যে, আত্মার চিরকালই জন্ম আছে এবং চিরকালই মৃত্যু আছে, তথাপি ভীষ্ম প্রভৃতির আত্মার জন্যে শোক করতে পার না।

উৎপন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই যখন মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত্যুনিশ্চিত ব্যক্তিরও যখন জন্ম নিশ্চিত, তখন সেই অপরিহার্য বিষয়ে তুমি শোক করতে পার না।

ভরতনন্দন! প্রাণীশরীরে প্রথম অবস্থা অস্পষ্ট, মধ্য অবস্থা স্পষ্ট, আবার মৃত্যুর পরের অবস্থা অস্পষ্ট। সুতরাং সেই মৃত্যু বিষয়ে বিলাপ করার প্রয়োজন কী?

কোনও লোক এই আত্মাকে আশ্চর্যের ন্যায় দেখে। অপর কোনও ব্যক্তি সেই রূপই আশ্চর্যের ন্যায় বলে। অন্য লোক আশ্চর্যের ন্যায় শোনে এবং কোনও লোক শুনেও একে বুঝতে পারে না।

সমস্ত প্রাণীর শরীরে বিদ্যমান এই জীবাত্মা চিরকালই অবধ্য। সুতরাং তুমি সমস্ত প্রাণীর জন্যেই শোক করতে পার না।

হে অর্জুন! তুমি আপন ক্ষত্রিয় ধর্মের পর্যালোচনা করেও বিচলিত হতে পার না। কারণ ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের অন্য কোনও প্রশস্ত কর্ম নেই।

হে অর্জুন! উদ্‌ঘাটিত স্বর্গদ্বার স্বরূপ এবং অস্বেচ্ছায় উপস্থিত এইরূপ যুদ্ধকে ক্ষত্রিয়েরা সুখী হয়েই গ্রহণ করেন।

নানা-দিগ-দেশীয় লোকেরা তোমার নিন্দার কথা বলবে। গৌরবময় লোকের নিন্দা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক।

স্বপক্ষ ও বিপক্ষের মহারথ বীরেরা মনে করবেন যে, তুমি ভয়-বশতই যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছ। তুমি যাদের নিকট গৌরবের পাত্র ছিলে—তাদের নিকট অবজ্ঞার পাত্র হবে।

তোমার শত্রুরা তোমার শক্তির নিন্দা করতে শুরু করে অনেক

অবাক্য ব্যবহার করবে। তার চেয়ে অধিক দুঃখ আর কী আছে ?

হে অর্জুন! তুমি সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হলে স্বর্গ লাভ করবে এবং জয় করতে পারলে রাজ্যলাভ করবে। সুতরাং যুদ্ধের জন্যে কৃতনিশ্চয় হয়ে উঠে দাঁড়াও। সুখ ও দুঃখ, লাভ ও ক্ষতি, জয় এবং পরাজয়—এগুলিকে সমান ভেবে তারপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এরূপ করলে আর পাপভাগী হবে না।

হে অর্জুন! তোমার নিকট এই ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বললাম। এখন কর্মজ্ঞানের বিষয় শ্রবণ কর। যে জ্ঞান লাভ করে তুমি কর্মবন্ধ ত্যাগ করবে।

এই জগতে নিষ্কাম কর্মও নিষ্ফল হয় না, এবং এতে অঙ্গহানি ঘটলেও পাপ হয় না সামান্য কর্ম করাও মহাভয় থেকে রক্ষা করে।

হে অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মে একমাত্র নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি চলতে থাকে আর নিশ্চয়শূন্য ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি বহু প্রকারের হয় বলে তা অনন্ত।

এমন অনেক লোক আছে যারা বেদের একদেশদর্শী বলে কেবল স্তুতিবাদেই নিরত থাকে। স্বর্গকেই শ্রেষ্ঠ অভীষ্ট বলে মনে করে এবং বিষয় সুখ ছাড়া অন্য সুখ নেই—এমন কথাও বলে। তারপর বিষয় সুখ ভোগ এবং তার উপযোগী সম্পদ প্রাপ্তির জন্যে তারা এমন কথাও বলে যা পুষ্পিত বিষলতার ন্যায় আপাতমনোহরা এবং পরিণামে দুঃখজনক। যার দ্বারা অধিক পরিমাণে বিশেষ বিশেষ কাম্যকর্মই অভিহিত হয় এবং যার প্রবর্তনায় মনুষ্য সেই কাম্যকর্মই করতে থাকে। আর সেই কাম্যকর্মের ফলে মানুষের জন্ম-মৃত্যু-দুঃখই চলতে থাকে। সেই কথাগুলি আবার বহুলোকের চিত্ত আকর্ষণ করে এবং তারা সেই অনুসারে বিষয় সুখ ভোগ ও তার উপযোগী সম্পদের ওপর আসক্ত হয়ে পড়ে।

সুতরাং তাদের সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধির উপযোগী হয় না বলেই আমি মনে করি।

হে অর্জুন! কর্মপ্রতিপাদক বেদবাক্যসমূহের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে, প্রকৃতি সম্ভূত জগৎ ও সেই জগতের ব্যাপারগুলি। অতএব তুমি সেই জগৎ ও জগতের ব্যাপার ত্যাগ করে ব্রহ্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। সেইজন্যে তুমি শীত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব দুঃখ সহ্য কর। সর্বদা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হও। যা পাও নি তা পাবার চেষ্টা কোরো না। কিংবা যা পেয়েছ তা রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট হয়ো না এবং মুক্তি লাভের জন্যে যত্নবান হও।

সকল দিকে জলরাশিযুক্ত সমুদ্রে মানুষের যতগুলি জল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কর্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদে ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকের ততগুলি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

হে অর্জুন! কর্মেই তোমার অধিকার হোক। তার-ফলে যেন কখনও অধিকার না হয়। অর্থাৎ তুমি কামনাপূর্বক কর্ম করে তার ফল সৃষ্টি কোরো না। আবার কর্ম না করার দিকেও যেন তোমার মন অনুরক্ত না হয়!

হে অর্জুন! তুমি ফলের আসক্তি ত্যাগ করে ফলের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমান থেকে এবং পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থেকে কর্ম করতে থাক। যোগীরা পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকাকেই যোগ বলেন।

হে অর্জুন! আমি পরমেশ্বরকেই আরাধনা করব। এইরূপ বুদ্ধিপূর্বক নিত্যকর্ম করা থেকে কাম্যকর্ম করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অতএব তুমি সেই রকম বুদ্ধিকেই আশ্রয় কর। কারণ যারা কামনা পূর্বক কর্ম করে তারা কৃপণ।

'আমি পরমেশ্বররেই আরাধনা করব' এরূপ বুদ্ধিযুক্ত হয়ে যিনি নিষ্কাম কর্ম করেন তিনি ইহ জীবনেই পুণ্য ও পাপ—এই দু'টিকেই ত্যাগ করতে পারেন। অতএব, অর্জুন! তুমি সেরূপ

যোগাভ্যাসের জন্যে উদ্যোগী হও। কর্ম বিষয়ে সেইরূপ কৌশলের নামই যোগ।

উক্ত রূপ বুদ্ধিযুক্ত মানুষেরা ক্রমশ জ্ঞানী হয়ে কর্মের ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে নিরুপদ্রব ব্রহ্ম লাভ করেন।

হে অর্জুন! তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ দুর্গম দেশ বিশেষ ভাবে অতিক্রম করবে তখন শ্রোতব্য বা শ্রুত বিষয়ের প্রতি তোমার অনাস্থা আসবে।

হে অর্জুন। তোমার বুদ্ধি বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করে সংশয়াপন্ন হয়ে পড়েছে। সুতরাং সেই বুদ্ধিটি যখন বিশ্বাস লাভ করে পরমাত্মার ওপরে স্থির হয়ে থাকবে তখনই তুমি যোগ লাভ করবে।

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! ধ্যানমগ্ন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কী? এবং ধ্যান ভঙ্গ হলে স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক কিভাবে কথা বলেন? কিভাবে উপবেশন করেন? কিভাবেই বা গমন করেন?

কৃষ্ণ বললেন! হে অর্জুন! সাধক যখন মনের সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন এবং নিজের দ্বারা নিজের ওপরেই সন্তুষ্ট থাকেন —তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

দুঃখ উপস্থিত হলেও যার মন বিচলিত হয় না। সুখেও যার স্পৃহা থাকে না, যিনি ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করেছেন, যাঁর নিজের দেহের ওপরেও কোনো অনুরাগ থাকে না এবং যিনি সর্বদাই পরমাত্মারই আলোচনা করেন—সেই সাধককে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

মিত্র ও শত্রুর ওপরে স্নেহ বা দ্বেষ না থাকায় যিনি সেই সেই মিত্র এবং শত্রু পেয়েও আদর বা দ্বেষ করেন না, সেই সাধকের বুদ্ধিই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কচ্ছপ যেমন তার সমস্ত অঙ্গ সঙ্কোচিত করে। সেরূপ সাধক যখন তাঁর কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শব্দ প্রভৃতি বিষয় থেকে

মুক্ত রাখতে পারেন তখনই তাঁর বুদ্ধি পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অন্ধ, বধির প্রভৃতি অক্ষম লোকগণের নিকটে বিষয় ভোগের ইচ্ছা ও শব্দ প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বভাবতই নিবৃত্তি পায়। আর পরব্রহ্ম দর্শন করায় সাধকের নিকট থেকে বিষয়সকল এবং সেগুলির ভোগেচ্ছাও নিবৃত্তি পায়।

হে কুন্তীনন্দন! বুদ্ধি বিক্ষোভজনক ইন্দ্রিয়গণ—বুদ্ধি স্থিরতার জন্যে যত্নবান এবং জ্ঞানী পুরুষের মনকেও বলপূর্বক যখন অপহরণ করে, তখন সেই যোগী পুরুষ সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, সৎপরায়ণ হয়ে কোনো নির্বিঘ্ন স্থানে উপবেশন করবেন। দেখ, ইন্দ্রিয়গুলি যাঁর বশে থাকে, তাঁর বুদ্ধিই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানুষ বিষয়ের চিন্তা করতে থাকলেই তার বিষয়ে আসক্তি জন্মে। সেই আসক্তি থেকে ভোগাভিলাষ উৎপন্ন হয় এবং ভোগাভিলাষ থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

ক্রোধ থেকে গুরুতর মোহ জন্মে। মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ হয়, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ জন্মে এবং বুদ্ধিনাশ থেকে মানুষ নষ্ট হয়।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যার মন বশীভূত হয়, সেই সাধক মনের বশীভূত এবং রাগদ্বেষ বিমুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয়ভোগ করতে থেকেও চিত্তের নির্মলতা লাভ করেন।

চিত্তের নির্মলতা জন্মালে সাধকের সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি পায় এবং শীঘ্র তাঁর বুদ্ধি পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যোগীজনিত চিত্ত-নির্মলতা যার হয় নি—তার বুদ্ধি পরব্রহ্মের দিকে যেতে পারে না কিংবা তার ব্রহ্মধ্যানও হয় না। ব্রহ্মধ্যান না হলে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তিও হয় না এবং সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি না হলে ক্ষণিক সুখই বা হবে কি করে?

ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই আপন আপন বিষয়ে বিচরণ করে। তখন মন যে ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করবে সেই ইন্দ্রিয়ই মানুষের মনকে হরণ করে থাকে। যেমন, বায়ু জলে কর্ণধারহীন নৌকাকে হরণ করে।

অতএব, হে মহাবাহু অর্জুন! অভ্যাস ও বৈরাগ্য যাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে মুক্ত করে—সেই যোগীর বুদ্ধিই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অজ্ঞানী সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যেটি রাত্রি, জ্ঞানী তাতেই জাগরিত থাকেন। আবার সেই অজ্ঞানী প্রাণিরা যাতে জাগরিত থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানীর সেইটিই রাত্রি।

বহুতর নদ, নদী, খাল, বিল, এসে সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করে এবং তার স্থিতি চিরকালই স্থির। এ হেন সমুদ্রে বৃষ্টির জল পতিত হলে যেমন লয় প্রাপ্ত হয়—সেইরূপ জ্ঞানপূর্ণ ও দীর্ঘকাল ব্রহ্মনিষ্ঠ যে যোগীর হৃদয়ে সমস্ত কামনাই প্রবেশ করে লয় প্রাপ্ত হয়—তিনিই শান্তি লাভ করেন। কিন্তু বিজয়-অভিলাষী লোক শান্তি লাভ করতে পারে না।

অভিমান ও মমতাশূন্য যে পুরুষ ভোগ্যসকল পরিত্যাগ করে প্রাপ্তব্য বস্তুতে নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন।

অর্জুন! তোমার নিকট এই ব্রহ্মনিষ্ঠার বিষয় বললাম! মানুষ এই ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করার পর আর মোহিত হয় না এবং অন্তিমকালেও এই ব্রহ্মনিষ্ঠায় থেকে নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার মত যদি এরূপই হয় যে, নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ—তবে আমাকে ভয়ংকর যুদ্ধ কর্মে নিযুক্ত করছ কেন?

তোমার বাক্য যেন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক এবং তার দ্বারা আমার বুদ্ধি মোহিত হচ্ছে। অতএব নিশ্চয় করে বল—যাতে আমার মঙ্গল লাভ হয়।

কৃষ্ণ বললেন, হে নিষ্পাপ অর্জুন! আমি পূর্বে তোমার নিকট দ্বিবিধ লোকের বিষয়ে দু'প্রকার ব্রহ্ম নিষ্ঠার কথা বলেছি—তার মধ্যে জ্ঞানীদের জ্ঞানযোগ এক প্রকার আর কর্মযোগ দ্বিতীয় প্রকার।

মানুষ কর্ম না করে মুক্তি লাভ করতে পারে না কিংবা কেবল সন্ন্যাস দ্বারাও মুক্তি লাভ করে না।

কোনো মানুষ কখনও ক্ষণকালও কর্ম না করে থাকতে পারে না। কারণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণজাত মুক্তিলিপ্সা—কাম ও মোহ প্রভৃতির অধীন মানুষকে সর্বদা কর্ম করিয়ে থাকে।

যে মূঢ় লোক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে মনে-মনে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তা করতে থাকে তাকে কপটচারী বলে।

হে অর্জুন! আর যিনি মনের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রেখে বিষয়ে আসক্ত না হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করে যান—তিনি প্রশংসার পাত্র।

হে অর্জুন! তুমি নিত্য কর্মগুলি করে যাও; কেন না কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা ভাল। তারপর একেবারে কর্ম না করলে তোমার শরীর রক্ষাও যে হবে না।

কেবল ঈশ্বর প্রীতির জন্যে যে কর্ম করা হয় সেই কর্ম ব্যতীত সকল কাম্য কর্মই মানুষের বন্ধন জন্মায়। অতএব অর্জুন! তুমি ফলের আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রীতির জন্যেই কর্ম করতে থাক।

সৃষ্টির প্রথম সময়ে ব্রহ্মা যজ্ঞের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি মানুষ সৃষ্টি করে তাঁদের বলেছিলেন, তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর উন্নতি

লাভ কর। এই যজ্ঞ তোমাদের অভিষ্ট ফল দান করুক।

হে প্রজাগণ! তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে পরিপুষ্ট কর, আবার তাঁরাও তোমাদের পরিপুষ্ট করুক। এইভাবে তোমরা পরস্পরকে পরিপুষ্ট করতে থেকে পরম মঙ্গল লাভ করবে।

যজ্ঞ-পরিপুষ্ট দেবতারা তোমাদের অভীষ্ট ভোগ্য বস্তুসকল দান করবেন। এ অবস্থায় তাঁদের দত্ত বস্তুসকল আবার তাঁদের না দান করে যে লোক নিজে ভোজন করে, সেই লোক তস্করের তুল্য হয়।

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণ—যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। আর যারা নিজের জন্যেই পাক করে এবং তা ভোজন করে—তারা পাপই ভোজন করে। প্রাণিগণের শরীর অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। অন্ন মেঘ থেকে জন্মে, মেঘ যজ্ঞ থেকে উৎপত্তি লাভ করে এবং যজ্ঞ কর্ম থেকে সমুদ্ভূত হয়।

হে অর্জুন! অবগত হও যে, সেই কর্ম বেদ থেকে নিষ্পন্ন হয় এবং বেদ পরব্রহ্ম থেকে আবির্ভূত হয়েছিল। অতএব সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

হে অর্জুন! যে লোক এভাবে বিধাতার প্রবর্তিত চক্র অনুসরণ করে না—সেই ইন্দ্রিয়ভোগী লোকের আয়ু পাপময় এবং জীবন ব্যর্থ।

যে লোক আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁর কর্তব্য কর্ম নেই।

সেই জ্ঞানী লোকের কর্ম দ্বারাও কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। আবার কর্ম না করলেও কোনো পাপও হয় না এবং কোনো বস্তুতেই তাঁর কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

অতএব, হে অর্জুন! তুমি ফলের আসক্তি ত্যাগ করে নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য করতে থাক। কারণ মানুষ ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করলে সে মুক্তি লাভ করে।

হে অর্জুন! জনক রাজা ও অশ্বপতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা কর্ম করেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন। তারপর কর্মবিমুখ লোকেরা কর্মে প্রবৃত্ত হবে—এরূপ আলোচনা করেও তুমি কর্ম করতে পার।

প্রধান লোক যেরূপ যেরূপ আচরণ করেন, ইতর লোকও সেইরূপ সেইরূপ আচরণ করে এবং প্রধান লোক যেটিকে প্রধান বলে স্বীকার করেন—ইতর লোক তারই অনুবর্তন করে।

হে অর্জুন! ত্রিভুবনে আমার কোনো কর্মই কর্তব্য নয় এবং আমি যা পাইনি—তা পাব এমনও আমি চিন্তা করি না। তথাপি আমি কর্মেই প্রবৃত্ত রয়েছি।

হে অর্জুন! আমি যদি আলস্যশূন্য হয়ে কখনও কর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে সকল মানুষই তো আমার পথ অনুসরণ করবে।

তারপর আমি যদি কর্ম না করি তবে এই লোকগুলি উৎসন্নে গমন করবে। আর আমি বর্ণসঙ্করের কারণ হব এবং এই লোকগুলিকে কলুষিত করব।

হে ভরতনন্দন! মূঢ় লোকেরা যেমন কর্মফলে আসক্ত হয়ে কর্ম করে, তেমন জ্ঞানীরাও কর্মফলে আসক্ত না হয়ে লোকগণকে আপন আপন ধর্মে প্রবৃত্ত করাবার ইচ্ছে করে কর্ম করবেন।

জ্ঞানী লোক, কর্মনিরত অজ্ঞানীদের বুদ্ধিভ্রংশতা জন্মাবেন না। বরঞ্চ নিজে কর্ম করতে থেকে মনোযোগ সহকারে তাদের সমস্ত কর্ম করাবেন।

ইন্দ্রিয়গুলিই সমস্ত কার্য করে; তথাপি অহঙ্কারবিমুগ্ধ লোক মনে করে যে আমি করি।

কিন্তু মহাবাহু অর্জুন! যিনি যথার্থরূপে জানেন যে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়জাত কর্মগুলির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য রয়েছে, তিনি মনে করেন—ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। ফলে তিনি

আর কর্মফলে আসক্ত হন না।

অহঙ্কার-বিমূঢ় লোকেরা ইন্দ্রিয়ের কার্যে আসক্ত হয়ে পড়ে। তথাপি জ্ঞানী লোক সেই অসর্বজ্ঞ মূঢ় লোকদিগকে কর্মচ্যুত করবেন না।

হে অর্জুন! তুমি আমাতে মনোনিবেশ করে আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে নিষ্কাম, মমতাশূন্য ও শোকসন্তাপ বিহীন হয়ে যুদ্ধ কর।

যে সব মানুষ আমার বাক্যে বিশ্বাস করে এবং আমার বাক্যে কোনো দোষ আবিষ্কার করে না, তারাও আমার অভিমত কর্ম করে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

হে অর্জুন! আর যারা দোষ আবিষ্কার করে আমার অভিমত কর্মের অনুষ্ঠান করে না, তাদের সকলকে—জ্ঞানশূন্য, বিবেক-হীন ও বিনষ্ট বলে তুমি অবগত হও।

জ্ঞানী লোকও আপন স্বভাবের অনুরূপ কার্য করেন; সুতরাং সকল প্রাণীই আপন আপন স্বভাবের অনুসরণ করে। অতএব শাস্ত্র বা গুরুর উপদেশের বাধা তাদের কী করবে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়েই রাগ ও দ্বেষ রয়েছে। অতএব বুদ্ধিমান লোক সে দু'টির বশীভূত হন না। কারণ সেই দু'টি মানুষের শত্রু।

আপন ধর্মে গুণ না থাকলেও এবং পরধর্ম সর্বাঙ্গসুন্দর করে অনুষ্ঠান করলেও, পরধর্ম থেকে আপন-ধর্ম শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপন ধর্মে নিধনও শ্রেয়। কিন্তু পরধর্ম সর্বদাই ভয়াবহ।

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! মানুষ পাপ করতে ইচ্ছে না করলেও তাকে যেন বলপূর্বক পাপে প্রবৃত্ত করানো হয়। সুতরাং কার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে মানুষ পাপ করে?

কৃষ্ণ বললেন, এই কাম এবং এই ক্রোধ রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়। এদের খাদ্যও অতি প্রচুর এবং এরা মহাপাপও জন্মিয়ে

থাকে। সুতরাং তুমিও এই দু'টিকে পাপ-প্রবর্তক শত্রু বলে অবগত হও।

ধূম যেমন অগ্নিকে, মল যেমন দর্পণকে, জরায়ু যেমন গর্ভকে আবরিত করে, সেরূপ কর্মও জ্ঞানকে আবরিত করে।

হে অর্জুন! যাকে পূর্ণ করা দুষ্কর এবং পূর্ণ করতে না পারলে অগ্নির মতোই যে সন্তপ্ত করে, সেই কামরূপ চিরশত্রুই জ্ঞানীর জ্ঞানকে আবৃত করে।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই ক'টিকে কামের অধিষ্ঠান বলা হয়ে থাকে। সুতরাং কাম এইগুলির দ্বারাই জ্ঞানীর জ্ঞানকে আবৃত করে। জীব মাত্রকেই মোহিত করে।

অতএব ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে জ্ঞানবিজ্ঞাননাশক এই পাপাত্মা কামকে বিনাশ কর।

দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—তিনিই পরমাত্মা।

হে মহাবাহু অর্জুন! এই ভাবে পরমাত্মাকে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিরুদ্ধ করে কামস্বরূপ দুর্ধর্ষ শত্রুকে সংহার কর।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষ্ণ বললেন, আমি প্রথমে এই নিশ্চিত ফলজনক জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ সূর্যের নিকট বলেছিলাম। সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুর নিকট বলেছিলেন। বৈবস্বত মনু আবার তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুর কাছে বলেছিলেন।

এইরূপ পরম্পরা ক্রমে আগত এই যোগকে নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিরাও জেনেছিলেন। কিন্তু শত্রুতাপস অর্জুন! দীর্ঘকাল অতীত হওয়ায় সেই যোগ বর্তমান সময়ে লোপ পেয়েছিল।

হে অর্জুন! তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলে তোমার নিকটেই আজ আমি সেই পুরাতন যোগের কথা বললাম। কারণ এই উত্তম যোগ—গোপনীয়।

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার জন্ম অতি পরে এবং সূর্যের জন্ম অতি পূর্বে। অতএব তুমি যে মনু প্রভৃতির পূর্বে সূর্যের নিকট এই যোগের কথা বলেছিল, তা কি করে সম্ভব?

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সে সমস্তই জানি। কিন্তু পরন্তপ! তুমি জান না।

আমি জন্ম-মৃত্যু বিহীন এবং জগতের ঈশ্বর হয়েও আপন প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আপন মায়ায় জন্মে থাকি।

যখন যখন ধর্মের হানি এবং সর্বতোভাবে অধর্মের আবির্ভাব ঘটে, তখন তখনই আমি আপন মায়ায় দেহ সৃষ্টি করি।

সাধুগণের রক্ষা, দুষ্টগণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্যে আমি প্রতি যুগে জন্মগ্রহণ করে থাকি।

যে লোক আমার এইরূপ অলৌকিক জন্মগ্রহণ এবং কর্মসকল যথার্থরূপে জানে, সে লোক দেহত্যাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না, কিন্তু আমাকেই লাভ করে।

বহু লোকই আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ করে সর্বদা মদগতচিত্ত থেকে ভক্তিপূর্বক আমার আশ্রিত হয়ে জ্ঞানরূপ তপস্যায় পবিত্রতা লাভ করে আমাতে লীন হয়েছেন।

যাঁরা যেভাবে আমার শরণাপন্ন হন, আমি সেইভাবেই তাঁদের অনুগ্রহ করে থাকি। অর্জুন। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারেই আমার পথের অনুসরণ করে।

এই মনুষ্যলোকে মনুষ্যেরা কর্মের সাফল্য কামনা করে দেবগণের পূজা করে। তাই তাদের সেই সকল কর্মের সফলতা সত্বরই হয়।

আমি গুণ ও কর্মের পার্থক্য অনুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি। তবে আমি তার কর্তা হলেও বাস্তবিক পক্ষে আমাকে অকর্তা বলেই অবগত হও। কেন না, আমি নিষ্ক্রিয়ত্ব থেকে বিচ্যুত নই।

কর্মফলের প্রতি আমার কোনো স্পৃহা নেই বলে সেই কর্মফল আমাকে বদ্ধ করতে পারে না। আর এভাবে আমাকে যে জানে, সে ব্যক্তিও কর্মফলে বদ্ধ হয় না।

হে অর্জুন! মুমুক্ষুরাও এরূপ ভাবে উপলব্ধি করে গেছেন। সুতরাং তুমিও পূর্বকালে প্রাচীনগণের আচরিত কর্মই করতে থাক।

কোনটি কর্ম আর কোনটি অকর্ম—তা নিরূপণ করতে বুদ্ধিমানেরাও সক্ষম হয় না। অতএব, হে অর্জুন! তোমাকে আমি সেই কর্ম ও অকর্মের বিষয় বিশেষভাবে বলব—যাতে তুমি তা উপলব্ধি করে বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

বিহিত কর্মের স্বরূপও বুঝতে হবে, নিষিদ্ধ কর্মের তত্ত্বও জানতে হবে এবং নীরব থাকার অবস্থাও স্থির করতে হবে। কারণ কর্মের অবস্থা বোঝা বড়ই দুষ্কর।

যিনি দেহ বা ইন্দ্রিয়ের কার্যকে আত্মার কার্য বলে মনে করেন এবং যিনি ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে নীরব থাকাকেই কর্ম বলে মনে করেন, সেই লোকই সর্ব কর্মকারী বলে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান ও যোগী নামে অভিহিত হন।

যাঁর সমস্ত কার্যই ফল—কামনাবিহীন এবং 'আমি করছি' এরূপ অহঙ্কার বর্জিত—তাঁকেই ব্রহ্মজ্ঞেরা পণ্ডিত বলে থাকেন এবং তাঁরই জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্মরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে থাকে।

যে ব্যক্তি ফলের আসক্তি ত্যাগ করে কেবল আত্মানন্দেই তৃপ্ত থাকেন এবং নির্দিষ্ট আশ্রয় ত্যাগ করে যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত স্থানেই কর্ম করেন, সেই ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে সর্বতোভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হলেও বাস্তবিক পক্ষে কোনো কর্ম করেন না।

যাঁর কোনও কামনা নেই এবং মন ও দেহ সংযত হয়েছে আর যিনি সমস্ত ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করেছেন, শরীর রক্ষার জন্যে কেবল ভিক্ষা প্রভৃতি কার্য করেও নিত্যকার্য না করার পাপ তিনি ভোগ করেন না।

প্রার্থনা না করলেও যা পাওয়া যায় তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি শীত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-দুঃখ সহ্য করতে পারেন, কারও প্রতি যাঁর বিদ্বেষ থাকে না এবং অপ্রার্থিত বস্তু লাভে যাঁর আনন্দ হয় না, কিংবা না লাভ করলেও যিনি বিমর্ষ হন না—তিনি বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম করেও তাতে বদ্ধ হন না।

কর্মফলের প্রতি যাঁর আসক্তি নেই—যিনি রাগদ্বেষাদি বর্জিত হয়েছেন এবং যাঁর মন ব্রহ্মজ্ঞানেই নিবিষ্ট রয়েছে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে কর্ম করলেও সে সমস্ত কর্মই লয় পেয়ে যায়।

স্রুক—স্রুব প্রভৃতি পাত্র—ব্রহ্ম। ঘৃত, চরু প্রভৃতি হবি—ব্রহ্ম। প্রজ্বলিত অগ্নি—ব্রহ্ম। যজমান আমি—ব্রহ্ম এবং হবি নিক্ষেপেও ব্রহ্ম। সুতরাং এই কর্মটিই ব্রহ্ম—এরূপ একাগ্র চিত্তে যিনি কর্ম করেন—তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করেন।

অপর কর্মযোগীরা কেবল ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যেই দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগ প্রভৃতি করে থাকেন এবং জ্ঞানযোগীরা যজ্ঞের নিয়ম অনুসারেই সমস্ত যজ্ঞ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সমর্পণ করেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমরূপ অগ্নিতে সমর্পণ করেন। আর মুমুক্ষু গৃহস্থেরা শব্দ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে থাকেন।

ধ্যানীরা সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য এবং প্রাণ প্রভৃতির কার্যকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ব্রহ্মধ্যানরূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ বরেন।

আত্মার উন্নতি করতে যত্নশীল লোকদের মধ্যে কেউ কেউ দান ও কূপাদি নির্মাণ যজ্ঞ করেন, অনেক বৈধ উপবাস প্রভৃতি

তপস্যারূপ যজ্ঞ করে থাকেন। অনেকে শাস্ত্রানুশীলনরূপ যজ্ঞ করেন এবং বহুলোক বিশেষ বিশেষ নিয়মরূপ যজ্ঞ করে থাকেন।

অনেকে প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে মিশ্রিত করেন। বহু লোক প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুকে সংযুক্ত করেন এবং কেউ কেউ প্রাণ ও অপানবায়ুর গতি রুদ্ধ করে অবস্থান করেন।

অপর সাধকেরা আহার নিয়মিত করে প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ুতে লয় করেন। এই যজ্ঞাভিজ্ঞ সাধকেরা সকলেই যজ্ঞ দ্বারা পাপক্ষয় করে থাকেন।

সাধকেরা এই সব যজ্ঞের মধ্যে যে কোনও যজ্ঞ করার পরে অমৃতময় অন্ন ভোজন করে সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। কিন্তু হে কৌরবশ্রেষ্ঠ অর্জুন! যে লোক কোনও যজ্ঞ করে না—তার পক্ষে এই মনুষ্যলোকও সুখকর হয় না। স্বর্গ প্রভৃতি আর সুখজনক হবে কি প্রকারে?

হে অর্জুন! বেদের কর্মকাণ্ডে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বিস্তারিত-ভাবে বর্ণিত হয়েছে! তবে সে সমস্ত যজ্ঞকেই কর্মজাত বলে জেনে রাখ। এরূপ জানলে সেই জ্ঞানযজ্ঞেরই ফলে মুক্তিলাভ করবে।

হে অর্জুন! দ্রব্য সম্পাদিত যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কেন না, বিহিত সকল কর্মই জ্ঞানের অন্তর্গত হয়ে থাকে।

হে অর্জুন! তুমি গুরুগণের নিকট থেকে সেই ব্রহ্ম পদার্থ বুঝে নিও। তুমি অষ্টাঙ্গে প্রণাম ও পরিচর্যা করতে থেকে সর্ব প্রকার প্রশ্ন করলে গুরুগণ প্রসন্ন হয়ে তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি জ্ঞান লাভ করে পুনরায় এই ভ্রমে পতিত হবে না এবং জ্ঞানের বলে তুমি আপনাতে ও আমাতে সমস্ত পদার্থ দেখতে পাবে।

হে অর্জুন! তুমি যদি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক পাপকারী হয়ে যাক, তথাপি এক জ্ঞানপোত দ্বারা সমগ্র পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ

হতে পারবে।

হে অর্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসমূহ ভস্ম করে সেরূপ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি ঐহিক সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত করে থাকে।

মানুষ গুরুর উপদেশে দৃঢ় বিশ্বাসী। সর্বদা তার শ্রবণে নিরত থেকে জিতেন্দ্রিয় হয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং জ্ঞান লাভ করে পরম শান্তি অর্জন করে।

যে লোক আত্মতত্ত্ব জানে না, যে লোক গুরু বাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস করে না এবং যে লোকের মন সন্দিগ্ধ, তাদের জীবনের ফল বিনষ্ট হয়। এদের মধ্যে আবার সন্দিগ্ধচিত্ত লোকের ইহলোক, পরলোক বা প্রকৃত সুখও হয় না।

হে অর্জুন! যিনি চিত্তের একাগ্রতা সহকারে সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তত্ত্বজ্ঞান যাঁর সমস্ত সংশয় দূর করে দেয় এবং যিনি জ্ঞান ও কর্ম সাধনে যত্নবান থাকেন—কর্ম তাঁর বন্ধন জন্মাতে পারে না।

হে অর্জুন! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থিত এই সংশয়কে ছেদন করে কর্মযোগ অবলম্বন কর এবং উত্থিত হও।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম ত্যাগ এবং কর্ম করা —এই দুই-ই বলছ। অতএব এই দু'টির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ তার কথা বিশদভাবে বল।

কৃষ্ণ বললেন, কর্ম ত্যাগ ও কর্ম করা এই দু'টিই মুক্তিজনক বটে। তবে তার মধ্যে কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই উত্তম।

হে মহাবাহু অর্জুন! যিনি কর্মের ওপর বিদ্বেষ করেন না কিংবা ফল কামনাও করেন না, তিনি কর্ম করতে থাকলেও তাঁকে

কর্মসন্ন্যাসী বলে জানবে। কারণ, পরস্পরবিরোধী-দ্বন্দ্বশূন্য লোক অনায়াসে সংসার থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন।

মূর্খেরাই কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগকে বিভিন্ন কার্য বলে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন না। কারণ, উভয়ের মধ্যে একটিরও সম্যক অনুষ্ঠান করলে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়।

জ্ঞানসম্পাদক কর্মসন্ন্যাস দ্বারা যে মুক্তি লাভ করা যায়, জ্ঞান সম্পাদক কর্মযোগ দ্বারাও সেই মুক্তিই লাভ করা যায়। অতএব যিনি কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগকে এক বলে জানেন, তিনিই সম্যক রূপে জানেন।

হে মহাবাহু অর্জুন! কর্মযোগ ব্যতীত কর্মসন্ন্যাস লাভ করা যায় না। অতএব সাধক প্রথমে কর্মযোগ সমন্বিত, পরে মননশীল কর্মসন্ন্যাসী হয়ে অচিরকালের মধ্যেই ব্রহ্মলাভ করেন।

নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে থাকলে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি তিরোহিত হয়ে চিত্ত বিমল হয়। শরীর সংযত হয়ে পড়ে এবং ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়ে যায়। তখন সাধক সমস্ত প্রাণীর আত্মাকে আপনার আত্মা বলে মনে করেন। সুতরাং সেই সময় তিনি কদাচিৎ কামনা সহকারে কর্ম করে থাকলেও তাতে লিপ্ত হন না।

ব্রহ্মনিবিষ্টচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ লোক দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্নান, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস-প্রশ্বাস, বাক্যোচ্চারণ, মলমূত্র ত্যাগ, গ্রহণ ও প্রসারণ ও সঙ্কোচন করতে থেকেও ইন্দ্রিয়গুলি আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু আমি নিজে প্রবৃত্ত হচ্ছি না। এরূপ নিশ্চয়তার সঙ্গে 'আমি কিছুই করি না' বলে মনে করে থাকেন।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ নন, তিনি যদি ফলের আসক্তি পরিত্যাগ করে সমর্পণ-বুদ্ধিতে পরমেশ্বরের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করেন। তাহলে পদ্মপত্র যেমন লিপ্ত হয় না—তেমনি তিনিও পুণ্যপাপে লিপ্ত হন না।

কর্মযোগীরা আত্মশুদ্ধির জন্যে ফলের আসক্তি ত্যাগ করে দেহ, মন, বুদ্ধি ও কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য করে থাকেন।

ঈশ্বর-নিবিষ্টচিত্ত সাধক কর্মফল কামনা ত্যাগ করে কর্ম করতে থেকে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্পন্ন মুক্তি লাভ করেন। আর ঈশ্বরে অনিবিষ্ট-চিত্ত লোক কামনা প্রেরিত এবং কর্মফলে আসক্ত হয়ে বদ্ধই থাকে।

জিতেন্দ্রিয় লোক মন দ্বারাও সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করে দেহ দ্বারাও কোনও কার্য না করে বা না করিয়ে নবদ্বার যুক্ত দেহে সুখে অবস্থান করেন।

পরমেশ্বর কোনো লোকেরই কর্তৃত্ব, কার্য বা কর্মফলের সম্বন্ধ সম্পাদন করেন না। কিন্তু অনাদি প্রকৃতিই স্বভাবত প্রবৃত্ত হয়ে এই সকল করে থাকে।

ঈশ্বর কারোর পাপ গ্রহণ করেন না কিংবা কারোর পুণ্য হরণ করেন না। কিন্তু অজ্ঞান—প্রাণিগণের জ্ঞানকে আবৃত রাখে। তার জন্যেই প্রাণিরা ভ্রমে পতিত হয়।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান যাঁদের সেই অজ্ঞানত্বকে নষ্ট করেছে—তাঁদের নিকটে সূর্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করে জগৎ প্রকাশ করেন—সেরূপ সেই তত্ত্বজ্ঞানই সেই পরব্রহ্মকে প্রকাশ করে।

যাঁদের বুদ্ধি ব্রহ্মেই নিবিষ্ট থাকে এবং যাঁরা ব্রহ্মলাভ করার জন্যেই যত্নবান, ব্রহ্মেই অবস্থিত ও ব্রহ্মপরায়ণ থাকেন, জ্ঞান তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট করে, তখন তাঁরা মুক্তি লাভ করেন।

জ্ঞানীরা বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডালে একই ব্রহ্মকে দর্শন করে থাকেন।

যাদের মন অসমানেও সমানভাবে থাকে, তাঁরা ইহলোকেই সংসার জয় করতে পারেন। ব্রহ্ম পদার্থ বিকারবিহীন ও সম, সুতরাং যাঁরা সর্বত্র সমদর্শন করেন তাঁরা ব্রহ্মেই অবস্থান করেন।

স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য, ব্রহ্মস্থিত ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি লোকপ্রিয় বস্তু পেয়েও আনন্দিত হন না আবার অপ্রিয় বস্তু পেয়েও বিষণ্ণ হন না।

কেবল আত্মাতে যে শান্তিসুখ আছে, বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত মানুষ সেই সুখ লাভ করেন। তারপর তিনি সমাধির বলে আপন জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে সম্মিলিত করে অক্ষয়সুখ ভোগ করেন।

হে অর্জুন! বিষয়সুখের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে এবং সে সুখ দুঃখের কারণ হয়। এইজন্য জ্ঞানী কখনও বিষয়সুখে আসক্ত হন না।

যে মানুষ এই সংসারে থেকে কাম ও ক্রোধের আবেগ সহ্য করতে পারে সেই মানবই বাস্তবিক যোগী, সেই মানুষই বাস্তবিক সুখী।

যিনি অন্তরের সুখেই সুখী, অন্তরেই নিবৃত থাকেন এবং অন্তরেই যাঁর দৃষ্টি থাকে, সেই যোগী ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মে লয় পান।

পাপবিহীন, মন্ত্রার্থদর্শী, সন্দেহহীন, ব্রহ্মধ্যানে নিরত এবং সর্বভূতের হিতসাধনে ব্যাপৃত মানুষেরা ব্রহ্মালয় প্রাপ্ত হন।

যাঁরা জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁদের কাম-ক্রোধ উৎপন্নই হয় না, চিত্ত ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন, ব্রহ্মজ্ঞান জন্মেছে—তাঁদের জীবিত অবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পরে নির্বাণ বা মুক্তি বিদ্যমানই থাকে।

শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি বাইরের বিষয়গুলিকে বাইরে রেখে, নয়ন-যুগলকে ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থাপন করে, প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান ও নাসিকা মধ্যবর্তী রেখে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করে এবং ইচ্ছে, ভয় ও ক্রোধকে তিরোহিত করে যে মানুষ সর্বদা ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তিনি জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত হন।

আমি ভক্তগণের যজ্ঞ ও তপস্যার রক্ষক, সমস্ত লোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ। মুমুক্ষু এরূপে আমাকে জেনে মুক্তি লাভ করেন।

কৃষ্ণ বললেন, যিনি কর্মের ফল কামনা না করে কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। কিন্তু যিনি অগ্নিহোত্রাদি মাত্র ত্যাগ করেন, তিনি সন্ন্যাসী নন।

হে অর্জুন! বেদ-এ যাকে সন্ন্যাস বলা হয়েছে তুমি সেটিকেই যোগ বলে অবগত হও। কারণ ফল কামনা ত্যাগ না করে কেউই যোগী হয় না।

মননশীল যে সাধক জ্ঞানমার্গে আরোহণ করার ইচ্ছা করেন, তাঁর পক্ষে নিত্যকর্ম করাকেই সেই আরোহণের কারণ বলা হয়। আর তিনি যখন জ্ঞানমার্গে আরূঢ় হলেন, তখন তাঁর সেই সব কর্ম-ত্যাগকেই জ্ঞান পরিপাকের কারণ বলে অভিহিত করা হয়।

যখন সাধক শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত হন না কিংবা সাধক কোনও কার্যে ব্যাপৃত হন না, তখন সর্বকামনা ত্যাগী সেই সাধককে যোগারূঢ় বলা হয়।

বিবেকী লোক আপনা দ্বারাই আপনাকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু অবসন্ন করবেন না। কারণ মানুষ আপনিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই শত্রু হয়ে থাকে।

যিনি নিজেই নিজের মনকে জয় করতে পেরেছেন, তাঁর নিজের মনই নিজের বন্ধু। আর যিনি নিজের মনকে জয় করতে পারেন নি, তাঁর মনই শত্রুর তুল্য অপকার করতে প্রস্তুত থাকে।

যিনি মনকে বশীভূত করতে পেরেছেন, যার রাগ ও দ্বেষ নেই এবং যিনি শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ ও মান-অপমানে সমান থাকেন, কেবল তাঁর মনই সমাধি লাভ করতে পারে।

যাঁর মন জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৃপ্তি লাভ করেছে, যাঁর কোনো বিকার নেই, যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর ও স্বর্ণে যাঁর সমান জ্ঞান জন্মেছে সেই যোগীকেই যোগারূঢ় বলে।

সুহৃদ্, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, বন্ধু, সাধু ও পাপিষ্ঠের ওপরে যাঁর সমান বুদ্ধি থাকে তিনি যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যোগী মন ও দেহকে সংযত রেখে, সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে, কন্থা ও কম্বল ভিন্ন অন্য উপকরণ না রেখে, নির্জনে একাকী বাস করে—সর্বদাই চিত্তকে পরব্রহ্মে সমাহিত করবেন।

যোগী কোনো পবিত্র স্থানে আপনার আসন স্থাপন করবেন। সে আসন অধিক উচ্চও হবে না—নিম্নও নয়। তাতে প্রথমে কুশ, তার ওপরে হরিণ প্রভৃতির চর্ম এবং তার ওপরে বস্ত্র বিছাতে হবে। যোগী এরূপ আসনে উপবেশন-পূর্বক মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিরুদ্ধ করে একাগ্রচিত্ত হয়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের জন্যে ধ্যানযোগ অভ্যাস করবেন।

যোগী ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে মেরুদণ্ড, মস্তক ও গ্রীবাটিকে সরল ও নিশ্চল রাখবেন। আপন নাসিকাগ্র দর্শন করতে থেকে কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করে রাগদ্বেষাদিশূন্য চিত্ত ও নির্ভয় হয়ে ব্রহ্মচারীর নিয়মে থেকে মনকে সংযত রাখবেন। তারপর মদ্গতচিত্ত হয়ে, আমাকে আরাধ্য ভেবে সেই আসনে উপবেশন করে থাকবেন।

যোগী মনকে অন্য বিষয় হতে নিবৃত্ত রেখে এবং সর্বদা সেই মনকে আমাতে সমাহিত করে আমাতে অবস্থানরূপ পরম নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করেন।

হে অর্জুন! যে লোক অধিক ভোজন করে, যে লোক অল্প বা একেবারেই ভোজন করে না, কিংবা যে লোক অধিক নিদ্রা বা যে লোক অধিক জাগরণ করে—তাদের যোগ হতে পারে না।

যিনি নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে ভোজন ও গমন করেন, নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে স্নানাদি কার্য করে থাকেন এবং যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে নিদ্রালাভ ও জাগরণ করেন, তাঁরই দুঃখ-নাশক যোগ হয়ে থাকে।

যোগীর সংযতচিত্ত যখন পরব্রহ্মেই অবস্থান করে এবং তিনি যখন ঐহিক, পারত্রিক সমস্ত ভোগ্য বস্তুতে স্পৃহাবিহীন হন, তখনই তাঁকে বাস্তবিক ধ্যানযোগী বলা হয়।

বায়ুহীন স্থানে দীপ যেমন কম্পিত হয় না—যোগীর চিত্তও তেমন বিচলিত হয় না।

ধ্যানাভ্যাস করতে থেকে নিরুদ্ধ চিত্ত যে অবস্থায় শান্তি লাভ করে, যে অবস্থায় যোগী চিত্ত দ্বারা পরমাত্মা দর্শন করতে থেকে সেই আমাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিমাত্রে আন্তরিক যে সুখ রয়েছে—তা যোগী যে অবস্থায় জেনে থাকেন, যোগী যে অবস্থায় থেকে তত্ত্বভ্রষ্ট হন না, যোগী যে অবস্থা লাভ করার পর তা অপেক্ষা আর কোনো লাভকে অধিক বলে মনে করেন না এবং যে অবস্থায় থেকে যোগী গুরুতর কষ্টেও বিচলিত হন না, দুঃখ-সম্বন্ধশূন্য সেই অবস্থা বিশেষের নামই যোগ বলে জানবে। যোগী উৎফুল্ল চিত্তে মোক্ষ লাভের জন্যে নিশ্চিত রূপে সেই যোগ অভ্যাস করবেন।

যোগী সঙ্কল্পজাত সর্বকামনা সর্বপ্রকারে ত্যাগ করে—মন দ্বারাই সকল দিক থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিবৃত্ত রেখে, সে মনটিকে পরমাত্মার ওপরে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করে—ধৈর্য ও বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত বিষয় থেকে ধীরে ধীরে নিবৃত্তি পাবেন। তখন মনে-মনেও কোনো বিষয়ের চিন্তা করবেন না।

যে মন স্বভাবতই চঞ্চল এবং নিরুদ্ধ করলেও অস্থিরই থাকে, সে মন যে বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে—সে বিষয় থেকে তাকে মুক্ত করে এনে পরমাত্মাতে স্থাপন করবে।

যোগীর মন যখন পরমাত্মাতে থেকে বিশেষ শান্তি লাভ করল, রজোগুণ নিবৃত্তি পেল, পাপপুণ্য তিরোহিত হল এবং জীবন্মুক্তি উপস্থিত হল—তখনই যোগীর কাছে নিরতিশয় সুখ উপস্থিত হয়।

পাপপুণ্যবিহীন যোগী এইভাবে সর্বদা মনকে পরমাত্মাতে

সংযুক্ত করে অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত নিরতিশয় সুখ ভোগ করে থাকেন।

সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী যোগী সমস্ত পদার্থেই আপনাকে দেখতে পান এবং আপনাতেও সকল পদার্থই দেখে থাকেন।

যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেও সমস্ত কিছু দেখতে পান, আমি তাঁর কাছে অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না।

যে যোগী 'জীব ও ব্রহ্ম এক' এরূপ ধারণা করে সর্বত্রাধিষ্ঠিত-রূপে আমার উপাসনা করেন, সেই যোগী সকল অবস্থাতেই আমাতে থাকেন।

হে অর্জুন! যিনি নিজের তুলনায় সকল প্রাণীর সুখ বা দুঃখ সমান চক্ষে দেখেন, তাঁদের মধ্যে সেই যোগীকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! মনের ব্রহ্মে স্থিতিরূপ যে যোগের কথা তুমি বললে, মন চঞ্চল হলে এই স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল হতে পারে বলে আমি মনে করি না।

হে কৃষ্ণ! দেখ, মন অত্যন্ত চপল। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে তা দৃঢ়সংযুক্ত। সুতরাং আমি মনে করি, বায়ুর ন্যায় সেই মনেরও প্রতিরোধ করা অত্যন্ত দুষ্কর।

কৃষ্ণ বললেন, হে মহাবাহু অর্জুন! মন যে চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলির বিকল্প, বলবান এবং দৃঢ়সংযুক্ত—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যোগিরা অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সেই মনকেও নিগৃহীত করতে পারেন।

যে ব্যক্তি সেই অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে দমন করতে পারে নি, তার পক্ষে ধ্যানযোগ লাভ করা দুষ্কর। আর যিনি সেই উভয় দ্বারা মনকে দমন করতে পেরেছেন এবং সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, তিনি সেই একই উপায়ে ধ্যানযোগ লাভ করতে পারেন—

এটিই আমার ধারণা।

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! কোনও লোক প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ধ্যান আরম্ভ করল। পরে ইন্দ্রিয় দমন করতে না পারায় সে ধ্যানভ্রষ্ট হল। সে অবস্থায় সেই লোক যোগসিদ্ধি লাভ না করে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

হে মহাবাহু কৃষ্ণ! ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ ও ধ্যান থেকে যার চিত্ত বিচ্যুত হয়, যে লোক কর্মপথ ও জ্ঞানপথ এই দুই পথ থেকেই বিচ্যুত হয়ে নিরবলম্বন হয়ে পড়ে—সে কি বিশ্লিষ্ট মেঘের মতোই লয় পায়—না লয় পায় না?

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয়কে সর্বপ্রকারে ছিন্ন করে দাও। কারণ তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের ছেদক পাওয়া যাবে না।

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! সেই যোগভ্রষ্ট লোকের ইহলোকেও অধঃপাত হয় না—পরলোকেও অধঃপাত হয় না। কারণ শুভকারী কোনও লোকই দুর্গতি ভোগ করে না।

স্বল্পকালীন-যোগভ্রষ্ট লোক ধার্মিকগণের লভ্য স্বর্গ লাভ করে এবং সেখানে দীর্ঘকাল থাকার পর সদাচারসম্পন্ন ধনিগণের গৃহে এসে জন্ম গ্রহণ করে।

আর দীর্ঘকালীন-যোগভ্রষ্ট লোক এসে জ্ঞানী-যোগীদের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার জন্ম জগতে অতি দুর্লভই বটে।

কারণ, সেই দীর্ঘকালীন-যোগভ্রষ্ট লোক সেই জন্মে পূর্বদেহ সম্পর্কিত যোগবুদ্ধি লাভ করেন। তারপর তিনি পুনরায় যোগে সম্যক সিদ্ধি লাভের জন্যে যত্ন করতে থাকেন।

এই যোগভ্রষ্ট লোক ইহজন্মে বিষয়াসক্ত হয়ে পড়লেও পূর্বের সেই অভ্যাসই তাঁকে যোগের দিকে আকর্ষণ করে নিতে থাকে। তাতে তিনি যোগের স্বরূপ প্রভৃতি জানবার ইচ্ছা করেও বেদ-বিহিত কর্ম ত্যাগ করেন।

পূর্ব জন্মে যোগ বিষয়ে যে পরিমাণ যত্ন করেছিলেন—পর জন্মে যোগ বিষয়ে তদপেক্ষা আরও অধিক যত্ন যিনি করেন,—সেই যোগী তৃতীয় জন্মে নিষ্পাপ হয়ে জ্ঞান লাভ করে তাতেই মুক্তি লাভ করেন।

হে অর্জুন! তপস্বী, শাস্ত্রজ্ঞানী এবং যজ্ঞাদিকর্মকারী অপেক্ষা ধ্যানযোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি সেই ধ্যানযোগী হওয়ার চেষ্টা কর।

যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমাতে মনোনিবেশ করে আমার সেবা করেন, তাঁকে আমি সকল যোগীর মধ্যে প্রধান যোগী বলে মনে করি।

সপ্তম অধ্যায়

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! তুমি আমাতে মনোনিবেশ করে, আমার শরণাপন্ন হয়ে যোগাভ্যাস করতে থেকে নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণভাবে আমাকে যে প্রকারে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।

আমি তোমার নিকট অ-পরোক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিষয়সকল বলব—যে জ্ঞান লাভ করার পর এই জগতে মানুষের পুনরায় আর কোনও জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না।

সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কোনো একটি মানুষই তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যে যত্ন করেন। আবার সেরকম সহস্র সহস্র তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে কোনো একটি মানুষ হয়তো আমাকে জানেন।

হে মহাবাহু অর্জুন! গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মূল প্রভৃতি এই অষ্টবিধ ভেদপ্রাপ্ত আমার একটি প্রকৃতি আছে।

হে অর্জুন! এই অষ্টভেদভিন্ন প্রকৃতির নাম—অপরা। এটি ভিন্ন জীবস্বরূপা। আমার আর একটি প্রকৃতি আছে—যার নাম পরা—যে পরাপ্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করছে।

হে অর্জুন! তুমি স্থির করে রাখ যে আমার এই দু'টি প্রকৃতিই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করছে। অতএব আমিই জগতের সৃষ্টি-কর্তা, রক্ষাকর্তা ও বিনাশকর্তা।

অতএব অর্জুন! এই জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে আমা ভিন্ন অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ কারণ নেই। সুতরাং মণিমালার সূত্রে যেমন মণিগুলি গ্রথিত থাকে—সেরূপ এই সমস্ত জগৎটাই আমাতে গ্রথিত রয়েছে।

হে অর্জুন! আমি সৎ ও চিৎ-স্বরূপ। সুতরাং মণিমালার সূত্র যেমন সকল মণির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, আমিও তেমন সমস্ত পদার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি।

অর্জুন! আমি জলের রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, সমস্ত বেদের ওঙ্কার, আকাশের শব্দ ও পুরুষের উৎসাহরূপে রয়েছি।

আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ, অগ্নির তেজ, সকল প্রাণীর আয়ু, এবং তপস্বিগণের তপস্যারূপে রয়েছি।

অর্জুন! তুমি জেনে রাখ যে আমি নিত্য বলে—ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান চরাচর সকলের বীজস্বরূপ। আর আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজ।

আমি বলবানদিগের কাম-রাগ-বিহীন বল এবং প্রাণিগণের ধর্মবিরুদ্ধ কাম।

শম ও দম প্রভৃতি যে সকল সাত্ত্বিকভাব, কাম, ও ক্রোধ প্রভৃতি যে রাজসিক ভাব এবং শোক ও মোহ প্রভৃতি যে সকল তামসিক ভাব আছে—সেগুলি আমার প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলে জেনো। সুতরাং আমি কিন্তু সেগুলিতে নেই—অথচ সেগুলি আমাতে আছে।

গুণময় এই তিনটি ভাব এই জগৎটিকে মোহিত করে রেখেছে। অতএব আমি এ সকল ভাবের অতীত এবং অপরিণামী, তা এই জগৎ জানে না।

আমার ক্রীড়া সম্পাদিনী গুণময়ী এই মায়াকে অতিক্রম করা দুষ্কর। অতএব যাঁরা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁরা এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন।

সর্বদা পাপকারী, বিবেকহীন, মায়াবৃতজ্ঞান, ও আসুর-ভাবাপন্ন নরাধমেরা আমার শরণাপন্ন হয় না।

হে অর্জুন! পীড়িত, জ্ঞানার্থী, ভোগলিপ্সু ও জ্ঞানী, এই চতুর্বিধ লোক পুণ্যবান হলে তাঁরা আমার সেবা করতে থাকেন।

এই চতুর্বিধ লোকের মধ্যে সর্বদা আমাতে সমাহিতচিত্ত এবং একমাত্র আমার ওপরে ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী লোকই শ্রেষ্ঠ। কারণ আমি জ্ঞানী লোকের অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানী লোকও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

এঁরা সকলেই প্রধান। তবে জ্ঞানী লোক আমার আত্মা এটিই আমার অভিমত। কারণ সেই জ্ঞানী লোক আমাতে সমাহিতচিত্ত হয়ে সর্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করে থাকেন।

জ্ঞানী লোক বহু জন্মের পর 'বাসুদেবই সর্বস্ব' এরূপ জেনে আমাকে লাভ করেন। সুতরাং সেই মহাত্মা অতি দুর্লভ।

আর কামী লোকেরা সেই সব কামনায় আকৃষ্টচিত্ত। তারা আপন স্বভাবে বদ্ধ হয়ে সেই সব নিয়ম অবলম্বন করে অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে।

যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্বক যে যে দেবতার মূর্তি পূজো করতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই শ্রদ্ধাকেই অচলা করে থাকি।

সেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার পুজা করে। তারপর অভীষ্ট ফল লাভ করে থাকে। সেই অভীষ্ট ফল আমিই দান করে থাকি।

তবে সেই অল্প-বুদ্ধির লোকগণের সেই সকল ফল বিনশ্বর হয়ে থাকে এবং অন্যান্য দেবতা-পূজক লোকেরা সেই সেই দেবতাকে লাভ করে এবং আমার ভক্তেরা আমাকে লাভ করে থাকেন।

অজ্ঞানী লোকেরা অতীন্দ্রিয় এবং অ-বিকারী। আমার সর্বোত্তম অবস্থা না জেনে আমাকে পূর্বে অপ্রকাশিত—পরে প্রকাশিত বলে মনে করে।

আমি যোগমায়ায় আবৃত থাকি বলে সকলের হৃদয়ে স্বরূপে প্রকাশ পাই না। সুতরাং মূঢ় মানুষগণ জন্ম ও মৃত্যুবিহীন আমাকে চিনতে পারে না।

হে অর্জুন! আমি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সমস্ত পদার্থই জানি। কিন্তু অন্য কেউই আমাকে জানে না।

শত্রুতাপস ভরতনন্দন! জন্ম হলেই সকল প্রাণী ইচ্ছা ও দ্বেষের বিষয়ীভূত শীত ও গ্রীষ্ম এবং সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি বিপরীত দু' দু'টি ভাবের মোহে ভ্রম প্রাপ্ত হয়।

পুণ্যের বলে যে সকল লোকের পাপ নষ্ট হয়—তাঁরা ভ্রমবিহীন দৃঢ় নিয়মশালী হয়ে আমার উপাসনা করেন।

যাঁরা জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্ত হবার জন্যে আমাকে আশ্রয় করে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত যত্ন করেন, তাঁরাই সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয় এবং নিষ্কাম কর্ম জানতে পারেন।

যাঁরা অধিভূত, অধিদেব, ও অধিযজ্ঞের সঙ্গে আমাকেও জানেন, তাঁরা মৃত্যু কালেও সমাহিতচিত্ত হয়ে আমাকে চিন্তা করতে থাকেন।

অষ্টম অধ্যায়

অর্জুন বললেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রহ্ম কী? অধ্যাত্ম কী? ধর্ম কী? কাকে বলে অধিভূত? অধিদৈবই বা কাকে বলে?

হে মধুসূদন! এই দেহে পূর্বোক্ত অধিভূত কী? কী প্রকারেই বা তা জানা যায়? আর মৃত্যুকালেই বা তুমি কি প্রকারে সংযত-চিত্ত লোকদের জ্ঞানগম্য হও?

কৃষ্ণ বললেন, বিকারবিহীন পরম পদার্থ—ব্রহ্ম, দেহস্থিত

জীবাত্মা—অধ্যাত্ম এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকারী ত্যাগ—কর্ম।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থ—অধিভূত, আদি পুরুষ ব্রহ্মা—অধিদৈব এবং এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ।

যে পুণ্যবান লোক মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতে থেকে দেহত্যাগ করে প্রস্থান করেন, তিনি আমার সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হে কুন্তীনন্দন! মানুষ মৃত্যুকালে যে যে বিষয় চিন্তা করতে থেকে দেহত্যাগ করে, সর্বদা সেই চিন্তায় নিমগ্ন থেকে দেহত্যাগের পরে সেই বিষয়ই প্রাপ্ত হন।

অতএব অর্জুন! তুমি সকল সময়ে আমার চিন্তা কর এবং এখন যুদ্ধ কর। সর্বদা আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করতে পারলে নিশ্চয় তুমি অন্তিমে আমাকে লাভ করবে।

হে অর্জুন! মানুষ অভ্যাস ও অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা অলৌকিক পরমপুরুষ নারায়ণের চিন্তা করতে থেকে অন্তিমে তাঁকেই প্রাপ্ত হয়।

যে পুণ্যবান লোক মৃত্যুকালে ভক্তিযুক্ত হয়ে, যোগের বলে ভ্রূ যুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে প্রবেশ করিয়ে, একাগ্রচিত্তে সর্বজ্ঞ, অনাদি, জগতের শাসনকর্তা. সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, সকলের প্রাণধারণকারী, অচিন্তনীয় স্বরূপ, সূর্যের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশমান এবং তমোগুণের অতীত পরমাত্মাকে সম্যক রূপে চিন্তা করেন, সেই লোক সেই চিন্তার বলেই সেই পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন।

হে অর্জুন! বেদবিদ্‌গণ যে অবিনশ্বর বস্তুর বিষয় বলে থাকেন, বিষয়াভিলাষবিহীন জিতেন্দ্রিয়গণ অন্তিমে যাঁর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ব্রহ্মচারীরা যাঁকে লাভ করার ইচ্ছে করে গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য ব্রত আচরণ করে থাকেন—তোমার নিকট আমি সেই বস্তুটির কথা সংক্ষেপে বলব।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযম, হৃদয়মধ্যে মনের নিরোধ, মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মে প্রাণবায়ুর স্থাপন এবং ব্রহ্মের ওপরে চিত্ত সংস্থাপন করে যে পুণ্যবান লোক ব্রহ্মের বাচক 'ওম' এই একটি অক্ষর উচ্চারণ ও আমায় স্মরণ করতে থেকে দেহ ত্যাগ করে প্রস্থান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন।

হে অর্জুন! যে লোক অনন্যচিত্ত হয়ে প্রত্যহ সর্বদা আমাকে স্মরণ করেন, সেই সর্বদা সমাহিতচিত্ত-যোগীর পক্ষে আমি অনায়াসলভ্য হয়ে থাকি।

মহাত্মারা আমাকে লাভ করে—যাতে বহুতর দুঃখ হয় এবং যার পরে জীবনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, সেইরূপ জন্ম আর গ্রহণ করেন না। একেবারেই মুক্তি লাভ করেন।

কুন্তীনন্দন অর্জুন! ব্রহ্মলোকবাসী থেকে অন্যান্য স্বর্গবাসী সকল লোকেরই পুনরায় জন্ম হয়ে থাকে। কিন্তু আমাকে লাভ করার পর আর জন্ম হয় না।

দেবপরিমাণে এক সহস্র যুগে ব্রহ্মার যে দিন হয় এবং সেই পরিমাণে এক সহস্র যুগে ব্রহ্মার যে রাত্রি হয় তা যোগবলে যাঁরা জানেন—তাঁরাই অহোরাত্রবিদ্।

ব্রহ্মার দিন হলে সেই জাগরিত ব্রহ্মা থেকে চরাচর প্রাণিসকল প্রাদুর্ভূত হয়। আবার রাত্রি উপস্থিত হলে সেই নিদ্রিত ব্রহ্মাতেই সব লয় পায়।

হে অর্জুন! আপন আপন কর্মের অধীন সেই স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিরা এই ব্রহ্মার দিনাগমে আবির্ভূত হয়, আবার রাত্রি এলে লয় পায়। সুতরাং এরা জন্মেই লয় প্রাপ্ত হচ্ছে।

কিন্তু সেই ব্রহ্মা থেকে ভিন্ন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও নিত্য ব্রহ্মপদার্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও তিনি বিনষ্ট হন না কিংবা সমস্ত ভূত উৎপন্ন হলেও তিনি উৎপন্ন হন না।

এই ব্রহ্মকেই আমি পূর্বে 'অক্ষর' বলেছি, বেদও তাই বলেছে

এবং বেদ সেই ব্রহ্মকেই সর্বোত্তম গন্তব্য বলে থাকেন। আর যাঁকে লাভ করে জ্ঞানীরা প্রত্যাবর্তন করেন না—আমি সেই সর্বোত্তম প্রকাশ-স্বরূপ তেজ।

হে অর্জুন! সকল মানুষই অনন্যগামিনী ভক্তি দ্বারা সেই পরমপুরুষকে—যাঁর ভেতরে সমস্ত জগৎ রয়েছে এবং যিনি এই সমগ্র জগৎকে ব্যপ্ত করে রয়েছেন তাঁকে লাভ করতে পারে।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! ধ্যানযোগিরা যে কালে দেহত্যাগ করে ক্রমশ মুক্তি লাভ করেন এবং কর্মযোগিরা যে কালে প্রাণত্যাগ করে পুনরায় সংসারে আগমন করেন—সেই কালদেবতাকে প্রাপ্ত করার উভয় পথের কথাই আমি বলব।

অগ্নিরূপ তেজের দেবতা, দিনের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা এবং উত্তরায়ণ প্রমুখ ছয় মাসের দেবতাগণ যে পথে নিয়ে যান, সেই পথের নাম 'দেবযান'। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকারী লোকেরা দেহত্যাগ করে সেই দেবযান পথে গিয়ে মুক্তি লাভ করেন।

ধূমের দেবতা, রাত্রির দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের দেবতা এবং দক্ষিণায়ণ প্রমুখ ছয় মাসের দেবতাগণ যে পথে নিয়ে যান—সে পথের নাম 'পিতৃযান'। কাম্যকর্মকারী লোক সেই পিতৃযান পথে গিয়ে কিছুকাল স্বর্গভোগ করে। কর্মফলের পর আবার এসে জন্ম গ্রহণ করেন।

এই শুক্ল ও কৃষ্ণ দুটি পথ জগদ্বাসীর পক্ষে অনাদি বলে জ্ঞানীরা মনে করেন। তার মধ্যে ধ্যানযোগী শুক্লপথে যেতে থেকে ক্রমে মুক্তি লাভ করেন এবং কাম্যকর্মকারী কৃষ্ণপথে গিয়ে স্বর্গ ভোগ করে আবার সংসারে আসেন।

পৃথানন্দন! কোন জ্ঞানী বা ধ্যানী এই দুটি পথের বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে মুগ্ধ হন না? অতএব অর্জুন। তুমি সমস্ত সময়েই পরমেশ্বরে সমাহিতচিত্ত হও।

বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা ও দান করায় যে সমস্ত পুণ্যের

কথা শাস্ত্রে কথিত আছে—জ্ঞানী বা ধ্যানী লোক এই পথ দু'টির বিবরণ জেনে সে সকল পুণ্যের আশা আর করেন না। কিন্তু তাঁরা জ্ঞান ও ধ্যান করে আদি কারণ সেই পরমপদ লাভ করারই চেষ্টা করেন।

নবম অধ্যায়

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! তোমার অসূয়া নেই। সুতরাং আমি তোমার নিকটে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে অতি গোপনীয় জ্ঞানের বিষয় বলব—যা জেনে তুমি সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

এই জ্ঞান পবিত্র, ধর্মসঙ্গত, অনায়াসসাধ্য, অক্ষয়ফলজনক, এবং প্রত্যক্ষফলকারক। সুতরাং এটি জ্ঞানের রাজা, গোপনীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রকারেই উত্তম।

হে শত্রুতাপস অর্জুন! অনেক লোক এই জ্ঞানের ওপর বিশ্বাস না করে প্রকারান্তরে ধর্মাচরণ করে। আমাকে না পেয়ে, স্বর্গভোগের পর মৃত্যুক্লেশযুক্ত সংসারে প্রত্যাবর্তন করে থাকে।

আমি অপ্রকাশিত সচ্চিদানন্দ রূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যপ্ত করে রয়েছি এবং সমগ্র জগৎ আমাতেই রয়েছে। কিন্তু আমি তার মধ্যে নেই।

অথচ জগৎ আমাতে থাকে না এবং পরব্রহ্ম-স্বরূপ আমি সমগ্র জগৎ উৎপাদন করি, পালন করি—অথচ তাতে থাকি না। সুতরাং হে অর্জুন! আমার ঈশ্বরাবস্থার যোগমায়ার প্রভাব দেখ।

হে অর্জুন! সর্বত্রগামী বিশাল বায়ু যেমন সর্বদা আকাশে থাকে, সেরূপ সমস্ত জগৎ আমাতে রয়েছে। এটাই স্থির জেনো।

হে কুন্তীনন্দন! প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ আমার প্রকৃতিতে গিয়ে লীন হয়। আবার আমি কল্পারম্ভে সেই জগৎকে বিবিধ রূপে সৃষ্টি করি।

আমি নিজের সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করে প্রাক্তন কর্মবশে

পরাধীন এই সব ভূতসমূহকে বারবার সৃষ্টি করে থাকি।

হে অর্জুন! আমি সেই সৃষ্টি প্রভৃতি কর্মে আসক্ত না হয়ে উদাসীনের ন্যায়ই অবস্থান করি। সুতরাং সেই কর্মগুলি আমাকে বন্ধন করতে পারে না।

হে অর্জুন! আমি নিয়ন্ত্রক রূপে থাকায় আমার ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করে এবং আমার সান্নিধান-বশতই জগৎ নানাভাবে পরিণত হয়ে থাকে।

কিন্তু ব্যর্থমনোরথ, নিষ্ফলকর্মা, বিফলবুদ্ধি ও বিকৃতচিত্ত মূর্খ লোকেরা মোহকারিণী রাক্ষস প্রকৃতি কিংবা অসুর প্রকৃতি অবলম্বন করে। তারা আমার সর্ব পরিচালক পরব্রতভাব জানতে না পেরে—আমি মনুষ্যমূর্তি ধারণ করেছি ভেবে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে।

হে অর্জুন! দেবপ্রকৃতি মহাত্মারা আমাকে জগতের কারণ ও অবিনশ্বর, পরমেশ্বর জেনে একাগ্রচিত্তে আমার উপাসনা করেন।

কতকগুলি লোক ভক্তি সহকারে সর্বদাই আমার মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। অনেকে দৃঢ় নিয়মযুক্ত হয়ে আমার অনুগ্রহ লাভের জন্যে আমার আরাধনা করেন। অন্য কতকগুলি লোক, ভক্তিপূর্বক আমাকে নমস্কার করতে থেকে আমার উপাসনা করেন এবং অপর অনেক লোক সর্বদা একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করতে থেকে আমার আরাধনা করেন।

অন্য অনেকে তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞ দ্বারা বিশ্বরূপী আমার পূজা করতে থেকে আমার উপাসনা করেন। অনেকে আমাকে এক ভেবে, বহু লোক আমাকে পৃথক মনে করে এবং কেউ কেউ বা বহু প্রকারে আমার আরাধনা করেন।

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি শ্রাদ্ধ, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি অগ্নি এবং আমিই হোম।

আমি এই জগতের পিতা, আমি মাতা, আমি পোষণকর্তা, আমি পিতামহ, আমি জ্ঞেয়, আমি পাপনাশক তীর্থস্থান প্রভৃতি।

আমি ওঙ্কার, আমি ঋগ্বেদ, আমি যজুর্বেদ এবং আমিই অথর্ববেদ।

আমি কর্মফল, আমি পালয়িতা, আমি প্রভু, আমি সর্বদর্শী, আমি আশ্রয়, আমি রক্ষক, আমি সুহৃৎ; আমিই সৃষ্টিকর্তা, আমি সংহারকর্তা, আমি গম্যস্থান, আমি কর্মসমর্পণের পাত্র এবং আমি অবিনাশী বীজ।

হে অর্জুন! আমি সূর্যরূপে যথাসময়ে তাপ দান করি। জল আকর্ষণ করি। আবার যথাসময়ে সেই জল বর্ষণ করি। আমিই প্রাণিগণের জীবন ও মৃত্যু এবং আমিই সৎ ও অসৎ।

ঋক, যজু ও সাম—এই বেদত্রয়বিৎ যে যাজ্ঞিকেরা অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ দ্বারা আমার পূজা করে এবং তার অবশিষ্ট সোমরস পানে নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গে গমন করেন, তাঁরা পুণ্যলভ্য ইন্দ্রলোকে গমন করে সে স্থানে অলৌকিক দেবভোগ সকল প্রাপ্ত হন।

তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গলোকের সর্বপ্রকার ভোগসুখ লাভ করেন। পুণ্যক্ষয় হলে আবার মর্তলোকে প্রবেশ করেন। এইভাবে সেই কাম্যকার্যকারীরা, বেদোক্ত কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান-পূর্বক পুণ্য লাভ করে স্বর্গে ও মর্তে কেবল যাতায়াতই করতে থাকেন।

যে সকল লোক অন্য কামনা পরিত্যাগ করে আমার ধ্যানেই নিরত থেকে সর্বতোভাবে আমারই উপাসনা করে, সর্বদা আমাতে সমাহিতচিত্ত—সেই সকল লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায় আমিই করি।

হে অর্জুন! যারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অন্য দেবতার পূজা করে, তাঁরাও অজ্ঞানতা-পূর্বক আমারই পূজা করে।

আমিই যে সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা—এই বিষয়টি যথার্থরূপে তারা জানে না। তাই তারা নিষ্কাম কর্মফলমুক্তি থেকে ভ্রষ্ট হন।

অন্যান্য দেবতার পূজকেরা সেই সেই দেবতা লাভ করে। পিতৃলোক-সেবকেরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। ভূতযাজীরা ভূতে মিলিত হন, আর আমার উপাসকেরা আমাকে লাভ করে থাকেন।

যে লোক ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত লোকের ভক্তিপ্রদত্ত সে-সমস্ত বস্তুই ভোগ করে থাকি।

হে অর্জুন! তুমি যে কর্ম কর, যে ভোজন কর, অগ্নিতে যা নিক্ষেপ কর, যে দান কর এবং যে তপস্যা কর, সে সমস্তই আমাতে সমর্পণ কর।

এরূপ করলে তুমি শুভাশুভ ফলজনক কর্মের হাত থেকে মুক্তি পাবে, অর্থাৎ কর্মফলত্যাগী হয়ে জীবিত অবস্থায় জীবন্মুক্ত হবে এবং দেহত্যাগের পর আমাতে লীন হবে।

আমি সকল প্রাণীর বিষয়েই সমান। সুতরাং কেউই স্বভাবত আমার বিদ্বেষের বা প্রীতির পাত্র নয়। তবে যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমার সেবা করেন, তাঁরা আমার ভেতরে থাকেন। আমিও তাঁদের ভেতরে থাকি।

মানুষ পূর্বে গুরুতর পাপাচরণ করেও পরে যদি অনন্যসেবী হয়ে আমার সেবা করেন—তাহলেও তাঁকে সাধু বলেই মনে করতে হবে। কেন না, তিনি সেরূপ করায় যথার্থ বুদ্ধির কাজই করেন।

সেই দুরাচারপরায়ণ লোক আমার ভক্তির মাহাত্ম্যে সত্বরই ধার্মিক হয়ে পড়েন এবং চিরকালের জন্যে তাঁর দুরাচার নিবৃত্তি পায়। অতএব অর্জুন! তুমি আমার এই কথাটিকে প্রতিজ্ঞার মতো স্মরণে রেখ যে আমার ভক্ত নষ্ট হয় না।

হে অর্জুন! যাঁরা নিকৃষ্ট জাতি কিংবা স্ত্রীজাতি বা বৈশ্য-জাতি অথবা শূদ্রজাতি, তাঁরাও ভক্তিপূর্বক আমার শরণাপন্ন হয়ে পরম গতিই লাভ করেন।

অতএব পবিত্র ব্রাহ্মণগণ এবং ধার্মিক ক্ষত্রিয়গণ আমার ভক্ত হয়ে

যে পরম গতি লাভ করবেন—এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য থাকতে পারে? সুতরাং অর্জুন, তুমি এই অনিত্য এবং অসুখময় মনুষ্যদেহ লাভ করে আমাকে ভক্তি কর।

আমার প্রতি মনোনিবেশ কর। আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। এভাবে সৎপরায়ণ হয়ে এবং আমাতে চিত্ত সমাহিত করে আমাকেই লাভ করতে পারবে।

দশম অধ্যায়

কৃষ্ণ বললেন, মহাবাহু অর্জুন! আমি তোমারই হিতকামনা-বশত প্রীতিসম্পন্ন হয়ে তোমার নিকট যা বলব, আমার সেই উত্তম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর।

দেবগণ বা মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তির বিষয় জানেন না। কারণ আমি সর্ব প্রকারেই দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি।

মানুষের মধ্যে মোহশূন্য যে মানুষ, আমাকে আদিবিহীন, জন্মরহিত এবং সর্বলোকের নিয়ন্তা বলে মান্য করেন, সেই মানুষ সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়।

বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহশূন্যতা, ক্ষমা, সত্য, বাহিরিন্দ্রিয় দমন, সুখ, দুঃখ, উৎপত্তি, বিনাশ, ভয়, আশ্বাস, অহিংসা, মনের নির্বিকারতা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ ও নিন্দা—মানবগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভৃগু ও প্রকৃতি সাতজন, সনক প্রভৃতি চারজন—এই এগারজন প্রাচীন মহর্ষি এবং স্বয়ম্ভু প্রভৃতি চোদ্দজন, সৎপরায়ণ এই মহাত্মারা ব্রহ্মরূপী আমার মন থেকেই জন্মেছিলেন। জগতের এই সকল লোক তাঁদের সন্তান।

যে লোক আমার এই সম্পদ এবং এদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যথার্থ রূপে জানেন, সেই লোক যে অবিচলিত যোগযুক্ত হয়—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ। আমা হতে বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত ভাব উদ্ভূত হয়। এটি বুঝে জ্ঞানীরা সর্বদা আমার ধ্যানে মগ্ন হয়ে আমার সেবা করতে থাকেন।

জ্ঞানীরা সর্বদাই আমাতে চিত্ত সমর্পিত করে রাখেন। আমার উপাসনার জন্যেই তাঁদের জীবন—এরূপ মনে করেন এবং সভা প্রভৃতি স্থানে আমার বিষয়ই পরস্পরকে বোঝাতে থাকেন আর শিষ্যদের নিকট আমার বিষয়ই বলেন। এইভাবে তাঁরা সর্বদাই সন্তুষ্ট ও নিমগ্ন থাকেন।

প্রীতিপূর্বক আমার সেবাকারী এবং আমাতে নিবেদিতচিত্ত সেই জ্ঞানীগণকে সেইরূপ জ্ঞান দান করে থাকি—যার দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করতে পারেন।

আমি সেবকদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে থেকে দয়া প্রকাশ করার জন্যে উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁদের অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করে থাকি।

অর্জুন বললেন, দেব! আপনি পরব্রহ্ম, পরম তেজ ও অত্যন্ত পবিত্র। কেন না সকল ঋষি, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও বেদব্যাস আপনাকে পুরুষ, নিত্য, অলৌকিক, আদিদেব, জন্মহীন ও সর্বব্যাপক বলে থাকেন এবং আপনি নিজেও তা বলছেন।

হে কেশব! তুমি আমার নিকট যা বললে, তা সমস্তই আমি সত্য বলে মনে করি। কারণ, হে ভগবান! দেবগণ বা দানবগণও আপনার আবির্ভাবের কারণ জানেন না।

হে পুরুষোত্তম! হে সমস্ত ভূতের উৎপাদক। হে সকল ভূতের অধীশ্বর! হে দেবগণেরও আরাধ্য! হে বিশ্বপালক! আপনি নিজেই নিজেকে জানেন।

আপনি যে সকল বিভূতি (সম্পদ) দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত রয়েছেন, আপনার সেই বিভূতিগুলি অলৌকিক বটে। অতএব আপনি আপনার সেই বিভূতিসকল আমার কাছে বলতে পারেন।

হে মহাপ্রভাবশালীন! আমি সর্বদা ধ্যান করেও কিভাবে আপনাকে জানতে পারব? ভগবন্! আমি কোন কোন পদার্থে আপনাকে চিন্তা করব?

হে জনার্দন! আপনি পুনরায় বিস্তারিত ভাবে সর্বভূতের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ ও সম্পদের কথন বলুন। কারণ আপনার অমৃতময় বাক্য শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।

কৃষ্ণ বললেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতিসকল অলৌকিকই বটে। তবে তার মধ্যেকার প্রধান প্রধান বিভূতিগুলিই তোমাকে বলব। কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই।

হে অর্জুন! আমি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়স্থিত জীবাত্মা এবং আমি সকল পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ।

দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামে আদিত্য, তেজোময় পদার্থের মধ্যে আমি ব্যাপ্ত-কিরণশালী সূর্য। ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি নামক বায়ু এবং রাত্রিতে আকাশে দীপ্তিশালী পদার্থের মধ্যে আমি চন্দ্র।

আমি চার বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন এবং প্রাণিগণের মধ্যে চেতনা।

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চ পর্বতের মধ্যে আমি সুমেরু।

হে অর্জুন! তুমি আমাকে রাজপুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলে অবগত হও। সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্তিক, এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সমুদ্র।

আমি মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু। পদরূপ বাক্যের মধ্যে প্রণব, যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ এবং স্থাবরসমূহের মধ্যে হিমালয়।

আমি সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ। দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ। গন্ধর্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ এবং স্থাবরসমূহের মধ্যে

হিমালয় এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি।

হে অর্জুন! তুমি আমাকে অশ্বের মধ্যে ক্ষীরোদ সাগরোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তিশ্রেষ্ঠ মধ্যে ঐরাবত এবং মানুষের মধ্যে রাজা বলে জেনো।

আমি অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, কামের মধ্যে সন্তান উৎপত্তির হেতু কাম এবং সর্পের মধ্যে বাসুকি।

আমি নাগের মধ্যে অনন্ত। জলজন্তুর মধ্যে বরুণ। পিতৃলোকের মধ্যে অর্যমা এবং নিয়মকারীগণের মধ্যে যম।

আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ। সংখ্যাকারিগণের মধ্যে কাল, পশুগণের মধ্যে সিংহ এবং পক্ষীসমূহের মধ্যে গরুড়। আমি বেগগামীদের মধ্যে বায়ু, অস্ত্রধারিগণের মধ্যে দাশরথি রাম, মৎস্যের মধ্যে মকর এবং নদীর মধ্যে গঙ্গা।

হে অর্জুন! আমি ভৌতিক সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত। বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা এবং বাদ, বিতণ্ডা ও জল্প—এই তিন প্রকার কথার মধ্যে আমি বাদ।

আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে আকার। সমাসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস, অক্ষয় কাল এবং সর্বব্যাপী কর্মফলদাতা বিধাতা।

আমি সর্বহারী মৃত্যু, উন্নতিশীল লোকদিগের উন্নতির কারণ এবং নারীজাতির মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের মধ্যে আমি গায়ত্রী, বারোটি মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ মাস এবং ছটি ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু।

আমি প্রতারণাকারীদের দ্যূতক্রীড়া, প্রভাবশালীদের প্রভাব, জয়ীদের জয়, উদ্যমীদের উদ্যম এবং সাত্ত্বিকগণের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য।

আমি যদুবংশীয়গণের মধ্যে কৃষ্ণ। পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুন।

মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য।

আমি দমনকারিগণের দমনের প্রধান উপায়দণ্ড। জয়াভিলাষিদিগের নীতি, গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে মুনিভাব এবং তত্ত্বজ্ঞানিদিগের তত্ত্বজ্ঞান।

হে অর্জুন! সমস্ত ভূতের যে কিছু বীজ, সে সকলই আমি। আমা ব্যতীত যা থাকতে পারে, এমন স্থাবর বা জঙ্গম কোনো ভূতই নেই।

পরন্তপ অর্জুন! আমার উত্তম বিভূতিগুলির শেষ নেই। কিন্তু পূর্ব অপেক্ষা বিস্তৃত হলেও তা তোমার নিকট সংক্ষেপে বললাম।

হে অর্জুন! জগতে ঐশ্বর্যশালী, শোভাযুক্ত কিংবা যে যে বস্তু আছে সেই সেই বস্তুকেই তুমি আমার তেজের অংশ-সম্ভূত বলে অবগত হও।

অথবা অর্জুন! এত বেশী জ্ঞাত হয়ে তোমার কী হবে? আমি আমার এক অংশ দ্বারা এই জগৎ ব্যাপী অবস্থান করছি।

একাদশ অধ্যায়

অর্জুন বললেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার জন্যে গোপনীয় ও উত্তম আত্মবিষয়ে যে কথাগুলি বলেছেন তাতে আমার এই ভ্রম দূরীভূত হয়েছে।

হে পদ্মপলাশলোচন! আমি আপনার নিকট থেকে বিস্তরক্রমে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কথা শ্রবণ করলাম এবং আপনার অক্ষর মাহাত্ম্যের কথাও শুনলাম।

হে পরমেশ্বর! আপনি আপনার সম্বন্ধে যা বললেন, তা সত্য। হে পুরুষোত্তম! আমি আপনার পরমেশ্বর রূপ দেখার ইচ্ছে করি।

প্রভু! আমি আপনার সেই রূপ দেখার যোগ্য—যদি এমন

মনে করেন, তবে যোগেশ্বর! আপনি আমাকে আপনার সেই অবিনশ্বর রূপ দর্শন করান।

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! তুমি আমার শত শত ও সহস্র সহস্র রূপ দর্শন কর। সেগুলি নানাপ্রকার, অলৌকিক, বহুবর্ণ এবং বহুবিধ আকৃতিবিশিষ্ট।

হে ভরতনন্দন! তুমি আমার রূপে দ্বাদশাদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দুই অশ্বিনীকুমার এবং ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু দর্শন কর। আর পূর্বে যা দেখ নি—সেরূপ অনেক আশ্চর্য রূপ অবলোকন কর।

হে অর্জুন! তুমি এখনই আমার এই শরীরের এক অংশে স্থিত সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম-সমন্বিত সমগ্র জগৎ দর্শন কর এবং অন্য যা কিছু দর্শন করার ইচ্ছে কর তা-ও দর্শন কর।

কিন্তু অর্জুন! তুমি তোমার এই স্বাভাবিক চর্মচক্ষু দ্বারা আমার রূপ দেখতে সমর্থ হবে না। সুতরাং তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দান করছি। তার সাহায্যেই তুমি আমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন কর।

সঞ্জয় বললেন, রাজা! মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণ এরূপ বলার পর অর্জুনকে ঐশ্বরিক বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। সেই বিশ্বরূপে বহুতর মুখ, অসংখ্য নয়ন, অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য, অলৌকিক অসংখ্য অলঙ্কার এবং উত্তোলিত বহুতর অস্ত্র ছিল। আর সেই রূপের গলদেশে দিব্য মাল্য, পরিধানে সুন্দর বস্ত্র এবং অঙ্গে অলৌকিক গন্ধের অনুলেপন ছিল। বিশেষত সে রূপ সর্বাশ্চর্যময়, অসাধারণ দীপ্তিশালী, অসীম ও সকল দিকেই মুখযুক্ত ছিল।

আকাশে একদা যদি সহস্র সূর্যের প্রভা প্রকাশ পায়—তাহলেই সেই প্রভা সেই মহাত্মার তুল্য হতে পারে।

তখন অর্জুন দেবাদিদেব নারায়ণের সেই শরীরের এক অংশে নানাভাগে বিভক্ত সমগ্র জগৎ দেখতে পেলেন।

তারপর অর্জুন বিস্ময়াবিষ্ট ও রোমাঞ্চিত তনু হয়ে অবনত মস্তকে ভগবানকে নমস্কার করে কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন।

অর্জুন বললেন, দেব! আমি আপনার শরীরে সমস্ত দেবতা, সকল প্রাণী, আপনারই নাভিপদ্মস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি ঋষি এবং সমগ্র দিব্যসর্পগণকে দেখছি।

বিশ্বরূপ! বিশ্বনাথ! আমি আপনার অনেক বাহু, বৃহত্তর উদর, অসংখ্য মুখ ও অনেক নয়ন দেখছি এবং সকল দিকেই অসীম রূপ দর্শন করছি। তাই আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

ভগবন্! আমি দেখছি, আপনার মস্তকে মুকুট, দক্ষিণ হস্তে গদা ও বাম হস্তে চক্র। সকল দিকেই দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্জ, অতএব সকল দিকই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দ্যুতিময়। এই সকল কারণে চর্মচক্ষু দ্বারা আপনাকে দেখা দুষ্কর।

আপনি মোক্ষার্থীগণের জ্ঞাতব্য পরব্রহ্ম। আপনি এই জগতের পরম আশ্রয়। আপনি অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী ধর্মের রক্ষক, আমার মতে আপনিই সনাতন পুরুষ।

আপনার আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই। তারপর শক্তিরও সীমা নেই। বাহুরও সংখ্যা নেই। নয়ন দুটি সূর্য ও চন্দ্রের মতো জ্বলছে। মুখটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো উজ্জ্বল। বিশেষত আপনি আপনার তেজে এই জগৎটিকে সন্তপ্ত করছেন।

হে মহাত্মন্! বিশ্বরূপধারী একমাত্র আপনিই এই স্বর্গ ও মর্তের অভ্যন্তর দেশ (আকাশ) এবং সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করেছেন। যুদ্ধ দর্শনের নিমিত্ত আগত ত্রিভুবনের লোক আপনার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয়ে পীড়িত হয়ে পড়ছে।

অসুরাবতার ওই দুর্যোধন প্রভৃতি আপনার ভেতরে প্রবেশ করছে। কতকগুলি অসুরাবতার ভীত ও পলায়নে অসমর্থ হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার স্তব করছে। আর মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ

'জগতের মঙ্গল হোক' বলে পূর্ণাঙ্গ স্তুতিবাক্য দ্বারা স্তব করতে থেকে আপনাকে নিরীক্ষণ করছেন।

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু, পিতৃলোকগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ ও সিদ্ধগণ—এঁরা সকলে বিস্মিত হয়ে আপনাকে অবলোকন করছেন।

মহারাজ! সমাগত ধার্মিক লোকগণ আপনার এই বিশাল রূপ দেখে ভয়ে আকুল হয়েছেন এবং আমিও অস্থির হয়েছি। কারণ এই রূপে বহুতর মুখ, নয়ন, বাহু, ঊরু, চরণ ও উদর রয়েছে এবং অসংখ্য বিশাল দন্ত থাকায় অতিভীষণ হয়েছে।

হে বিষ্ণু! আপনার রূপ গগন স্পর্শ করেছে। উজ্জ্বল ও অনেক বর্ণ প্রকাশ পাচ্ছে। বিশাল নয়নগুলি জ্বলছে। এই রূপেও আপনি মুখব্যাদান করে রয়েছেন। সুতরাং আপনার এই রূপে আমার অন্তরাত্মা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাই আমি ধৈর্য ও শান্তি লাভ করতে পারছি না।

হে দেবেশ্বর! আপনার মুখগুলি প্রলয়কালে অগ্নিরাশির মতো জ্বলছে। দন্তসমূহ বার হয়ে আসায় সেগুলিকে অতি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। সুতরাং এই মুখগুলি দর্শন করে আমি দিগ্‌ভ্রমে পতিত হয়েছি এবং শান্তি লাভ করতে পারছি না। অতএব হে জগদাশ্রয়! আপনি প্রসন্ন হোন।

ওই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সকলে তৎপক্ষীয় রাজগণের সঙ্গে আপনার শরীরে প্রবেশ করছে। ওই ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ আমাদের পক্ষবর্তী যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠগণের সঙ্গে আপনার দন্তবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মুখমধ্যে সত্বর প্রবেশ করছেন এবং এঁদের মধ্যেই কতকগুলি বীর আপনার দন্তান্তরে সংলগ্ন হয়ে চূর্ণিত মস্তকে রয়েছেন বলে দেখা যাচ্ছে।

নদীসমূহের বহুতর স্রোত যেমন সমুদ্রে পতিত হয়, তেমনি

ওই মনুষ্যবীরেরা আপনার উজ্জ্বল মুখসমূহের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

বেগবান পতঙ্গসকল যেমন আপনাদের মৃত্যুর জন্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই বেগবান লোকগুলি মৃত্যুর জন্যেই আপনারও মুখের ভিতরে প্রবেশ করছেন।

হে নারায়ণ! আপনিও উজ্জ্বল মুখসমূহ দ্বারা সকল দিকের সেই সকল লোককে গ্রাস করে ভক্ষণ করছেন এবং আপনার ভয়ঙ্কর কিরণগুলি তেজ দ্বারা সমগ্র জগৎকে পরিপূর্ণ করে সন্তপ্ত করছে।

হে দেবশ্রেষ্ঠ! এই ভয়ঙ্কর-মূর্তি আপনি কে? আমাকে বলুন, জগতের আদি কারণ আপনাকে আমি জানতে ইচ্ছে করি এবং আপনার অভিপ্রায়ও আমার কাছে দুর্বোধ্য! আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি প্রসন্ন হোন।

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন! আমি লোকক্ষয়কারী অসাধারণ শক্তি-শালী কাল, এখন এই লোকগুলিকে সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। সুতরাং বিপক্ষ-সৈন্যমধ্যে যে সকল যোদ্ধা রয়েছেন, তাঁরা সকলে তোমা ব্যতীতও জীবিত থাকবেন না।

অতএব অর্জুন! তুমি দণ্ডায়মান হও। যশ লাভ কর। শত্রু-দিগকে জয় করে রাজ্য সমৃদ্ধশালী কর। আমি পূর্বেই এঁদের নিহত করেছি। তুমি এখন কেবল নিমিত্ত হও।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও অন্যান্য বীরগণকে আমিই নিহত করে রেখেছি। তুমি কেবল প্রহার কর। শোক-বেদনা অনুভব কোরো না। যুদ্ধ কর। যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করতে পারবে।

সঞ্জয় বললেন, কৃষ্ণের এই কথাগুলি শুনে অর্জুন অত্যন্ত ভীত, কম্পিত ও অবনত হয়ে নমস্কার করে কৃতাঞ্জলিপুটে ও গদগদ স্বরে পুনরায় কৃষ্ণকে বলতে লাগলেন।

অর্জুন বললেন, হে হৃষীকেশ! আপনার গুণকীর্তনে জগতের লোক যে আনন্দিত ও অনুরক্ত হয়, রাক্ষসেরা ভীত হয়ে যে দিগ্-

দিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধ পুরুষেরা যে নমস্কার করেন, সে সমস্তই সঙ্গত।

হে মহাত্মন্! আপনি ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং জগতের মধ্যে প্রধান গৌরবের পাত্র। অতএব সেই সিদ্ধ পুরুষেরা আপনাকে নমস্কার করবেন না কেন? হে অনন্ত! হে দেবেশ্বর! হে জগদাশ্রয়! কার্য—মহতত্ত্ব প্রভৃতি এবং কারণ—মূল প্রভৃতি—উভয় থেকেই যা উৎকৃষ্ট সেই ব্রহ্মাই আপনি।

হে অনন্তরূপ! আপনি আদিদেব, আপনি পুরুষ, আপনি প্রাচীন, আপনি এই জগতের পরম আশ্রয়, আপনি জ্ঞাতা, আপনি জ্ঞেয়, আপনি মহাতেজ এবং আপনি সারা জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।

আপনি বায়ু, আপনি যম, আপনি অগ্নি, আপনি বরুণ, আপনি চন্দ্র, আপনি প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ। অতএব সহস্রবার আপনাকে নমস্কার করি। বহুবার আপনাকে নমস্কার করি।

হে সর্বস্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। পৃষ্ঠে আপনাকে নমস্কার এবং সকল দিকেই আপনাকে নমস্কার করি। হে অনন্তবীর্য! আপনার বিক্রমও অপরিমিত। আর আপনি সবকিছুর মধ্যেই ব্যাপ্ত রয়েছেন—সেই জন্যেই সর্ব হয়েছেন।

হে ভগবন্! আমি আপনার মহিমা কিংবা এই বিশ্বরূপের বিষয় জানতাম না। তাই অনবধানতায় বা সৌহার্দবশত সখা মনে করে বলপূর্বক আপনাকে 'হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে!' ইত্যাদি বলেছি। অথবা ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন এবং ভোজনের সময় একাকী আপনার প্রতি কিংবা অন্যান্য সখাদের সমক্ষে আপনাকে পরিহাস করার জন্যে যে অবজ্ঞা করেছি, এখন আমি আপনার নিকট সেই সকল অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কেন না আপনার মহিমা অজ্ঞেয়।

হে নিরুপমপ্রভাব! নারায়ণ! আপনি এই চরাচর জগতের

পিতা। সকলেরই পূজনীয় ও উপদেষ্টা এবং সর্বাপেক্ষা অধিক গৌরবের পাত্র। ত্রিভুবনে আপনার তুল্য কোনো লোকই নেই। আপনার অপেক্ষা প্রধান লোক আর থাকবেই বা কি করে?

অতএব দেব! আমি আমার দেহটিকে ভূতলে দণ্ডের ন্যায় নিপাতিত করে আপনাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে প্রসন্ন করছি। আপনি তো জগতের অধীশ্বর, জগতের পূজনীয়। সুতরাং পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং পতি যেমন প্রিয়তমার অপরাধ ক্ষমা করেন, আপনিও সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

হে দেব! আমি আপনার অ-দৃষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করে আনন্দিত হয়েছি বটে, আবার আমার মন ভয়েও আকুল হয়েছে। অতএব হে দেবেশ্বর! আপনি আমাকে আবার সেই পূর্বরূপই দেখান। হে জগদাশ্রয়! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

বিশ্বরূপ! সহস্র বাহু! আমি আপনাকে সেইরূপই মস্তকে মুকুটযুক্ত এবং হস্তে গদা ও চক্রধারী অবস্থায় দেখার ইচ্ছে করি। অতএব আপনি আবার সেই দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্তি হোন। অথবা জন্মের সময়ে যেমন চতুর্ভুজ মূর্তি হয়েছিলেন—সেরূপ হোন।

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে নিজের ঐশ্বর্যের প্রভাবে এই তেজোময়, অবিনশ্বর, ও আদিম-উত্তম বিশ্বরূপ তোমাকে দেখালাম। আমার এই বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন অপর কেউই পূর্বে দেখতে পায় নি।

হে কুরুপ্রবীর। মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন কেউই বেদ পাঠ, যজ্ঞ, শাস্ত্রাধ্যায়ন, দান, ক্রিয়া এবং ভয়ঙ্কর তপস্যার দ্বারাও আমার বিশ্বরূপধারী রূপ—আমাকে দেখতে সমর্থ হন না।

হে অর্জুন! আমার এইরূপ ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে তোমার যেন কোনো বেদনা বা মোহ না হয়। তুমি এখন নির্ভয় ও সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে পুনরায় আমার সেই কৃষ্ণরূপই দর্শন কর।

সঞ্জয় বলল, মহাদয়াল, কৃষ্ণ অর্জুনকে এরূপ বলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় স্বকীয় রূপ প্রদর্শন করলেন এবং তিনি পুনরায় শান্ত মূর্তি হয়ে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন।

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! আমি তোমার এই সৌম্য মানব-মূর্তি দেখে এখন প্রাপ্তচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! তুমি আমার যে রূপ দেখলে, তা দর্শন করা অন্য মানুষের পক্ষে অতি দুষ্কর। কারণ দেবতারাও সর্বদাই এই রূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন।

হে অর্জুন! তুমি আমাকে যে রূপে দেখলে এ রূপে অন্য কেউই বেদপাঠ, তপস্যা, দান, বা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে দেখতে সমর্থ হন না।

কিন্তু পরন্তপ অর্জুন। মানুষ অনন্যগামিনী ভক্তি দ্বারাই যথাযথ ভাবে, এই রূপে আমাকে জানতে, দেখতে এবং আমাতে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

হে পাণ্ডুনন্দন! যে লোক আমার পূজা প্রভৃতি কার্যই করে, আমাকে প্রধান ভেবে অবলম্বন করে, আমার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠ, পুত্র কলত্রাদির প্রতি আসক্তিবিহীন হয় এবং সকল প্রাণীর প্রতিই শত্রুতাশূন্য থাকে—সেই লোকই আমাকে লাভ করে।

দ্বাদশ অধ্যায়

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! যে ভক্তেরা সর্বদা উদ্যোগী হয়ে এমত আকার যুক্ত তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁরা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর নিরাকার পরব্রহ্মের আরাধনা করেন। তাঁদের মধ্যে কারা প্রধান যোগবিৎ?

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন! দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত যে সকল ভক্ত সর্বদা উদ্যোগী হয়ে আমাতে মনোনিবেশ করে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই প্রধান যোগবিৎ।

আর যাঁরা সর্বত্র সমান বুদ্ধিসম্পন্ন ও সকল প্রাণীরই হিত-সাধনে নিরত হয়, ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত করে বাক্যের অগোচর, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সর্বব্যাপী, অচিন্তনীয়, কূটস্থ, নিষ্ক্রিয় ও নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁরাও আমাকেই লাভ করেন।

সেই নিরাকার ব্রহ্মোপাসকগণের অধিকতর ক্লেশ হয়ে থাকে। কারণ মানুষ, অতি দুঃখেই নিরাকার ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

হে অর্জুন! যাঁরা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে, সৎপরায়ণ হয়ে অনন্যচিত্তে ধ্যান করতে থেকে আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিবেশিতচিত্ত সেই ভক্তগণকে আমি সত্বরই মৃত্যুযন্ত্রণাযুক্ত সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করে থাকি।

অতএব হে অর্জুন! তুমি আমাতেই মনস্থাপন কর এবং আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কর। তাতে দেহত্যাগের পর আমাতেই অবস্থান করবে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

অথবা হে অর্জুন! তুমি যদি আমাতে নিশ্চলভাবে চিত্ত স্থাপন করতে না পার, তবে যোগাভ্যাস দ্বারা আমাকে লাভ করার প্রচেষ্টা কর।

হে অর্জুন! তুমি যদি সে অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার পুজো প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত হও। কেন না, আমার প্রীতির জন্যে কার্য করতে থেকেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে।

অথবা হে অর্জুন! তুমি যদি আমার প্রীতির জন্যেও কার্য করতে অসমর্থ হও, তাহলেও আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে সংযতচিত্ত ও যত্নশীল হয়ে সমস্ত কার্যের ফল ত্যাগ কর।

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান অপেক্ষা সর্ব কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কারণ সেই ত্যাগের ফলেই শান্তি লাভ হয়।

আমার যে ভক্ত কোনো প্রাণীর ওপরেই বিদ্বেষ করে না,

অথচ মিত্রভাবাপন্ন ও দয়ালু থাকে, মমতাযুক্ত ও অহঙ্কার শূন্য হয়, সুখে ও দুঃখে সমভাব যুক্ত থাকে, অপকারীকেও ক্ষমা করে, প্রয়োজনীয় বস্তু পেলে বা না পেলেও সবসময় সন্তুষ্ট থাকে, আমার আরাধনায় উদ্যোগী, সংযত-স্বভাব, আমার উপাসনায় দৃঢ়নিশ্চয় হয় এবং আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করে অবস্থান করে—সেই ভক্তই আমার প্রিয় হয়।

মানুষ যা থেকে উদ্বিগ্ন হয় না, আবার যে মানুষ থেকেও উদ্বেগ ভোগ করে না এবং স্বভাবতই আনন্দ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগবিহীন, আমার সেই ভক্ত লোকপ্রিয়।

আমার যে ভক্ত কোনও বস্তুর স্পৃহা করে না, ভিতরে ও বাইরে পবিত্র থাকেন, শত্রু ও মিত্রে উদাসীন হন, সর্ব প্রকার মনঃপীড়া বর্জন করেন এবং অর্জনরক্ষণাদি সর্বপ্রকার লৌকিক কার্য ত্যাগ করেন, সেই ভক্ত আমার প্রিয়।

যিনি ইষ্টলাভেও হৃষ্ট হন না, অনিষ্ট প্রাপ্তিতেও দ্বেষ করেন না; ইষ্টনাশেও শোকার্ত হন না, অপ্রাপ্ত বস্তুরও কামনা করেন না; সুখের কারণ ও দুঃখের কারণ উভয়কেই পরিত্যাগ করেন এবং যিনি আমাতে ভক্তিশীল হন, তিনি আমার প্রিয়।

শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ ও দুখে যাঁর সমান ভাব থাকে, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতির ওপরে যাঁর কোনও আসক্তি থাকে না, নিন্দা ও প্রশংসায় যাঁর দুঃখ বা সুখ হয় না, যাঁর বাক্য সংযত হয়, যদৃচ্ছালব্ধ যে কোনো বস্তু দ্বারা যিনি সন্তুষ্ট হন, যাঁর কোনো স্থায়ী গৃহ থাকে না, যাঁর আমার ওপর স্থিরবুদ্ধি ও অচলা ভক্তি থাকে, সেই লোক আমার প্রিয় হন।

যে সকল ভক্ত বিশ্বাসী ও সৎপরায়ণ হয়ে আমারই কথিত অমৃততুল্য এই ধর্মশাস্ত্রের সর্বপ্রকার আদর সম্মান করেন, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় হন।

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই সব আমি জানতে ইচ্ছা করি।

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! জ্ঞানীরা বলেন, এই শরীর হচ্ছে ক্ষেত্র। আর বিবেকিরা বলেন, এই শরীরটিকে যিনি জানেন—তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ।

হে ভরতনন্দন! তুমি জেনে রাখ যে, সর্বপ্রকার শরীরে যে জীব রয়েছেন, তা আমিই। অতএব শরীর ও জীবের যে ভেদজ্ঞান, তাই তত্ত্বজ্ঞান, এই-ই আমার অভিমত।

হে অর্জুন! সেই ক্ষেত্রের যা স্বরূপ, যা ধর্ম, যা বিকার, যা থেকে উৎপত্তি এবং যা অবস্থা, আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞের যা স্বভাব ও যেরূপ শক্তি, সে সমস্তই তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা তা বহুভাবে বলেছেন, নানাবিধ বেদ পৃথক পৃথক করে ব্যাখ্যা করেছেন এবং যুক্তিযুক্ত ও নিশ্চিত অর্থযুক্ত বেদান্তসূত্রগুলিও তা প্রকাশ করেছে।

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, দশটি বাহিরিন্দ্রিয়, একটি অন্তরিন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা ও ধৈর্য, বিকার যুক্ত এই পদার্থগুলিকে আমি ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করলাম।

বাক্য দ্বারা আত্মশ্লাঘা না করা, মনে মনেও আত্মশ্লাঘা না করা, পরহিংসা পরিত্যাগ, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, ভিতরে ও বাইরে পবিত্র থাকা, ধৈর্য ইন্দ্রিয়দমন, শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে অনুরাগ না থাকা, গর্ব পরিত্যাগ, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও রোগ, দুঃখ ও দোষের আলোচনা করা, পুত্র, কলত্র ও গৃহাদির ওপরে আসক্তি বা প্রীতি না থাকা, ইষ্ট বা অনিষ্ট উপস্থিত হলে হর্ষ বা বিষাদ না হওয়া, আমার ওপরে নিয়ত ভক্তি থাকা, পবিত্র স্থানে অবস্থান করা,

বিষয়ী-সমাজে অনুরাগ না থাকা, সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞান, আর মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা—এইগুলি তত্ত্বজ্ঞানের সাধন। আর এ সকল ছাড়া আত্মশ্লাঘা করা প্রভৃতি অজ্ঞানের সাধন!

যা জ্ঞাতব্য, তা এখন বিশদভাবে বলব—মুমুক্ষুগণ যা জেনে মুক্তি লাভ করেন। অনাদি ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য বস্তু। তাঁকে সৎও বলা যায় না—অসৎও না।

যিনি সকল প্রাণীর দেহেরই হস্ত ও চরণকে গ্রহণ ও গমনকার্যে প্রবর্তিত করেন, যিনি সকল প্রাণীর দেহেরই নয়ন, মস্তক, ও মুখকে আপন আপন কার্যে নিযুক্ত করেন, সেই জীবরূপ ব্রহ্ম জগতে সকল দেহ ব্যেপেই অবস্থান করে।

ব্রহ্মসকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলিকে প্রকাশ করেন অথচ তিনি সকল ইন্দ্রিয়বিহীন। ব্রহ্ম কোনো পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত নন অথচ সকল পদার্থ ধারণ করেন এবং ব্রহ্ম সত্ত্ব প্রভৃতি গুণবিহীন, অথচ গুণগুলি ভোগ করেন।

ব্রহ্ম পদার্থসমূহের বাইরে ও ভিতরে আছেন এবং স্থাবর-জঙ্গম সকল পদার্থেই তিনি। তবে তিনি সূক্ষ্ম বলে তাঁকে বিশেষ রূপে জানা যায় না।

সেই ব্রহ্ম অবিভক্ত হয়েও প্রত্যেক ভূতেই যেন বিভক্ত হয়ে রয়েছেন এবং তিনিই সমস্ত ভূতের সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার করেন।

সেই ব্রহ্ম তেজেরও তেজ, অজ্ঞানন্ধকারের অতীত, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানযোগ্য জ্ঞানলভ্যও বটে এবং সকল প্রাণীর হৃদয়ে আছেন।

হে অর্জুন! এই আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে বললাম। আমার ভক্ত এসব জেনে আমায় লাভ করতে পারেন।

হে অর্জুন! প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দু'টিকে তুমি অনাদি ও অনন্ত বলে জানবে। আর মহত্ত্ব প্রভৃতি বিকার এবং সুখ, দুঃখ ও মোহ—এইগুলিকে প্রকৃতির কার্য বলে জেনে রেখো!

কপিল প্রভৃতি সাংখ্যাচার্যেরা বলেন, প্রকৃতি শরীর ও ভোগ-সাধক ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির কারণ এবং পুরুষ বা জীব সুখ, দুঃখ ও মোহভোগের হেতু।

পুরুষ দেহাকারে পরিণত প্রকৃতিতে থেকে প্রকৃতির গুণ, সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রভৃতি ভোগ করেন এবং পুরুষের সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রভৃতির অভিলাষই তাঁর উৎকৃষ্ট মাধ্যম ও নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মের কারণ।

প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পুরুষ এই দেহে অবস্থান করলে, তাঁকে নিকটবর্তী সাক্ষী, অনুমোদক, রক্ষক, ভোগ-সম্পাদক, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলা হয়।

যিনি এভাবে পুরুষকে এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি বিকারসমূহের সঙ্গে প্রকৃতিতে অবগত হতে পারেন, তিনি পুণ্য বা পাপে প্রবৃত্ত হয়েও আর জন্মগ্রহণ করেন না।

কতকগুলি যোগী মন দ্বারা ধ্যানের বলে আপনাতেই আত্ম-দর্শন করেন। অন্য যোগিরা সাংখ্যসম্মত উপায়ে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং অপর যোগিরা কর্ম দ্বারা আত্মদর্শন করে থাকেন।

অন্য যোগিরা উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের কোনো উপায়ই না জেনে কেবল অন্যের নিকট শ্রবণ করে ভগবানের উপাসনা করতে থাকেন। শ্রবণে বিশ্বাসকারী সেই যোগিরাও অবশ্যই মৃত্যু অতিক্রম করতে পারেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! স্থাবর ও জঙ্গম-স্বরূপ যা কিছু বস্তু উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উদ্ভূত হয়—এটিই তুমি জেনে রাখ।

যে লোক সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত এবং সর্বভূত বিনষ্ট হলেও অবিনাশী পরমেশ্বর—পরমাত্মাকে দর্শন করেন—সেই লোকই বাস্তবিক তত্ত্বদর্শী।

যেহেতু সেই সমদর্শী, সর্বভূতে অবস্থিত ও সর্বনিয়ন্তা

পরমাত্মাকে সমান রূপে দর্শন করায় নিজে পরমাত্মার প্রতি হিংসা করে না, সে হেতুই তিনি পরম গতি লাভ করেন।

প্রকৃতিই সকল কার্য করেন, কিন্তু আত্মা কোনো কার্য করেন না—এরূপ যিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

প্রলয়কালে সকল পদার্থই ব্রহ্মে আশ্রয় নেয়, আবার সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম হতে বিস্মৃতি লাভ করে—এই সত্য যখন মানুষ জানতে পারে তখন সে ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

হে অর্জুন ! এই পরমাত্মা কারণহীন, গুণহীন বলে বিকারহীন এবং ইনি জীব শরীরে থেকেও কোনো কর্ম করেন না কিংবা কোনো কর্মফলে লিপ্ত হন না।

যেমন আকাশ সর্বব্যাপী হয়েও সূক্ষ্ম বলে কোনো বস্তুর সঙ্গেই মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ আত্মা সকল শরীরে অবস্থান করেও কোনো কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন না।

হে ভরতনন্দন ! এক সূর্য যেমন এই সমগ্র জগৎ প্রকাশ করে, সেরূপ এক পরমাত্মা সকল ক্ষেত্রকে (মহাভূত প্রভৃতি সকল পদার্থকে) প্রকাশ করেন।

যাঁরা জ্ঞান-নয়নে এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং প্রকৃতি থেকে আত্মার মুক্তির উপায় জানেন, তাঁরা মুক্তি লাভ করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

কৃষ্ণ বললেন, আমি তোমার নিকট সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে অত্যন্ত উত্তম জ্ঞানের বিষয় পুনরায় বলব—সেই সব জ্ঞান লাভ করে মুনিরা এই দেহবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।

সেই মুনিরা এই জ্ঞান অবলম্বনপূর্বক আমার স্বরূপতা লাভ করে সৃষ্টির সময়েও আর জন্মগ্রহণ করেন না বা প্রলয়ের সময়েও আর যাতনা লাভ করেন না।

হে ভরতনন্দন ! মূল প্রকৃতি আমার গর্ভাধান করার স্থান—

আমি সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই মূল প্রকৃতিতে গর্ভাধান করে থাকি। তারপর তা থেকে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়।

হে অর্জুন! যে সকল শরীর সর্বপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, প্রকৃতিই সেগুলির কারণ, অর্থাৎ মাতা। আর আমি সেগুলির জীবনদাতা পিতা।

হে মহাবাহু অর্জুন! স্বত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটি গুণ সকল দেহেই জীবকে বন্ধন করে রাখে।

হে নিষ্পাপ অর্জুন! তার মধ্যে নির্মল শান্ত স্বত্ত্বগুণ অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে সুখ ও বিষয়বোধের আসক্তি দ্বারা জীবকে বন্ধন করে।

হে অর্জুন! তুমি জেনে রাখ, রজোগুণ থেকে রাগ, তৃষ্ণা ও আসক্তি জন্মে এবং সেই রজোগুণ কার্য প্রবৃত্তির দ্বারা জীবকে বন্ধন করে।

হে ভরতনন্দন! তুমি এ-ও অবগত হও যে, তমোগুণ অজ্ঞানত থেকে উৎপন্ন হয় এবং সকল প্রাণীর ভ্রম উৎপাদন করে। আর প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বন্ধন করে রাখে।

হে ভরতনন্দন! স্বত্ত্বগুণ জীবকে সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা প্রভৃতি ব্যাপারে নিয়োজিত করে।

হে ভরতনন্দন! স্বত্ত্বগুণ, রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করে কখনও প্রবল হয়। রজোগুণ, স্বত্ত্ব ও তমোগুণকে জয় করে কোনো সময় বৃদ্ধি পায়। আবার তমোগুণও স্বত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করে এক এক সময়ে অধিক হয়ে থাকে।

এই দেহের সকল ইন্দ্রিয়ে যখন জ্ঞানরূপ প্রকাশ উপস্থিত হয়, তখন স্বত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানবে।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণ বিশেষ বৃদ্ধি পেলে লোভ, কার্যের প্রচেষ্টা, কার্যারম্ভ, আশার অনিবৃত্তি এবং অলভ্য লাভের ইচ্ছা—

এইগুলি উৎপন্ন হয়।

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ অধিক বৃদ্ধি পেলে অজ্ঞান, কর্তব্য-কার্যে অপ্রবৃত্তি, শ্রবণাদি কার্যে অমনোযোগ এবং ভ্রম—এইগুলি উপস্থিত হয়।

সত্ত্বগুণ বিশেষ বৃদ্ধি পেলে যদি প্রাণী প্রাণত্যাগ করে, তবে সে উত্তম দেবতাসেবকগণের প্রাপ্য—নির্দোষ লোকসকল প্রাপ্ত হয়।

রজোগুণের প্রবল অবস্থায় মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে কর্মাসক্ত মনুষ্য যোনীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণের বৃদ্ধির সময়ে মানুষ দেহত্যাগ করে পশুপক্ষী ও স্থাবর যোনিতে উৎপন্ন হয়।

মুনিরা বলেন, পূর্বজন্মে সাত্ত্বিক ধর্মকর্ম করে থাকলে ইহলোকে মানুষের নির্মল সুখ ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পূর্বজন্মে রাজসিক কার্য করে থাকলে ইহজন্মে দুঃখ হয়ে থাকে এবং পূর্বজন্মে তামসিক কাজকর্ম করে থাকলে ইহলোকে অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয়।

প্রধানত সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয়। আবার সেই জ্ঞান থেকে সুখ, লোভ থেকে দুঃখ এবং অজ্ঞানতা থেকে প্রমাদ ও মোহ জন্মে।

সত্ত্বগুণের কার্যকারী সাত্ত্বিক লোকেরা উর্ধে সত্যলোক পর্যন্ত গমন করেন। রজোগুণের কার্যকারী রাজসিক লোকেরা মর্তলোকে থাকেন। আর তমোগুণের কার্যকারী তামসিক লোকেরা নিচের দিকে প্রথমে নরকে গমন করে পরে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি ভিন্ন অপর কেহই করে না। জীব যখন এটি উপলব্ধি করে এবং প্রকৃতি ও তার কার্য—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি থেকে ব্রহ্ম ভিন্ন—যখন জীব এটি জ্ঞাত হয় তখন সেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

মানুষ, দেহের উৎপাদক এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু ও জরার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তি লাভ করে।

অর্জুন বললেন, হে প্রভু! যিনি এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেন

তিনি কি রকম লক্ষণসম্পন্ন হন ? তাঁর আচারই বা কিরূপ হয় ? কি প্রকারেই বা এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করা যায় ?

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন ! সত্ত্বগুণের কার্যপ্রকাশ, রজোগুণের কার্যপ্রবৃত্তি এবং তমোগুণের কার্যমোহ এগুলি দুঃখজনক হয়ে উপস্থিত হলেও যিনি ওগুলির ওপর বিদ্বেষ করেন না এবং সেগুলি গত হলেও—সুখজনক বলে পুনরায় আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁকে গুণাতীত বলা হয়। যিনি সর্বদা উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন, অথচ সুখ-দুঃখ-মোহে বিচলিত হন না—সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের ক্রিয়া চলছে মনে করে ধীর ভাবে থাকেন, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই অধীর হয়ে পড়েন না ; যিনি সর্বদা আত্মনিষ্ঠ ও ধীর হয়ে থাকেন, যাঁর কাছে সুখ ও দুঃখ সমান, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও স্বর্ণ সমান, প্রিয় ও অপ্রিয় সমান এবং নিন্দা ও প্রশংসা সমান এবং যিনি সম্মানে ও অপমানে সমান থাকেন, মিত্র ও শত্রুপক্ষকে সমান জ্ঞান করেন, দৈহিক কার্য ভিন্ন অপর সকল কার্যই পরিত্যাগ করেন, তাঁকে গুণাতীত বলে।

যিনি অনন্যগামিনী ভক্তি দ্বারা আমার সেবা করেন, তিনি এই গুণগুলি অতিক্রম করে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন।

হে অর্জুন ! আমি মুক্তিরূপ—অবিনশ্বর ব্রহ্মত্ব, চিরস্থায়ী ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কৃষ্ণ বললেন, বেদ ও মহর্ষিগণ বলেন, এই সংসার একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ-স্বরূপ। ঊর্ধ্ব (পরব্রহ্ম) এর মূল। ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত পদার্থ এর শাখা এবং ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রত্যহ নাশ ঘটলেও এর সম্পূর্ণ নাশ হয় না। আর বেদের কর্মকাণ্ড এর পর্ণ —যিনি এসব জানেন, তিনিই বেদবিৎ !

সেই সংসার-বৃক্ষের কতকগুলি শাখা নিচের দিকে এবং কতক-

গ্নলি শাখা ওপর দিকে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। সে সকল শাখাই জল-স্বরূপে সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ সেই বৃক্ষের পল্লব-স্বরূপ হয়ে রয়েছে। আর নিচের দিকে ও উপরের দিকে বিস্তৃত মূলগুলি মর্তলোকে কর্মানুষ্ঠান করিয়ে থাকে।

এই জগতের কোনো অজ্ঞানী লোকই এই সংসার-বৃক্ষের পূর্বোক্ত রূপ, অবস্থা বুঝতে পারে না কিংবা এর আদি, মধ্যও জানে না। মুমুর্ষু লোক দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা দৃঢ় বদ্ধমূল এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে ছেদন করে। তারপরে মানুষ সে পথে গমন করে আর প্রত্যাবর্তন করে না। যার থেকে অতি পূর্ব কালে এই সংসার-বৃক্ষ উৎপন্ন হয়ে বিস্তারক্রমে চলে আসছে, সেই আদি পুরুষেরই শরণ নিলাম—এরূপ স্থির করে সেই পরব্রহ্মের অন্বেষণ করেন।

যাঁদের অহঙ্কার ও মোহ থাকে না, রাগদ্বেষ প্রভৃতি সংসর্গ দোষ তিরোহিত হয়ে যায়, যাঁরা অধ্যাত্ম বিষয়েই আলোচনা করতে থাকে, যাঁদের কামনা একেবারে দূরীভূত হয়ে যায় এবং সুখ-দুঃখের ও শীত-গ্রীষ্মের সহিষ্ণুতা থাকে, সেইসকল জ্ঞানীরাই সেই বিকার-বিহীন পরব্রহ্মকে লাভ করতে পারেন।

যোগিরা যাঁকে লাভ করে আর ফিরে আসেন না, সেই পরব্রহ্মকে সূর্যও প্রকাশ করতে পারেন না, চন্দ্র ও না অগ্নিও না। সেই পরম তেজই আমি।

আমারই প্রতিবিম্ব জীবলোকে চিরস্থায়ী জীবরূপে গণ্য হয়ে চলেছে। আমার সেই প্রতিবিম্ব জীবলোকে চিরস্থায়ী, প্রকৃতিস্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের সঙ্গে আকর্ষণ করে স্ব স্ব কার্যে প্রবর্তিত করে থাকে।

বায়ু যেমন পুষ্প প্রভৃতি থেকে গন্ধ নিয়ে গমন করে, সেরূপ জীব যখন এই দেহ থেকে বার হয়, কিংবা অন্য দেহে প্রবেশ করে,

সেই দু' সময়েই মনের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়গুলিকেও নিয়ে যায়।

এই জীবাত্মা—কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা ও মনকে অবলম্বন করে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অনুভব করেন।

সুখ-দুঃখ-মোহান্বিত জীবাত্মা যখন স্থূলদেহ থেকে চলে যান, কিংবা স্থূলদেহে থাকেন অথবা বিষয় ভোগ করেন, তখন অজ্ঞানীরা তাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানিরা জ্ঞান-নয়নে দেখতে পান।

যত্নবান ও সমাহিতচিত্ত-যোগিরা আপনাতে অবস্থিত রূপেই পরমাত্মাকে দেখতে পান, কিন্তু অশোধিতচিত্ত, নিকৃষ্টচেতা লোকেরা যত্নবান হয়েও তাঁকে দেখতে পায় না।

হে অর্জুন! সূর্যস্থিত যে তেজ ও চন্দ্রস্থিত যে তেজ সমগ্র জগৎ প্রকাশ করে এবং অগ্নিস্থিত যে তেজ সমস্ত বস্তু প্রকাশ করে থাকে, সে সকল তেজই আমার বলে তুমি অবগত হও।

আমি পৃথিবীর নিচে গিয়ে অনন্তনাগ রূপে আপন শক্তিতে পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত ভূত ধারণ করছি এবং জলময় চন্দ্র হয়ে ধান্য ও যব প্রভৃতি সকল ওষধি পরিপুষ্ট করছি।

আমি অগ্নি রূপে প্রাণিগণের উদরের মধ্যে অবস্থান করে প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা বৃদ্ধি পেয়ে চতুর্বিধ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করতে থাকি।

আমি জীবরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে রয়েছি। সুতরাং আমা থেকে প্রাণিগণের স্মরণ ও জ্ঞান এবং বিস্মরণ ও অজ্ঞান হয়ে থাকে। বিশেষত সকল বেদেরই বেদ্য আমি এবং বেদান্ত সম্প্রদায় প্রবর্তক আমি, আর বেদজ্ঞও আমি।

বিবেকিরা বলেন, জগতে ক্ষর ও অক্ষর নামে দ্বিবিধ পুরুষ আছে, তার মধ্যে সকল শরীর—ক্ষর পুরুষ আর সেই শরীরস্থিত জীব অক্ষর পুরুষ।

যিনি সেই ক্ষর ও অক্ষরবিহীন, তিনি উত্তম পুরুষ বা

পুরুষোত্তম। জ্ঞানিরা তাঁকে পরমাত্মা বলেছেন। বিকার-বিহীন এবং আপন মায়া দ্বারা সর্বনিয়ন্তা সেই পরমাত্মা ত্রিভুবনে অধিষ্ঠান করে তা রক্ষা করছেন।

আমি যেহেতু ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম, সেই হেতু আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলে প্রসিদ্ধ হয়েছি।

হে ভরতনন্দন! মোহবিহীন যে লোক আমাকে এরূপ পুরুষোত্তম বলে জানে, সে লোক সর্বজ্ঞ হয়ে সর্বপ্রকারে আমার সেবা করে।

হে নিষ্পাপ ভরতনন্দন! আমি তোমার নিকট এই অতি গোপনীয় শাস্ত্র বললাম। মানুষ এসব জ্ঞাত হলে জ্ঞানী ও কৃতকার্য হয়।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

হে ভরতনন্দন! নির্ভরতা, মনের নির্মলতা, জ্ঞান, নিষ্ঠা, যোগাভ্যাস, দান, বাহিরিন্দ্রিয়দ মন, যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদপাঠ, তপস্যা, সরলতা, প্রাণীহিংসা না করা, সত্যাচরণ করা, ক্রোধ বর্জন, সন্ন্যাস, অন্তঃকরণ দমন, খলতা পরিত্যাগ, প্রাণিগণের ওপরে দয়া করা, কোমলতা, অকার্যকরণে লজ্জা, চাঞ্চল্য প্রকাশ না করা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, পবিত্রতা, কারও অপকার না করা এবং অভিমান ত্যাগ করা—এই গুণগুলি দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন লোকেরই হয়ে থাকে।

হে অর্জুন! কপটতা, গর্ব, অহঙ্কার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরোক্তি ও অজ্ঞানতা—এই দোষগুলি অসুরপ্রকৃতি যুক্ত লোকের জন্মে থাকে।

হে পাণ্ডুনন্দন! জ্ঞানিগণের মতে, দৈবীপ্রকৃতি জ্ঞান জন্মিয়ে মুক্তি সম্পাদন করে, আর আসুরীপ্রকৃতি অজ্ঞান রেখে কর্মই করাতে থাকে। অর্জুন! তুমি দৈবপ্রকৃতিসম্পন্ন হয়েই জন্মেছ, সুতরাং শোক কোরো না।

হে অর্জুন! এই জগতে দৈবী ও আসুরী—এই দ্বিবিধ প্রকৃতি

যুক্ত মনুষ্য সৃষ্টি দেখা যায়। তার মধ্যে বিস্তারিতভাবে দৈবী প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছি, এখন আমার কাছে আসুরী প্রবৃত্তির কথা শ্রবণ কর।

আসুর প্রকৃতির লোকেরা ধর্মে প্রবৃত্তির বিষয় বা তার শাস্ত্র, অধর্ম থেকে নিবৃত্তির বিষয় বা তার শাস্ত্র জ্ঞাত নয় এবং তাদের ভেতরে বা বাইরে পবিত্রতা থাকে না। সত্য ব্যবহারও থাকে না।

তারা বলে, জগতে বেদ প্রভৃতি সত্য নয়, ধর্ম বা অধর্ম নেই, ঈশ্বরও নেই। আর অধিক কী বলব, তারা বলে কাম-নিবন্ধন স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংযোগ থেকেই সৃষ্টি প্রবাহ চলছে।

এরূপ ধারণার আশ্রয় নিয়ে ভ্রষ্টবুদ্ধি ও অল্পবুদ্ধি সেই অসুরস্বভাব লোকেরা জগতের শত্রু হয়ে এবং ভয়াবহ কর্ম করতে থেকে জগতের ধ্বংসের জন্যেই প্রস্তুত হতে থাকে।

ছল, অহঙ্কার ও মত্ততাযুক্ত এবং অপবিত্র নিয়মশালী সেই অসুরস্বভাব লোকেরা দুষ্পূরণীয় কাম অবলম্বন-পূর্বক ভ্রমবশত অসৎ বুদ্ধি আশ্রয় করে ডাকিনী-সাধনাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

যারা মৃত্যুকাল পর্যন্ত অসংখ্য বিষয়েই চিন্তা করে, কামোপভোগ-কেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, 'ঐহিক সুখই ভোগ্য'—কিন্তু ভোক্তা না থাকায় পারলৌকিক সুখ ভোগ্য হতে পারে না, এরূপ কৃত নিশ্চয় হয়, শত শত আশাপাশে বদ্ধ থাকে এবং কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে চলে। সেই অসুরস্বভাব লোকেরা কামভোগের জন্যে অন্যায় উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করার চেষ্টা করে থাকে।

অদ্য আমি এই ধন লাভ করেছি, এই অভীষ্ট দ্রব্য লাভ করব, এই ধন আমার ঘরে সঞ্চিত আছে, পুনরায় এই ধন আমার হবে। এই শত্রুকে বধ করেছি, অপর শত্রুগুলিকেও বধ করব, আমি প্রভু, আমি ভোগী, আমি পুত্র-পৌত্রাদিসম্পন্ন, আমি বলবান, আমি সুখী, আমি ধনী এবং আমি সৎকুলজাত। অতএব আমার তুল্য কে আছে? আমি যজ্ঞ করব, দান করব এবং আমোদ করব—

এরূপ অজ্ঞানে বিমোহিত, বহু বিষয়গামীচিত্ত কর্তৃক ঘূর্ণিত, মোহজালে পরিবেষ্টিত এবং কামভোগে আসক্ত অসুরপ্রকৃতি লোকেরা অপবিত্র নরকে পতিত হয়।

নিজেরাই নিজেদের সম্মানকারী, ধনী বলে অভিমানী ও মত্ত, অহঙ্কার, বল, দর্প. কাম ও ক্রোধযুক্ত জীবরূপে নিজদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আমার ওপরে বিদ্বেষকারী এবং গুণিগণের ওপরেও দোষারোপকারী সেই অসুরস্বভাব লোকেরা ছল করে বিধি লঙ্ঘনপূর্বক যজ্ঞ ও দান করে।

আমার ওপর বিদ্বেষকারী, ক্রুরস্বভাব, লোকের অমঙ্গলজনক এবং সংসারের মধ্যে নরাধম সেই সকল লোককে আমি অনবরত আসুরী যোনিতে প্রেরণ করি।

হে অর্জুন! মূঢ় লোকেরা প্রত্যেক জন্মেই আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়ে আমাকে প্রাপ্তির পথ না লাভ করে ক্রমশ তা থেকে অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

কাম-ক্রোধ-লোভ এই তিন প্রকার নরকের দ্বার এবং আত্মার অধঃপাতজনক দোষ। এতএব আত্মার উন্নতিকারী লোক—এই তিনটিকে পরিত্যাগ করে।

অতএব অর্জুন! মানুষ নরকদ্বার-স্বরূপ এই তিনটিকে পরিত্যাগ করে নিজের মঙ্গলজনক সৎ কার্য করতে থাকলে—উত্তম গতি লাভ করে!

যে লোক শাস্ত্রের বিধি পরিত্যাগ করে আপন ইচ্ছা অনুসারে ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হয়, সে লোক সে কার্যের ফল লাভ করে না। সুখ লাভ করে না এবং মুক্তি লাভও করতে পারে না।

অতএব অর্জুন! তোমার কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ হোক, সেই শাস্ত্র বিধান অনুসারে এখন তোমার কার্য করা উচিত।

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! যারা শাস্ত্রের বিধান ত্যাগ করেও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেবপূজা প্রভৃতি করে, তাদের নিষ্ঠা কি প্রকার—সাত্ত্বিকী? না রাজসী? না তামসী?

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! মানুষের স্বভাবজাত সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকার হয়ে থাকে। তুমি তা শ্রবণ কর।

হে ভরতনন্দন! সকল মানুষেরই অন্তঃকরণের অনুরূপ শ্রদ্ধা হয়ে থাকে। কারণ এই সংসারী মানুষগুলি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ! সুতরাং যার যেরূপ শ্রদ্ধা থাকে সে লোক সেরূপ হয়।

সাত্ত্বিক লোকেরা দেবগণের এবং রাজসিক লোকেরা যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করে থাকে। আর তামসিক লোকেরা প্রেতগণ ও ভূতগণের পূজা করে।

কপটতা, অহঙ্কার, কাম, আসক্তি ও শক্তিযুক্ত এবং বিবেক-বিহীন যে সকল লোক শরীরস্থিত ভূতসমূহকে এবং শরীরের অভ্যন্তরবর্তী জীবরূপী আমাকে উপবাসাদিদ্বারা কৃশ করতে থেকে শাস্ত্রে অবিহিত ভয়ঙ্কর তপস্যা করে—তাদের অসুরপ্রকৃতি বলে জানবে।

হে অর্জুন! সমস্ত লোকের প্রিয় আহারও তিন প্রকারের হয়ে থাকে এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ত্রিবিধ হয়, আমি সেগুলির ভেদ বলছি, তুমি শ্রবণ কর।

আয়ু, অধ্যাবসায়, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্ধক এবং সুরস, স্নিগ্ধ, সারবান ও আনন্দজনক আহার সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়।

দুঃখ, অনুতাপ ও রোগজনক এবং কটু, অম্ল, লবণ, অধিক

উষ্ণ, তীক্ষ্ন, রুক্ষ ও জ্বালাকারক আহার রাজসিক লোকের প্রিয়।

যা পাক করার পর এক প্রহর অতীত হয়ে যায়, যার সারাংশ থাকে না, যা দুর্গন্ধ, যা পর্যুষিত (বাসি), যা উচ্ছিষ্ট এবং যা অপবিত্র, সেই খাদ্য তামসিক লোকের প্রিয়।

'যজ্ঞ করা একান্ত উচিত' এরূপ ভেবে মনটিকে একাগ্র করে এবং ফল কামনা না করে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে যে যজ্ঞ করা হয়, তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কোনও ফল কামনা করে কিংবা ধার্মিকতা প্রকাশের জন্যে যে যজ্ঞ করা হয়, সেই যজ্ঞকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে।

যে যজ্ঞে শাস্ত্রীয় বিধিবিধান থাকে না, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে অন্ন দান করা হয় না, মন্ত্রপাঠ করে না, শাস্ত্রোক্ত দক্ষিণা দেওয়া হয় না এবং বিশ্বাস থাকে না, সেই যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলা হয়।

পরিচর্যা প্রভৃতি দ্বারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞলোকদিগের সেবা করা, স্নানাদি দ্বারা পবিত্র থাকা, দৃষ্টি প্রভৃতির সরলতা, স্ত্রী সংসর্গ না করা এবং প্রাণিগণের হিংসা পরিত্যাগ করা—এগুলিকে কায়িক তপস্যা বলে।

যে বাক্যে পরের উদ্বেগ জন্মায় না, সত্য হয় এবং পরের প্রীতি ও হিত উৎপাদন করে, আর বারংবার যে বেদ পাঠ করা হয়, তাকে বাচনিক তপস্যা বলে।

মনের প্রসন্নতা, মনে রাগদ্বেষাদি না থাকা, মনে-মনে পরের মঙ্গল চিন্তা করা, স্বর্গাদি কামনা না করা এবং মনে পর-প্রতারণাদির চিন্তা না থাকা, এইগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।

ফলকামনাবিহীন লোকেরা একাগ্র চিত্ত হয়ে পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যা করেন, মুনিরা সেই তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলেন।

এই জগতের লোকের নিকট পরম সমাদর, গৌরব ও ধর্মাদিলাভের

জন্যে এবং ধার্মিকতা প্রকাশের নিমিত্ত মানুষ যে তপস্যা করে, মুনিরা সেই তপস্যাকে রাজস তপস্যা বলেছেন। এর ফল ক্ষণিক এবং অনিয়ত।

মূর্খের ধারণা অনুসারে নিজের পীড়া জন্মিয়ে মানুষ যে তপস্যা করে, কিংবা পরের ধ্বংসের জন্যে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, মুনিরা সেই তপস্যাকে তামস তপস্যা বলেছেন।

আমার দান করা আবশ্যক এরূপ মনে করে পুণ্যস্থানে ও পুণ্যকালে অনুপকারী পাত্রকে যে ন্যায়ার্জিত দ্রব্য দান করা হয় তা সাত্ত্বিক দান।

পূর্বকৃত উপকারের পরিশোধের জন্যে, কিংবা নতুন কোনো প্রত্যুপকার পাবার আশায় অথবা পারলৌকিক ফল লাভের উদ্দেশ্যে কি বা মনঃকষ্টের সঙ্গে যে দান করা হয়, সেই দানকে রাজসিক দান বলে জানবে।

অপবিত্র স্থানে এবং অপ্রশস্ত কালে অসৎ পাত্রকে যে দান করা হয়, কিংবা পবিত্র স্থানে এবং প্রশস্ত কালে অনাদর বা অবজ্ঞা-পূর্বক যে দান করা হয়, মুনিরা তাকে তামসিক দান বলেছেন।

বেদান্তবিদ্ লোকেরা 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিন প্রকার শব্দকে ব্রহ্মের নাম বলে স্মরণ করেছেন এবং পূর্বকালে ব্রহ্মা এই নাম উচ্চারণ করে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি, বেদের প্রকাশ ও যজ্ঞের আবিষ্কার করেছিলেন।

অতএব বেদবাদী লোকেরা 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করে সর্বদা বেদোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা আরম্ভ করে থাকেন।

মুমুক্ষু লোকেরা 'তৎ' এইরূপ ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করে ফল কামনা না করে নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান কার্য করে থাকেন।

হে অর্জুন! শিষ্টেরা বিদ্যমানতা ও সাধুতা অর্থে 'সৎ' এই ব্রহ্মের নামটি প্রয়োগ করে থাকেন এবং প্রশস্ত কার্যেও তাঁরা 'সৎ' এই শব্দের প্রয়োগ করেন।

যজ্ঞ, তপস্যা, ও দানে একাগ্রভাবে থাকাকে শিষ্টেরা 'সৎ' বলে থাকেন এবং ঈশ্বরোপাসনার কার্যকেও তাঁরা 'সৎ' বলেন।

হে অর্জুন! অশ্রদ্ধাপূর্বক যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা অন্য কর্ম করা হয়, শিষ্যেরা সেগুলিকে অসৎ কর্ম বলেন এবং সে কর্মগুলি ইহলোক বা পরলোকে কোনো ফল উৎপাদন করে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জুন বললেন, হে মহাবাহু! হৃষীকেশ! হে কেশিদানব বিনাশক! সন্ন্যাস ও ত্যাগের পৃথক তত্ত্ব জানার আমার ইচ্ছে হচ্ছে।

কৃষ্ণ বললেন, পণ্ডিতেরা বলেন, কাম্যকর্ম ত্যাগ করার নাম—সন্ন্যাস, আবার পণ্ডিতেরাই প্রকাশ করেন—সকল কর্মের ফল-কামনা ত্যাগ করার নাম—ত্যাগ।

সাংখ্যাচার্যেরা বলেন দোষযুক্ত কর্ম ত্যাগ করবে। আবার মীমাংসকেরা বলেন—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম দোষযুক্ত হলেও তা ত্যাগ করবে না।

হে পুরুষসিংহ! সেই ত্যাগের বিষয়ে আমি যা নিশ্চয় করেছি তা শ্রবণ কর। দেখ—আচার্যেরা বলেছেন, ত্যাগ তিন প্রকার।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য ত্যাগ করবে না, অবশ্যই তা পালন করবে। কারণ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য নিষ্কাম বিবেচকগণের পক্ষে পবিত্রতাজনক।

হে অর্জুন! ফলের প্রতি আসক্তি ও ফলের কামনা পরিত্যাগ করে সকল কার্য করবে। আমার মতে এটিই উত্তমরূপে নির্ধারিত পথ।

নিত্য কর্মের পরিত্যাগ সঙ্গত হতে পারে না। তথাপি ভ্রমবশত যে পরিত্যাগ—তাকে তামসিক ত্যাগ বলে।

এই কর্ম করতে গেলে কায়ক্লেশ হবে—এই ভেবে কায়ক্লেশের

ভয়ে যে নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করে সেই ত্যাগের নাম রাজসিক ত্যাগ। সে ত্যাগ করেও মানুষ ত্যাগের ফল লাভ করতে পারে না।

হে অর্জুন! 'নিত্য কর্ম অবশ্য কর্তব্য'। এরূপ জ্ঞান করে সেই নিত্যকর্মের ফলের প্রতি আসক্তি এবং তার ফলকামনা ত্যাগ করে নিত্যকর্ম যে করা হয়, সেই ত্যাগের নাম সাত্ত্বিক ত্যাগ।

স্থিরবুদ্ধি ও সংশয়বিহীন সাত্ত্বিক ত্যাগী লোক, কষ্টজনক কার্যের প্রতিও বিদ্বেষ করেন না। কিংবা সুখজনক কার্যেও আসক্ত হন না।

দেহধারী লোক সকল কার্য পরিত্যাগ করতে পারে না। অতএব যিনি কর্মের ফল কামনামাত্র ত্যাগ করতে পারেন তাকেই ত্যাগী বলা হয়।

কাম্যকর্মকারিগণের পরজন্মে অনিষ্ট, ইষ্ট ও ভয় মিশ্রিত —এই তিন প্রকার কর্মফল হয়। কিন্তু ত্যাগিদিগের কখনও কর্মফল হয় না।

হে মহাবাহু অর্জুন! সমস্ত কার্যসিদ্ধির প্রতি এই পাঁচটি কারণ তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। এগুলি চরম সিদ্ধান্তকারী সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত রয়েছে।

স্থূলদেহ, জীব, নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়, পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়ের নানাবিধ ব্যাপার এবং পঞ্চম—দৈব।

মানুষ শরীর বাক্য ও মন দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কার্য করে এই পাঁচটিই তার কারণ।

এরূপ হলে সেই লোক অসংস্কৃত বুদ্ধির জন্য নিষ্ক্রিয় আত্মাকে কর্তা বলে মনে করে। বিবেকহীন সেই লোক যথার্থ বিষয় বোঝে না।

'আমি কর্তা' আত্মার ওপর যাঁর এরূপ কর্তৃত্বাভিমান থাকে না কিংবা যাঁর বুদ্ধি কর্ম সজ্জা : হর্ষবিষাদে লিপ্ত হয় না, তিনি এই সকল লোক বধ করেও বধ করেন না বা বধ্য হন না।

কর্মে প্রবর্তক তিন প্রকার। যথা—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা। ক্রিয়ার আশ্রয়ও প্রধানত তিন প্রকার। যথা—করণ, কর্ম ও কর্তা।

হে অর্জুন! সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, ক্রিয়া ও কর্তা—এই তিনটির প্রত্যেকটিকেই সত্ত্বাদি গুণ ভেদে তিন প্রকার বলে হয়েছে। তুমি তা-ও যথাযথভাবে শ্রবণ কর।

মানুষ যে জ্ঞানের বলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত সকল প্রাণীতে অবিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় ও জন্মাদি বিকারবিহীন আত্মাকে দেখতে পায়, সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে অবগত হও।

মানুষ যে জ্ঞানের বলে দেহের পার্থক্যবশত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বহুতর আত্মা আছে বলে ধারণা করে, সে জ্ঞানকে তুমি রাজস জ্ঞান বলে অবগত হও।

'এই শরীরটিই আত্মা' এবং 'এই প্রতিমাটিই পরমেশ্বর' এই ভাবে কোনো একটি শরীরে কিংবা কোনো প্রতিমা প্রভৃতি বস্তুতে যে জ্ঞান সর্ব বিষয়ের মতো সংলগ্ন থাকে, যে জ্ঞানে কোনো যুক্তি থাকে না, যে জ্ঞান মিথ্যা এবং যে জ্ঞান অল্প বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে তাকে তামস জ্ঞান বলে।

যা নিত্য বা নৈমিত্তিক, যাতে অহংকারের সম্পর্ক থাকে না এবং মানুষ ফলপ্রার্থী হয়ে কিংবা রাগ বা দ্বেষবশত যে কর্ম করে না—সেই কর্মকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।

মানুষ ফলপ্রার্থী কিংবা অহঙ্কার যুক্ত হয়ে বহু পরিশ্রমে যে কার্য করে, সেই কার্যকে রাজস কার্য বলে।

ভাবী অমঙ্গল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয়, পরপীড়া এবং আপন শক্তির পর্যালোচনা না করে কেবল মোহবশত যে কার্য আরম্ভ করা হয়, তাকে তামস কর্ম বলে।

ফলাসক্তিবিহীন, অহংকারশূন্য ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত ও ফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার কর্তাকে সাত্ত্বিক কর্তা বলে।

কামযুক্ত, কর্মফলার্থী, লুব্ধ, হিংস্রস্বভাব, অপবিত্র এবং

ফলসিদ্ধিতে হর্ষযুক্ত ও ফলাসিদ্ধিতে শোকান্বিত কর্তাকে রাজস কর্তা বলে।

কার্যে অমনোযোগী, অশিক্ষিত, অনবনত, শঠ, পরের বৃত্তিচ্ছেদক, অলস, বিষাদশীল ও দীর্ঘসূত্রী কর্তাকে তামস কর্তা বলে।

হে অর্জুন। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের ভেদে বুদ্ধি ও ধৈর্যেরও তিন প্রকার ভেদ হয়। আমি তা পৃথক পৃথক ভাবে বলছি, শ্রবণ কর।

হে অর্জুন! মানুষ যে বুদ্ধি দ্বারা কর্মমার্গ ও সন্ন্যাসমার্গ, কর্তব্য কর্ম ও অকর্তব্য কর্ম, ভয়ের কারণ ও ভয় না হবার কারণ এবং বন্ধের ও মুক্তির কারণ জানতে পারে—সেই বুদ্ধির নাম সাত্ত্বিক বুদ্ধি।

হে অর্জুন! মানুষ যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম, অধর্ম, কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিষয় অযথাযথ ভাবে জানে—সেই বুদ্ধিকে রাজসী বুদ্ধি বলে।

হে অর্জুন! মানুষ তমোগুণাবৃত যে বুদ্ধি দ্বারা পাপকে পুণ্য বলে ধারণা করে এবং সকল বিষয়কেই বিপরীত ভাবে বোঝে—সেই বুদ্ধির নাম তামসী বুদ্ধি।

হে অর্জুন! মানুষ চিত্তের একাগ্রতাবশত অনন্যগামিনী যে ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্যগুলি যোগের অনুকূলে স্থাপন করে—সেই ধৃতির নাম সাত্ত্বিকী ধৃতি।

মানুষ পূর্ব ফলভোগ করার পর পরবর্তী ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা করে যে ধৃতি দ্বারা কাম ও অর্থের অনুষ্ঠান করে, সেই ধৃতিকে রাজসী ধৃতি বলে।

দুর্বুদ্ধি লোক যে ধৃতি দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ, ও বিষয়—সুখমত্ততা ত্যাগ করতে পারে না—সেই ধৃতির নাম তামসী ধৃতি।

হে অর্জুন! তুমি এখন আমার নিকট তিন প্রকার সুখের কথা

শ্রবণ কর। মানুষ বারংবার অনুষ্ঠানের মাধ্যম সমাধিসুখে যে বিশেষ আরাম অনুভব করে এবং নিশ্চিত রূপে দুঃখের অবসান প্রাপ্ত হয় এবং সেই যে সুখকে বিষের তুল্য এবং পরিণামে অমৃতের তুল্য বলে বোধ করে—পরমাত্মজ্ঞানের অনুগ্রহজাত সেই সমাধি-সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলে।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন এবং জগৎ প্রসিদ্ধ যে সুখ অমৃতের তুল্য অথচ পরিণামে যা বিষবৎ বলে বোধ হয়, সেই সুখকে রাজস সুখ বলে।

নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন যে সুখ আত্মার মোহ-জনক, সেই সুখের নাম তামস সুখ।

প্রকৃতির এই তিনটি গুণ যাতে নেই, এমন পদার্থ পৃথিবীতে, স্বর্গে বা পাতালে নেই।

হে শত্রুতাপন অর্জুন! সাত্ত্বিক-প্রভৃতি অবস্থার উৎপাদক সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম-গুলি আমি বিভক্ত করে দিয়েছি।

শম, দম, তপস্যা, পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, ব্রহ্মজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান, এবং আস্তিকতা—এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম।

বীরত্ব, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন করা, দান করা এবং প্রভুত্ব করা—এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম।

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য, এইগুলি বৈশ্য জাতির স্বাভাবিক কর্ম। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির পরিচর্যা শূদ্র জাতির স্বাভাবিক কার্য।

মানুষ আপন আপন কর্মে ব্যাপৃত থেকে সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধি লাভ করে। অর্জুন! স্ব স্ব কর্মে ব্যাপৃত মানুষ যেভাবে সিদ্ধি লাভ করে তা শ্রবণ কর।

যা থেকে জগতের উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি এই সমগ্র জগৎটিকে ব্যাপ্ত করে রয়েছেন—মানুষ আপন আপন কর্মদ্বারা সেই পরমাত্মার

উপাসনা করে সিদ্ধিলাভ করে।

আপন ধর্ম গুণবিহীন হলেও তা সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং মানুষ শাস্ত্রনির্দিষ্ট স্ব-স্ব জাতীয় কর্ম করে পাপাভাগী হয় না।

হে অর্জুন! স্ব স্ব জাতির নির্দিষ্ট কার্য দোষদুষ্ট হলেও মানুষ তা ত্যাগ করবে না। কারণ অগ্নি যেমন ধূমাবৃত থাকে, সেরূপ সকল কার্যই দোষযুক্ত হয়ে থাকে।

পুত্র কলত্র প্রভৃতি বিষয়ে অনাসক্তবুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত ও স্পৃহাশূন্য লোকই সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করেন।

হে অর্জুন! সাধক জ্ঞান লাভ করে যে প্রকারে ব্রহ্মলাভ করেন, তা তুমি সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। জ্ঞানের চরম সীমা ব্রহ্মলাভ।

নির্মল বুদ্ধি যুক্ত হয়ে, ধৈর্যের প্রভাবে দেহটিকে সংযত রেখে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধকে পরিত্যাগ করে, চিত্ত থেকে রাগ-দ্বেষ দূর করে, অহঙ্কার-বলপ্রয়োগ-দর্প-কাম-ক্রোধ ও আবশ্যক দ্রব্য ব্যতীত অন্য দ্রব্য গ্রহণ একেবারে পরিত্যাগ করে, পবিত্র অথচ নির্জন স্থানে থেকে, অল্প আহার করে, দেহ-মন-বাক্যকে সংযত রেখে, বৈরাগ্য অবলম্বন করে এবং মমতাশূন্য ও বিষয়চিন্তাবিহীন হয়ে সর্বদা ধ্যানপরায়ণ হতে পারলে সাধক ব্রহ্মত্ব লাভ করতে সমর্থ হন।

ব্রহ্মত্ব লাভে যোগ্য—নির্মলচিত্ত সেই সাধক কোনো নষ্ট বিষয়ের জন্যেও শোক করেন না কিংবা অপ্রাপ্ত বস্তুরও আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু সর্বভূতে সমদর্শী হয়ে জ্ঞান অনুসারে আমার উপাসনাই করতে থাকেন।

তারপর আমার যে পরিমাণ ও যে রূপ, ভক্তি অনুসারে সেই সেই ভাবে আমাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং যথার্থ রূপে আমাকে প্রত্যক্ষ

করে আমাতে প্রবিষ্ট হন।

আর মানুষ সর্বদা নিত্য ও নৈমিত্তিক সকল কার্য করতে থেকে যদি দৃঢ় ভক্তি সহকারে আমাকে আশ্রয় করে—তাহলেও সে আমার অনুগ্রহেই নিত্য ও বিকারবিহীন ব্রহ্মপদ লাভ করে।

হে অর্জুন! তুমি মন দ্বারা সমস্ত কার্য আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে, সর্বত্র সমদর্শন জ্ঞান অবলম্বন করে, সর্বদা মদ্‌গতচিত্ত হও।

তুমি মদ্‌গতচিত্ত হয়ে আমার অনুগ্রহে সংসারের দুস্তর দুঃখ সকল অতিক্রম করতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি তুমি পাণ্ডিত্যাভিমান-বশত আমার কথায় বিশ্বাস না করে এই উপদেশ শ্রবণ কর, তবে বিনষ্ট হবে।

তারপর অর্জুন! তুমি অভিমানবশত মনে মনে যে নিশ্চয় করছ 'আমি যুদ্ধ করব না'—এ নিশ্চয় তোমার নিষ্ফলই হবে। কেন না তোমার স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করবে।

হে অর্জুন! তুমি ভ্রমবশত যে যুদ্ধ না করার ইচ্ছে করছ, স্বভাবজাত তেজে এবং নিজের প্রাক্তন কর্মে নিবদ্ধ ও অ-স্বতন্ত্র হয়ে তুমি তা অবশ্যই করবে।

বিশেষত হে অর্জুন! সূত্রধার যেমন আপন কৌশলে যন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম পুরুষকে সঞ্চালিত করতে থেকে পটমণ্ডপে অবস্থান করে, সেরূপ ঈশ্বর আপন মায়া দ্বারা সকল প্রাণীকে সঞ্চালিত করতে থেকে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করে।

অতএব হে ভরতনন্দন! তুমি সর্বপ্রকারে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও। তা হলে তুমি তাঁরই অনুগ্রহে পরম শান্তি এবং নিত্য স্থান লাভ করবে।

হে অর্জুন! আমি তোমার নিকট এই গোপনীয় থেকেও গোপনীয় জ্ঞানের বিষয় বললাম, তুমি আমার এই সকল কথা বিশেষ রূপে বিবেচনা করে যথা ইচ্ছা কার্য কর।

হে অর্জুন! আমার সর্বাপেক্ষা গোপনীয়—এই উত্তম বাক্য শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। সেই জন্যেই তোমার নিকটে এই হিতের কথা বলব।

হে অর্জুন! তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও। তাহলে তুমি আমাকেই লাভ করবে। হে অর্জুন। তুমি আমার প্রিয় বলেই তোমার নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করলাম।

হে অর্জুন! তুমি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক কোরো না।

হে অর্জুন! যে লোক তপস্বী নয়, ভক্ত নয়, শুশ্রূষাকারী নয় কিংবা যে লোক আমার ওপরে দোষারোপ করে, তাদের নিকট কখনও এই গীতাশাস্ত্র কথন করবে না।

আর যিনি নিজে আমার ওপরে—আমার এই সকল উক্তির ওপরে নিঃসন্দেহ হয়ে আমার ওপরে পরম ভক্তি সহকারে আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গোপনীয় গীতাগ্রন্থের ব্যাখ্যা করবেন, তিনি আমাকেই লাভ করবেন।

মনুষ্যমধ্যে কোনো মনুষ্যই সেই গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় নয়। কিংবা পৃথিবীতে তাঁর অপেক্ষা অপর কোনও লোক আমার অধিক প্রীতিকারী হবেন না। পূর্বকালেও ছিলেন না।

তারপর যিনি আমাদের এই ধর্মসঙ্গত সংবাদ গ্রন্থ পাঠ করবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমার পূজাই করবেন, এই-ই আমার ধারণা।

আর যে লোক এই গীতাশাস্ত্রের ওপর দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে এবং এর ওপরে কোনো দোষারোপ না করে গীতা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যকারীদের প্রাপ্য মঙ্গলময় স্বর্গসকল লাভ করেন।

হে অর্জুন! তুমি একাগ্রচিত্তে আমার এই কথাগুলি শ্রবণ

করেছ তো? হে ধনঞ্জয়! তোমার সই অজ্ঞান মোহ বিনষ্ট হয়েছে তো?

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার অনুগ্রহে আমার সেই মোহ তিরোহিত হয়েছে। আমি স্মৃতি লাভ করেছি এবং সন্দেহমুক্তও হয়েছি। অতএব, আমি আজ থেকে যাবজ্জীবন তোমার আদেশ পালন করব।

সঞ্জয় বলল, হে রাজা! মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জুনের এরূপ অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ সংবাদ আমি শ্রবণ করেছিলাম।

যোগেশ্বর কৃষ্ণ নিজেই অর্জুনের কাছে বলছিলেন, সেই অবস্থাতেই পরম গোপনীয় এই মুক্তিজনক বাক্যসকল আমি বেদব্যাসের অনুগ্রহে শুনেছিলাম।

হে রাজা! আমি কৃষ্ণ ও অর্জুনের অদ্ভুত এবং পুণ্যজনক এই সংবাদ স্মরণ করে মুহুর্মুহু আনন্দিত হচ্ছি।

আর রাজা! কৃষ্ণের সেই অত্যাশ্চর্য বিশ্বরূপ স্মরণ করে আমার গুরুতর বিস্ময় জন্মাচ্ছে এবং বারংবার শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ অবস্থান করছেন এবং যে পক্ষে অদ্বিতীয় ধনুর্যোদ্ধা অর্জুন রয়েছেন—সে পক্ষেই বীরত্বসম্পদ রয়েছে। সুতরাং সেই পক্ষেরই বিশেষরূপে জয়লাভ হবে। রাজ্যসম্পদও অবশ্যই সেই পক্ষেরই হবে এবং ধর্মসঙ্গত নীতিও সেই পক্ষে থাকবে।

[শ্রীকৃষ্ণের ধর্মকথা, মর্মকথা—সমস্ত কিছুরই সারবস্তু হচ্ছে গীতা। তবে গীতা কি সত্যিই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে যুদ্ধের প্রাক্কালে উচ্চারিত হয়েছিল? পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে দ্বিমত। আমারও বিশ্বাস গীতা পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল। তবে যাই হোক গীতা ভিন্ন কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই এই

পুস্তকে গীতার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদই প্রকাশ করলাম। গীতা যুগযুগ ধরে হিন্দুদের প্রভাবিত করে এসেছে। আজ প্রভাবিত করছে সারা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে। এই গভীর তত্ত্বজ্ঞান, জীবনদর্শন পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মশাস্ত্রেই লভ্য নয় বলে আমার বিশ্বাস।]

সহায়ক পুস্তকের তালিকা

১. ঋগ্বেদ সংহিতা

২. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

৩. শ্রীমদ্ভাগবত

৪. মহাভারত

৫. রামায়ণ

৬. হরিবংশ

৭. বিষ্ণু পুরাণ

৮. ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ

৯. জ্যোতির্বিজ্ঞান রহস্য

১০. বিশ্বকোষ

১১. ভারতকোষ

১২. শ্রীনামভাগবতম্ (১ম খণ্ড)—৺পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর

১৩. মহাভারতম্—মহামহোপাধ্যায় ৺হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

১৪. যুধিষ্ঠিরের সময় (২য় সংস্করণ)—মহামহোপাধ্যায় ৺হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

১৫ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬. গীতগোবিন্দ—কবি জয়দেব

১৭. রৈবতক—নবীনচন্দ্র সেন

১৮. শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম—৺জগদীশচন্দ্র ঘোষ

১৯. কৃষ্ণ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু

২০. রাজগীর সম্বন্ধে ভূমিকা—জৈনকো প্রকাশন—দিল্লী-৬

২১. Political History of Ancient India—by H. C. Roy Chaudhury, M· A., Ph. D.

২২. The Age of Imperial Unity—by R. C. Mazumdar, A. D. Pusalkar, A. K. Mazumdar.

২৩. An Advanced History of India—by R. C. Mazumdar M. A. Ph. D., H. C. Ray Chaudhury, M. A. Ph. D., Kalikinkar Dutta M. A. Ph. D.

২৪. Inidian History and Culture—by J. Fuste, M. A., L Ltit, Ph. D. and I. R. Metha M. A., B. T.

২৫. Swagat—the inflight magazine of Indian Airlines